শ্রীস্বরূপদামোদর।

কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ববেত্তা—দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী

প্রণেতা।

কলিকাতা

বাগবাজার ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন

পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

৪১৯ গৌরাব্দ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মা

উৎসর্গ-পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত রচয়িতা

শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের

প্রাতঃস্মরণীয় নামে

ভক্তিপূত চিত্তে

এই গ্রন্থোৎসর্গ করা হইল।

লেখকের নিবেদন।

ঐ দেখ ভাই রামানন্দ প্রভু কেন এমন হৈল।
কৃষ্ণকথা কইতে কইতে মেঘ দেখিয়া ঢ'লে পৈল ॥

শ্রীস্বরূপদামোদর।

আজ বিশ বৎসরের কথা, এক দিবস শ্রাবণের নিশীথে এক সুধামধুর ভাবগলিত গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীপাদ স্বরূপের এই সুকরুণ সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম। সে কণ্ঠ এখন গোলকে। কিন্তু সেই গানের ঝঙ্কার এখনও কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। এখনও দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় কোন কোন সময়ে সেই সুমধুর গোলক-সঙ্গীত সহসা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া একটী ক্ষীণকায় গৌরবর্ণ প্রীতিমধুর প্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর প্রতিচ্ছবি হৃদয়পটে আঁকিয়া দেয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এক বৎসরকাল যাবৎ প্রতি সপ্তাহে "শ্রীপ্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ" প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। এই গানটীই তাহার বীজমন্ত্র স্বরূপ। কিন্তু ঐ প্রবন্ধগুলি যে আবার গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইবে, ইহা কখনও মনে করি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ দাদা মহাশয়ের নিরঙ্কুশ স্নেহে, আমি-অযোগ্যও গ্রন্থকার শ্রেণীভুক্ত হইলাম। ভালবাসার বিচার নাই, যাহা হইবার তাহা হইল। বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকায় প্রুফ পর্য্যন্ত ভালরূপে দেখা ঘটে নাই। ভাব ও ভাষার ত্রুটি কতই আছে। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ব্রজরসের মধুময়ী মূর্ত্তি। ইঁহার লীলালোচনা আমার কার্য্য নহে। "স্বরূপ ও মহাপ্রভু" লিখিতে বাসনা করিয়াও লিখিতে পারি নাই। কিন্তু আশার ত অবধি নাই; তাই এখনও তৎপক্ষে আশা রহিল। বুঝিয়াছি লীলা লেখা প্রভুর কৃপাসাপেক্ষ। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাদেশে যিনি তাঁহার লীলা লিখিবার ভারপ্রাপ্ত, তিনি মধুর ভাষায় ও সরসভাবে স্বরূপের লীলামাধুর্য্য বর্ণন করিবেন। এই খণ্ডে বৈষ্ণবশাস্ত্রের রসতত্ত্ব এবং শ্রীপাদ স্বরূপের বন্ধু ও শিষ্য সম্বন্ধে দুই একটী বলা হইল মাত্র।

সূচী।

বিষয় পত্রাঙ্ক।

বিষয় পত্রাঙ্ক।

সূচী।

শ্রীস্বরূপদামোদর।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীচরণান্তিকে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তগণের চকোরচিত্ত আবার বহুদিন পরে তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইল। তিনি দক্ষিণ হইতে আসিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্রই দূরদেশান্তর হইতে ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে শ্রীকাশীধাম হইতে এক তরুণ সন্ন্যাসী ব্যাকুলভাবে নীলাচলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার মুখখানি কৃষ্ণপ্রেমে ঢল ঢল, নয়নযুগল সজল, স্নিগ্ধ অথচ অলোকসামান্যপ্রতিভাব্যঞ্জক। মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে গৈরিকবসন, মুখে সতত সুমধুর কৃষ্ণনাম, আর নয়নে প্রেমধারা। সন্ন্যাসীর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, দিবারাত্রি বোধ নাই। ইনি সহসা নীলাচলে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণসমক্ষে অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমগদ্গদস্বরে ভাঙ্গাভাঙ্গা কণ্ঠে একটী স্তুতি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল, আর বায়ু-তাড়নে কদলীকাণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল। নয়নাশ্রু মুক্তামালার ন্যায় গণ্ড বাহিয়া সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল বক্ষ পরিসিক্ত করিতেছিল। শ্লোকটী পড়িতে পড়িতে এই সুঠাম-দেহ তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে ধরিয়

নিজের বুকে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাশ্রুতে উভয় শ্রীমূর্ত্তি তখন পরিসিক্ত, আর উভয়ের অরুণ ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, উভয়ে উচ্ছলিত প্রেমে ডুবিয়া পড়িলেন,—অচেতন হইলেন। যেন অকস্মাৎ গঙ্গা যমুনার সম্মিলন হইল। ভক্তগণ এই ভাব দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। ইনি যে দয়া-প্রার্থনাসূচক স্তুতি-শ্লোকটী পাঠ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা করিতেছিলেন, তাহা ইঁহার স্বরচিত। শ্লোকটী অতি মধুর ও উচ্ছাসময়, যেন "দয়া" শব্দের মন্দাকিনীতরঙ্গে উচ্ছলিত। সে শ্লোকটী এই :—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ (১)

অর্থাৎ "হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি, তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের

(১) এই শ্লোকের টীকাকার ইহার ভাব-পুষ্টির জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরাও সেই লোভে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পন্থার কিঞ্চিৎ বেশী দূর অনুসরণ করিতেছি। অমঙ্গল নাশ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের একটী শ্লোক এই যে :—

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ড প্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্যাণ্ডব তরল তনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ
র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রম্॥

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কলুষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।

প্রেমদান সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বলেন :—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো যএকঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্।

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও স্পর্শ করিলে, যাঁহার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলে,

সর্ব্বসন্তাপ দূরে যায়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের প্রকাশ হয়। তোমার দয়ায় শাস্ত্রাদির বিবাদ প্রশমিত হয়, এবং উঁহা চিত্তে গাঢ় রস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরন্তর ভক্তি সুখলাভ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা সকল মাধুর্য্যের সার। তুমি কৃপা করিয়া এ অধমে দয়া প্রকাশ কর।"

নবীন সন্ন্যাসী এই স্তুতি পাঠ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলকর্ণিকাপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রেমাশ্রু ধারায়

যাঁহার উদ্দেশ্য করিয়া দূর হইতে নমস্কার করিলে, যিনি প্রেমসার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই দয়াময় মহাপ্রভুকে নমস্কার।

তাঁহার দয়া সম্বন্ধে শ্রীচন্দ্রামৃত আরও বলেন :—

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে,ন স্বম্পরং বীক্ষ্যতে
দেয়াদেয়বিমর্শকো নহি নবা কাল প্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যৎ শ্রবণেক্ষণ প্রণমনধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং
দত্তে ভক্তিরসং সএব ভগবান্ গৌরং পরং মে গতিঃ॥
পাপীয়ানপি হীনজাতি রপি দুঃশীলোঽপি দুষ্কর্ম্মণাং
সীমাপি শ্বপচাধমোঽপি সততং দুর্ব্বাসনাঢ্যোপি যঃ।
দুর্দ্দেশপ্রভবোঽপি তত্র বিহিতো বাসোঽপিদুঃসঙ্গতো
নষ্টোঽপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে॥

অর্থাৎ যিনি পাত্রাপাত্রের বিচার করেন না, আত্মপর দেখেন না, দেয় অদেয়ের বিচার করেন না, কালাদি প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ দর্শন প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা দুর্ল্লভ ভক্তিরস ক্ষণমাত্রেই যিনি প্রদান করেন, কেবল সেই গৌরহরিই আমাদের গতি। অতি পাতকী, হীনজাতি, দুষ্টস্বভাব, অসীম দুষ্কর্ম্মী চণ্ডাল হইতে অধম। সতত দুর্ব্বাসনাযুক্ত, কুদেশবাসী এবং অসৎসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট ব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গৌরহরিই আমার আশ্রয়।

প্রভুর দয়ায় শাস্ত্রবিবাদ প্রশমন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলেন :—

স্ত্রী পুত্রাদি কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্র প্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্য চন্দ্রে পরা
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগ,পদবীং নৈব্যন্য আসীদ্রসঃ।

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য পরম ভক্তিযোগ পদবী প্রকাশ করিলে পর অন্য রস তিরোহিত

বসুন্ধরা পরিসিক্ত করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তখন উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ ও অচেতন হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া প্রভু বলিলেন,—

"তুমি যে আসিবা আমি স্বপ্নেহ দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

প্রভুর কৃপামধুর-বচনামৃত শুনিয়া সজলনয়ন সন্ন্যাসী বলিলেন,—

———"প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ॥

হইল। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা স্ত্রী পুত্রাদির কথা বিস্মৃত হইল, পণ্ডিতেরা শাস্ত্র বিচার ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আসিয়া শরণ লইলেন, যোগীরা যোগ, তপস্বীরা তপশ্চর্য্যা, যতিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে মধুর প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। আর তখন :—

অভূদ্গেহে গেহে তুমুলহরি-সঙ্কীর্ত্তনো রবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রু ব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরম মধুরোৎকর্ষ পদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরোঽবতরতি॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইলে ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তনের তুমুল রব উত্থিত হইল, প্রতি দেহই বিপুল রোমাঞ্চ ও প্রেমাশ্রু ধারায় শোভিত হইল, এবং বেদের অগোচর মধুর হইতেও মধুর প্রেম পথ প্রকাশিত হইল।

ভক্তগণ এই প্রেমমাধুর্য্য লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীপাদের বচন উদ্ধৃত করিয়াই এই বাক্য সপ্রমাণ করিতেছি, যথা :—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তংগৌরমেবস্তুমঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার করুণা-দৃষ্টিরূপ-বৈভববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নির্ব্বাণ মুক্তি নরকের ন্যায়, স্বর্গ আকাশ কুসুমের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গণ উৎপাটিতদন্ত কালসর্পের ন্যায়, জগৎ পূর্ণ

মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥"

ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে এই যুবক উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, সমগ্র সংসার তাঁহার নিকট অসার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তখন তাঁহার স্বকীয় জ্ঞান থাকিলে তিনি সন্ন্যাসের জন্য ব্যাকুল না হইয়া সোজাসোজি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণের অভিমুখেই ধাবিত হইতেন। কিন্তু তখন সে জ্ঞান আর তাঁহার ছিল না। তাই তিনি নিজকে মহাপরাধী মনে করিয়া উক্ত শ্লোকে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, বড় ভাল হইল, অন্ধব্যক্তি যুগপৎ দুইটী নেত্র পাইলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, তোমাকে পাইয়া আমার সেইরূপ আনন্দানুভব হইতেছে।"

একান্ত ভক্ত সন্ন্যাসীটী ইহাতে বুঝিলেন শ্রীমহাপ্রভু অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছিলেন। তিনি যে ইহার আগে তাঁহার শ্রীচরণসমীপে কেন উপনীত হয়েন নাই, এইজন্য তিনি নিজকে আরও অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তবৎসল প্রভুর স্নেহমধুর বাক্যে অচিরেই তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। অতঃপর তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করায় প্রেমময় নিতাই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি

সুখের ন্যায় এবং ব্রহ্মাদির বৈভব তুচ্ছ পদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হয়, আমরা সেই শ্রীগৌরহরির স্তব করি। "হেলদ্ধূলিত খেদয়া" শ্লোকে এই সকল ভাবের বীজ নিহিত আছে।

তরুণ সন্ন্যাসীর এই সারগর্ভ মহাভক্তিপূর্ণ স্তুতিটী গৌরভক্ত মাত্রেরই অমূল্য কণ্ঠহার। তাই এ স্থলে তৎসময়ের সন্ন্যাসিকুলের মুকুটমণি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আত্মশোধন করিলাম মাত্র। ফলতঃ "হেলোদ্ধূলিত খেদয়া" স্তুতি শ্লোক পাঠ করিলে সমগ্র শ্রীচন্দ্রামৃত উদ্ধৃত করিয়া ইহার রস-পুষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়। এই শ্লোকটীতে যে মহাশক্তি নিহিত আছে, ভক্তগণের তাহা অবিদিত নাই। ইহার প্রতিপদই ভক্তি-রসের উদ্দীপক, আত্মপ্রার্থনার ব্যাকুল উচ্ছ্বাস। ভক্তগণের নিকট তরুণ সন্ন্যাসীর এই শ্লোকটী ভক্তিসাধনের মহামন্ত্র বলিয়াই উপলব্ধ হয়।

প্রধানতম গৌরভক্তগণের সহিত তাঁহার মিলন হইল। ইনি এই সময় হইতে প্রভুর নিত্যসহচররূপে তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দের মকরন্দ আস্বাদ ভোগের অধিকারী হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই প্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসীটী কে ?

এই প্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসীটী কে, আমরা তাহার সবিশেষ পরিচয় জানি না, তবে দুই একটী কথা বলিব। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য নামক একটী বালক শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যায়ন করিতেন। শ্রীধাম তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তিরসে টলমল হইয়া উঠিয়াছেন। পুরুষোত্তম প্রথমতঃ শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সৌন্দর্য্যে ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, এবং কি-জানি-কেমন এক আকর্ষণে, তদীয় চরণে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। পুরুষোত্তমের রূপলাবণ্যে সকলের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বালক অতি অল্পকালের মধ্যেই সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ইঁহার কোমল হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি-মন্দাকিনীর পূর্ণধারা অলোকসাধারণ পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। নম্রতা ও দীনতা ভক্তির চিরসহচরী। বিনয়াচ্ছাদিত পাণ্ডিত্যে ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে পুরুষোত্তম নবদ্বীপবাসীর গাঢ় প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত কণ্ঠরব শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তিনি যখন এই সুধামাখা কণ্ঠে গান করিতেন, সে গান শুনিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত হইত। শ্রীমান্ পুরুষোত্তম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট সতত সলজ্জভাবে বিচরণ করিতেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে না দেখিলেই তাঁহার হৃদয় অধীর হইত, অথচ লোকে তাহা জানিতে পারিত না।

যেদিন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতেই পুরুষোত্তমের

হৃদয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল, তাঁহার আহার নিদ্রা দূর হইল, তিনি যে শাস্ত্রপাঠ এত ভাল বাসিতেন, আর সে গ্রন্থরাশি স্পর্শও করিলেন না, অনবরত তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইয়া বক্ষসিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ের আগুণ নিভিল না। গৌরশূন্য নদীয়া পুরুষোত্তমের নিকট বিষবৎ বলিয়া বোধ হইল। নবদ্বীপ নিরানন্দ, সে কীর্ত্তন নাই, সে হরিধ্বনি নাই, সে প্রেমপ্রবাহ নাই, ভক্তগণ মৃতের ন্যায় গৃহে গৃহে পড়িয়া রহিলেন। গৌরবিরহে সমগ্র নদীয়া শোকের অশ্রুতে ডুবিয়া গেল। পুরুষোত্তম কিছুতেই গৌরশূন্য নদীয়ায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পথেরই অনুসরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এক দিবস কাহাকেও কিছু না বলিয়া হৃদয়ের পূর্ণ আবেশে উন্মত্তের ন্যায় শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুরুষোত্তমের সংসার-বাসনা একবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসিক্ষেত্র বারাণসীর পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী-তীরের স্নানার্থিগণ সহসা একদিন দেখিতে পাইলেন,—একটী উজ্জ্বলকান্তি তরুণ বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক সংসার-বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, নাপিত তাঁহার চাঁচর কেশ মুণ্ডন করিতেছে। সন্ন্যাসার্থিগণের পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে এ দৃশ্য নূতন বা বিস্ময়জনক নহে, তথাপি দর্শকমাত্রেরই হৃদয় ইহাতে বিগলিত হইয়া গেল। পুরুষোত্তমের মস্তক মুণ্ডিত হইল। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া তিনি সন্ন্যাসবেশোচিত একখানি গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া কাশীবাসীর বোধ হইল যেন দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ভক্তিপ্রবাহ লইয়া কাশীনগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসী চৈতন্যানন্দের নিকট ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যথা চরিতামৃতে—

প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥

নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই ইঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য, সুতরাং ইনি যোগপট্টাদি গ্রহণ করিলেন না। ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল,—স্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়।

নামকরণ ও গুণবত্তার পরিচয়।

পুরুষোত্তম নীলাচলে আসিয়া সাধারণতঃ 'স্বরূপ' নামেই অভিহিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও "স্বরূপ", কোথাও "দামোদর", কোথাও "স্বরূপ-দামোদর", কোথাও বা "দামোদর-স্বরূপ" নামে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থলে স্থলে ইঁহার নামের নিরুক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় সূত্রবৎ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

গুরু ঠাঁই আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে।
রাত্র দিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোকে নাহি জানে॥
কৃষ্ণরস তত্ত্ববেত্তা "দেহ প্রেম রূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

যিনি ভক্তসমাজে মহাপ্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ" বলিয়া প্রতিভাত হইলেন, তাঁহার সন্ন্যাস গুরু চৈতন্যানন্দের হৃদয়ে বুঝি এই ঘটনার পূর্ব্বাভাসের অস্ফুট আলোক প্রতিফলিত হইয়াই এই নবীন সন্ন্যাসীর "স্বরূপ" নাম রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল। ইঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও গুণবত্ত্বের পরিচয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ॥

বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
"দামোদর" সম আর নাহি মহামতি॥

এখানে আমরা স্বরূপের "দামোদর" বলিয়া একটী নাম পাইতেছি। লোকে বলে সঙ্গীতে শাস্ত্রজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কিন্তু স্বরূপ "সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।" এস্থলে দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এক আধারে আশ্রয় পাইয়াছে, ইহা অসাধারণ গুণাশ্রয়ত্বের পরিচায়ক।

স্বরূপ যে সর্ব্ব বিষয়েই মহাপ্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ" ছিলেন, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার আরও নামের পরিচয় শুনুন।

একবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরে মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া আলালনাথে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে গৌড় হইতে শ্রীপ্রভুর মুখশশী দেখিবার জন্য দুইশত ভক্ত নীলাচলে উপস্থিত। কোন কোন ভক্ত আলালনাথে যাইয়া প্রভুর চরণে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রযত্নে গৌড়ীয় ভক্তগণের থাকিবার বাসার সুবন্দোবস্ত হইল। সংবাদ পাওয়া মাত্রই দয়াময় মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীভগবানের সহিত ভক্তগণের আনন্দ-সম্মিলন হইল। ভক্তগণকে মালা-প্রসাদ দেওয়ার জন্য স্বরূপ ও গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ হওয়ায় এই কৃপাদেশে ইঁহারা বড় হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা মালা-প্রসাদ লইয়া ভক্তগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে হরিনামের মধুর ধ্বনি উঠিল। ভক্তগণের পরিচয় জানিতে রাজা প্রতাপরুদ্রের অত্যন্ত কৌতুহল হইল। তিনি শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ভক্তগণের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! যে দুইজন মালা বিতরণ করিতেছেন, এ দুইজনের পরিচয় আমার আগে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।" তদুত্তরে—

ভট্টাচার্য্য কহেন—এই স্বরূপ-দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহোঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর॥

দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিঞা।
মালা পাঠাইয়াছেন প্রভু গৌরব করিয়া॥

স্বরূপের নামের সহিত অনেক স্থলেই "দামোদর" পদের যোগ আছে। এই পদটী কখনও "স্বরূপ" পদের পূর্ব্বে, কখনওবা পরে দৃষ্ট হয়। যথা :—

দামোদর-স্বরূপ গোবিন্দ দুই জনে।
মালা প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণে॥

যাঁহারা শ্রীগৌরলীলার শ্রীগ্রন্থাদি মধ্যে মধ্যে পাঠ করেন, তাঁহাদের হয়তো মনে হইতে পারে "দামোদর-স্বরূপ" বা "স্বরূপ-দামোদর" বুঝি পৃথক্ দুই ব্যক্তি। "স্বরূপ-দামোদর" বা "দামোদর-স্বরূপ" নাম যে যে স্থলে একযোগে দৃষ্ট হয়, তৎ তৎ স্থলে কেবল "স্বরূপ"ই এই নামের বাচ্য। আবার কেবল "দামোদর" বলিয়াও ইহার নামের উল্লেখ আছে। যথা :—

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ।

প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে আরও দামোদর আছেন, যথা দামোদর পণ্ডিত। যখন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকেতন হইতে নীলাচলে গমন করেন তখন এই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গী হয়েন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

নিত্যানন্দ গোসাঞী পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজন আচার্য্য দিলা প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥

এই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর নিত্য ভক্ত হইয়াও তাঁহার অভিভাবকবৎ আচরণ করিতেন, অভিভাবকের ন্যায় শাসন করিতেন, প্রভুও ইঁহাকে

অভিভাবকের ন্যায় মান্য করিতেন। আমরা অন্য প্রসঙ্গে শ্রীদামোদরের পবিত্র চরিত-কীর্ত্তনে আত্মশোধন করিতে প্রয়াস পাইব। স্বরূপ-দামোদর বা দামোদর-স্বরূপ যে পৃথক্ দুই মূর্ত্তি নহেন, এ স্থলে তৎ-প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য।

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাসাশ্রমে "স্বরূপ" নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি কেবল "স্বরূপ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার গুরু তাঁহাকে "স্বরূপ-দামোদর" বা "দামোদর-স্বরূপ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়,

সন্ন্যাস করিল শিখা সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগ পট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥

ইহাতে বোধ হয় তাঁহার সন্ন্যাস গুরু বুঝি তাঁহার কেবল "স্বরূপ" নামই রাখিয়াছিলেন। এখন কথা এই যে তাঁহার নামের সহিত "দামোদর" শব্দের যোগ কখন হইল? পুরুষোত্তমে আসিবার পূর্ব্বে কি পরে তাঁহার নামের সহিত "দামোদর" শব্দটী সংযুক্ত হয় ইহাও আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

আর দিন আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর ॥

ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে, পূর্ব্ব হইতে ইনি "স্বরূপ-দামোদর" নামেও অভিহিত হইতেন। "স্বরূপ-দামোদর" বা "দামোদর-স্বরূপ" এইরূপ নামই বা কেন হইল, ইহা জানিতেও পাঠকগণের কৌতুহল হইতে পারে। আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে যে কথার উল্লেখ আছে তাহাতেই পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি হইবে। এই শ্রীগ্রন্থের ৮ম অঙ্কে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সমাগম-প্রসঙ্গ এইরূপ লিখিত আছে। চারিদিক হইতে ভক্তপ্রবাহ আসিয়া শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর চরণ-রত্নাকরে মিলিতেছেন দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

ভোঃ স্বামিন্ ইদমতি বিচিত্রম্!
যে কেঽপি যাঃ কাশ্চন সপ্রবাহো
নদাশ্চ নদ্যশ্চ ভবন্তি ভূমৌ

কস্থাপি রত্নাকরমন্তরেণ
কুত্রাপি নাস্থা নচ সন্নিবেশঃ।

অর্থাৎ "প্রভো, ইহা অতি বিচিত্র, এই জগতে যত নদনদী প্রবাহ আছে, এক রত্নাকর ব্যতীত অন্যত্র তাহাদের আস্থা ও সন্নিবেশ হয় না, হইতেও পারে না।" ইতোমধ্যে নেপথ্যে ধ্বনি হইল—

"অহো রসকলবতো ভগবতো রসাচার্য্যকং
গ্রহীতুমিব মূর্ত্ততাং ব্যধিতভিক্ষুবেশং বপুঃ
যদেতদবনীতলে সকল এব দামোদর-
স্বরূপমিতি ভাষতে তদপৃথক্‌তয়া প্রেমতঃ।

অর্থাৎ স্বরূপকে দেখিয়া সকলে বলিতেছিলেন "অহো কি প্রেমময়ী শ্রীমূর্ত্তি! এই সন্ন্যাসিদেহ যেন রসরাজ শ্রীভগবানের রসাচার্য্যের মূর্ত্তিমান্ অবতার। রসিকশেখর শ্রীভগবান দামোদরের সহিত ইঁহার কোন বিভিন্নতা না দেখিয়াই যেন সকলে ইঁহাকে দামোদর-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিতেছে।"

মহাপ্রভু এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "দামোদর-স্বরূপ নামে কোন ব্যক্তি আসিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।" এই কথা বলিতে না বলিতেই দেখা গেল স্বরূপ আকাশ পানে সাশ্রুনয়নে দৃষ্টি করিয়া গদ্‌গদ বাক্যে ধীরে ধীরে "হেলোদ্ধূলিত" শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোপীনাথ বলিলেন—

"অয়ে শ্রুতংময়া চৈতন্যানন্দ শিষ্যঃ পরমবিরক্তো ভগবদ্ভক্তোঽতি বিদ্বানকশ্চিৎদামোদর-স্বরূপো নাম, যঃ খলুগুরুণা বহুতর অভ্যর্থিতো ঽপি বেদান্তমধীত্যাধ্যাপয়েতি নচ তচ্চ কৃতবান্। * * * ভগবন্নয়মযং শ্রুতচরো দামোদর-স্বরূপঃ।"

ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতীত হয় যে চৈতন্যানন্দই সম্ভবতঃ ইহার রসময় ভাব দেখিয়া আনন্দলীলারস-বিগ্রহ দামোদরের রসাচার্য্য স্বরূপ মনে করিয়া "দামোদর-স্বরূপ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে পাঠক শ্রীভগবানের দামোদর নামটীর প্রকাশ সম্বন্ধেও একবার স্মরণ করুন। শ্রীভগবানের দামবন্ধনলীলা তাঁহার প্রেমবিবশতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীভাগবত বলেন—

এবং সন্দর্শিতাহ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরংবশে॥
নেমং বিরিঞ্চি নভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎতৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥"

অর্থাৎ হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র। জগদীশ্বর সহিত এই জগৎ তাঁহার বশবর্ত্তী, তথাপি তিনি ঐ প্রকারে বন্ধনস্থ হইয়া ভক্তবশ্যতা দেখাইয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহ-প্রসন্নতা অন্যান্য ভক্তেরাও পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীযশোদা তাঁহার যেমন প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি তো দূরের কথা,—পূর্ণলক্ষ্মী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াও সেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবান্ দামোদর-লীলায় অতি অদ্ভুত রস-প্রদর্শন করিয়া রসিকশেখরতা ও পরমকরুণার পূর্ণ উদাহরণ দেখাইয়াছেন। রসমাধুর্য্য আর কাহাকে বলে, ইহাই রসমাধুর্য্য!

তিনি আত্মারাম হইয়াও বুভুক্ষিতের ন্যায়, পূর্ণকাম হইয়াও অভক্তের ন্যায়, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হইয়াও ক্রোধিতের ন্যায়, অনন্ত কোটী বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও চোরের ন্যায়, মহাকাল যমাদির ভয়স্বরূপ হইয়াও নিজে ভীত ও পলায়িতের ন্যায়, এবং অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় হইয়াও দুঃখিত দীন বালকের ন্যায় আচরণ করিয়া লীলামাধুর্য্য প্রকটন করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের দামবন্ধন-লীলার কথা স্মরণ করিয়া কুন্তীদেবী বিস্ময়ে ও আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন—

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসিদামতাবৎ
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জন সম্ভ্রমাক্ষং
বক্ত্রং নিনীয় ভয়-ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি।

অর্থাৎ "হে শ্রীকৃষ্ণ, দধিভাণ্ড ভগ্ন করার অপরাধে শ্রীযশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন ভয়ে ও ভাবনায় তুমি কাঁদিতেছিল, আর তোমার নয়নের কাজল চক্ষের জলে গলিয়া যাইতেছিল, সে দৃশ্য কি

মধুর! তুমি সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ, আর তোমার এই লীলা! সেই সময়ের মুখখানি স্মরণ করিয়া এবং তোমার সেই সময়ের দশা মনে করিয়া চিত্ত বিমুগ্ধ হইতেছে।" এই লীলা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের "দামোদর" নাম প্রকাশিত হয়েন।

"সচ তেনৈব দাম্নাতু কৃষ্ণোবৈ দামবন্ধনাৎ।"

হরিবংশ দামোদর নামের সহিত রসমাধুর্য্যের আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হরিবংশে লিখিত আছে—

"গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে।"

গোপীদের এই সোহাগের নামের সহিত অনন্ত রসমাধুর্য্য বিজড়িত। এই রসমাধুর্য্যের রসাচার্য্যমূর্ত্তিই স্বরূপ,—স্বরূপ-দামোদর বা দামোদর-স্বরূপ।

শ্রীকবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে "স্বরূপ-দামোদর" নামের ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থে লিখিত আছে—

সতু সন্ন্যাসমদভ্র ভাগ্যবান্
অগমত্তু রস-স্বরূপতাম্
ইহ "দামোদর" ইত্যুদীরিতঃ
ইতি তেন নিরন্তরং প্রভোঃ।

ত্রয়োদশ সর্গঃ ১৪৩ শ্লোকঃ।

পুরুষোত্তমাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিকুলের মধ্যে তিনি অতি ভাগ্যবান হইলেন। কেন না, তিনি রসস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া দামোদর-স্বরূপ নামে কীর্ত্তিত হইলেন। এই দামোদর-স্বরূপ নামটী কথিত ভাষার সঙ্কোচ-নিয়মে "স্বরূপ" বলিয়াই সম্ভবতঃ সাধারণ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ দামোদর শব্দটী তদীয় রসাচার্য্যকতার পরিচায়ক-স্বরূপ।

দামোদর-স্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রান্তে থাকিয়া কিপ্রকারে তাঁহার রসপুষ্টি করিতেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ভাগবত পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥

একেশ্বর দামোদর-স্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
অশ্রু ঘর্ম্ম হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেম ভক্তির বিকার
দামোদর-স্বরূপের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ।
দামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যার ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুর নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন কি আর সম্পদ॥
অহর্নিশি গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদার গানে।
নাচেন বিহ্বল হইয়া পথ নাহি জানে॥
একেশ্বর দামোদর-স্বরূপ সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে না জানেন কতি॥

দামোদর-স্বরূপ মূর্ত্তিমান রস। তাঁহার একটী কথায় বা একটী গানে রসের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। রস-স্বরূপ দামোদর-স্বরূপের সঙ্গীত রসের বন্যায় মহাপ্রভু স্বীয় অনন্ত প্রেমসাগরে আকুল ভাবে ভাসিয়া চলিতেন, স্বরূপের গান শুনিলে মহাপ্রভুর দিগ্বিদিক জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত জ্ঞান থাকিত না।

"কিবা জল কিবা স্থল কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু গর্জ্জন বিশাল॥"

দামোদর তখন গান ছাড়িয়া প্রভুর দেহরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতেন। প্রভু পথে চলিয়াছেন, সঙ্গে স্বরূপ। প্রভু বলিলেন "স্বরূপ, একটী গান কর।" স্বরূপ গান ধরিলেন, প্রভুর আর তখন পথ চলা হইল না। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন, বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যদৃষ্টি বিন্দুমাত্রও রহিল না। প্রভু রাধাকৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে ভাসিয়া চলিলেন, পথ

ছাড়িয়া নাচিতে নাচিতে কঙ্কর-কণ্টকপূর্ণ স্থানে গিয়া ঢলিয়া পড়ি... স্বরূপ আর গান করিবেন কি, "হায় কি হইল, হায় কি হইল" ... অমনি মহাপ্রভুকে ধরিয়া তুলিলেন। অন্ত্যলীলার শেষ দ্বাদশ ব... মহাপ্রভু উত্তাল প্রেমতরঙ্গে দিবানিশি এইরূপ আকুল থাকিতে... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেমন উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

* * *

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিতে মুখ শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥

মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর এই অবস্থার মর্ম্ম সহচর কেবল—শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরায় রামানন্দ। প্রভুর হৃদয়ে বিরহযাতনা শতধারায় উথলিয়া উঠে, পাছেবা ভক্তগণের ক্লেশ হয় এই আশঙ্কায় তিনি আপন মর্ম্ম কথা যথা-সাধ্য চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ব্বার কৃষ্ণবিরহ-প্রবাহ কিছুতেই বারণ মানে না; আর প্রভুর বিরহ-প্রলাপ, অবরুদ্ধ উৎসের প্রমুক্ত উচ্ছ্বাসের ন্যায়, অথবা ঝটিকোৎক্ষিপ্ত সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায়, সমস্ত দিক্ বিপ্লা-বিত করিয়া প্রবাহিত হয়। এই সময়ে শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণকথায় ও স্বরূপের গানে প্রভুর উদ্বেগ কিঞ্চিৎ কম হয়, প্রভু একটু ধৈর্য্যধারণ করেন। আবার যেই রাত্রি উপস্থিত হয়, প্রভু আবার কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া উঠেন। দিনমান কোনরূপে কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রিতে প্রভু সে বিরহ বেগে একবারেই অধীর ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। আহা, এই দ্বাদশ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহে আকুল আর্ত্তি ও বিরহ জ্বালার কথা মনে করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। প্রভুর "দ্বিতীয়স্বরূপ" এই লীলার সাক্ষী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ—

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ বিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্ত-দুঃখ-ভয়ে॥
উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর, বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভু রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥
তাঁর সুখ হেতু কাছে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক লীলায় করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-সুখের সহায়।
গৌর-সুখ-দান হেতু তৈছে রামরায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধায় সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোঁসাই রাখে প্রভুর প্রাণ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রসিকশেখর, অথবা "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" অথবা শ্রুতির সেই "রসোঃ বৈ সঃ ;" শ্রীপাদ দামোদর সেই রসরাজের দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি ললিতা, গৌরলীলায় তিনিই স্বরূপ। তাই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এখানে স্বরূপের পূর্ব্বলীলার নামটীর ধ্বনি করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমতীর মহাবিরহে ললিতার সান্ত্বনা, আর মহাপ্রভুর রাধাভাবের মহাবিরহে স্বরূপের সাহচর্য্য, প্রেমসেবা ও রসময়ী সুসান্ত্বনা একবারেই অভিন্ন তত্ত্ব। স্বরূপ সেই ললিতা সখী। অতঃপর এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্বরূপ ও শ্রীরূপ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে শ্রীপুরুষত্তমক্ষেত্রে গৌড়ীয় ভক্তগণের শুভ সমাগম হইত। এই সময়ে মহাপ্রভুর মুখশশী দেখিয়া তাঁহাদের সারা বৎসরের বিরহ-জ্বালা নিবারণ হইত, প্রভুর সঙ্গে নৃত্য-গীত-উল্লাসে তাঁহারা এই সময়ে গোলকের সুখ উপভোগ করিতেন। কতিপয় বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। অতঃপরে ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, প্রভু বিরহে ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন, কৃষ্ণবিরহে পরিমৃদিত কোমলের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখকমল যেন মলিন হইয়া যাইতেছে। তিনি কখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ," বলিয়া হাস্য করেন, চারি পাঁচ দণ্ডেও সে হাসির বিরাম হয় না। আবার যখন কৃষ্ণ-বিরহে রোদন করেন, সে রোদন শুনিলে বনের পশু পাখীর হৃদয়ও দুঃখে গলিয়া যায়। প্রিয়জন বিরহ-বিধুরা রমণী যেমন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়েন এবং অপরকেও আকুলিত করেন, প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে সেইরূপ রোদন করিয়া ভক্তগণের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তোলেন। কাহার সাধ্য সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে?

এইরূপে বাহ্য জগতের সহিত প্রভুর সম্পর্ক ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া উঠিল, দিবারাত্র বিরহ-উন্মাদে তিনি একবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ-ধ্যানে, কৃষ্ণ-জ্ঞানে, কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণগানে দিনযামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীরামানন্দ ও তাঁহার প্রাণের স্বরূপ কৃষ্ণকথায় তাঁহার বিরহ-বিদগ্ধ হৃদয়ের কিয়ৎ পরিমাণ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রথ যাত্রার সময়ে গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মনে কত আনন্দ, প্রভুকে লইয়া তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, প্রভুর সেবার জন্য

যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্ত লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া "এটী সেবা করুন, ওটী সেবা করুন" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে আহার করাইবেন এবং তাঁহার সেবা দর্শন করিবেন। কিন্তু এবার ভক্তগণ আসিয়া দেখিলেন, প্রভু যেন কেমন আনমনা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখ-কমল পরিম্লান ও অশ্রুজলে গণ্ডস্থল পরিপ্লাবিত। এই অবস্থায় প্রভু কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, কখন বা নাচিয়া নাচিয়া গাইতেছেন। কিন্তু এই হাসি কান্না ও নৃত্যগীতের সহিত অপর ভক্ত বা ভক্তগায়কগণের সম্বন্ধ অতি অল্প।

সম্মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ। রথের উপর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভক্তগণ প্রভুর পার্শ্বে। রথের অগ্রে প্রভু বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিলেন, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমুখচন্দ্রিমা দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। প্রভুর হর্ষোৎফুল্ল নয়ন-কমল দেখিয়া ভক্তগণের মনে হইল তিনি না-জানি-কি হারাণ-ধন পাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া নাচিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভু এক শ্লোক পড়িলেন, সে শ্লোকটী এই ঃ—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা।
স্তেচোন্মীলিত মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠাতে॥

ইহার অর্থ এই যে, কোন এক রমণী নিজ সখীকে বলিতেছেন "সখি, যিনি রেবাতটে বেতসতরুমূলে আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়া রসের আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই আমি পতিরূপে পাইয়াছি। সখি, মধু যামিনীতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম মিলন হয়, এখনও সেই মধু যামিনী। তখন যেমন উন্মীলিত মালতী ফুলের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল, তখন যেমন কদম্ব-কুসুমের গন্ধ লইয়া মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছিল, এখনও সেই সকলি আছে ; কিন্তু তথাপি আমার হৃদয় সেই রেবাতটের বেতস তরুমূলে সুরতসুখ-সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।"

এটী তো শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক নয়,—শ্লোকটী কাব্যপ্রকাশের। একটী সাধারণ নায়িকার উৎকণ্ঠাজনিত ভাবদ্যোতক শ্লোকটী মহাপ্রভু এমন আনন্দভরে নাচিয়া নাচিয়া পাঠ করিলেন কেন, কেহই তাহা বুঝিলেন না,—বুঝিলেন একমাত্র স্বরূপ। স্বরূপ শ্লোকটী শুনিবামাত্রই গান ধরিলেন :—

সেই তো পরাণ নাথ পাইনু,
যাহা লাগি মদন দহন ঝুরি গেনু।

স্বরূপ এই ধূয়া গাইতে লাগিলেন। প্রভুর দেহ পুলকে কদম্ব-কুসুমবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল, বায়ু-তাড়িত সাগরের ন্যায় ভাব-সমুদ্র মহাপ্রভুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি একবারে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। স্বরূপের গানে রসের বন্যা-তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল, আর মহাপ্রভু যেন তাহাতে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিলেন। এক ধূয়ায় এক দণ্ড দুই দণ্ড করিয়া দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে প্রভু একটু স্থির হইলেন। কিন্তু এই শ্লোকের বা এই ধুয়ার কেহ মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিলেন না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, অন্ত্য খণ্ডে :—

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কোন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥
সবে এক স্বরূপ গোসাঞী শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে॥

এবার শ্রীল রূপগোস্বামী রথযাত্রার সময়ে পুরুষোত্তমে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উল্লাস-বিস্ফারিত নেত্রে প্রভুর নৃত্য দেখিতেছিলেন। আর "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটীর কি-জানি-কেমন এক ঝঙ্কারে তাঁহার দেহ শিহরিয়া উঠিতেছিল। ইহার পরে যখন "এই তো পরাণনাথ পাইনু" এই শ্রীপদটী গাইতে শুনিলেন, তখন শ্রীরূপ গোস্বামীর দেহ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অবশ ভাবে বাসায় গেলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা গেল শ্রীরূপ গোস্বামীর গণ্ডদেশ প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে, আর তিনি আপন বাসায় বসিয়া একখানি তালপত্রে যেন কি

লিখিতেছেন। লেখনীধারণমাত্রই লেখা পরিসমাপ্তি হইল। তালপত্র খানি ঘরের চালায় গুঁজিয়া রাখিয়া শ্রীরূপ সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন।

এই সময়ে প্রভু ধীরে ধীরে শ্রীরূপের বাসায় আসিলেন। শ্রীরূপ তখনও স্নান করিয়া ফিরেন নাই। স্নানের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে শ্রীরূপের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা হইলে হয়তো প্রভু আর শ্রীরূপের বাসায় না আসিলেও পারিতেন। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। শ্রীরূপ নিষ্ঠাবান ভক্ত। বিনয় ও দৈন্য ভক্তির অঙ্গ। শ্রীরূপ বিনয়ের খনি, দীনতার আদর্শ। তিনি সংকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ হইযাও নিজকে যবনাধম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মনে হইত, যবনের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া, যবন সংসর্গে কালাতিপাত করিয়া আমি যবন হইয়া গিয়াছি। কোন সাহসে পবিত্র শ্রীমন্দির স্পর্শ করিব। এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরূপ শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। তাঁহার দাদা সনাতনেরও এই ব্রত ছিল। তিনিও শ্রীমন্দির স্পর্শ করিতে সাহস করিতেন না। এই শ্রেণীর আর একজন ভক্ত ছিলেন—পরমারাধ্য হরিদাস। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে না যান এই তিনজন॥

সুতরাং জগন্নাথের উপলভোগের সময়ে এই তিন জনের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সমাগম হইত না। কিন্তু স্নেহময় মহাপ্রভু উপলভোগ দর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় ইঁহাদিগকে দর্শন দিয়া যাইতেন। শ্রীরূপের বাসায় শ্রীচরণার্পণ করিয়া প্রভু দেখিলেন শ্রীরূপ বাসায় নাই। তিনি দৈবাৎ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঘরের চালে একখানি তালপত্র গোঁজা রহিয়াছে। প্রভু তালপত্রখানি বাহির করিয়া দেখিলেন উহাতে একটি শ্লোক লিখিত রহিয়াছে। প্রভু পড়িতে লাগিলেন ;—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্‌ মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

এই শ্লোকটীই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমাশ্রুপূর্ণনেত্রে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে

তালপত্রে লিখিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহ সম্মিলিত হইলেন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম তাঁহার পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হইল না, তাই তিনি ললিতাকে বলিলেন,—"সহচরি, আজ কুরুক্ষেত্রে সেই এই প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গসুখ লাভ করিলাম, আমিও সেই রাধিকা, সঙ্গম-সুখেও কোনও বিভিন্নতা নাই, কিন্তু তথাপি কালিন্দীপুলিন-বনে মধুর মুরলীর পঞ্চম রবে সঙ্গম-সুখের যে মাধুর্য্য অনুভব হয়, এখানে সেরূপ কোন সুখের অনুভব হইতেছে না। আমার মন সেই মধুর মুরলীর পঞ্চম-রবে ব্যাকুলিত শ্রীবৃন্দাবনের জন্যই আকুল হইতেছে।"

মহাপ্রভু বিস্ময়াবিষ্টভাবে শ্লোকটী পাঠ করিলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে শ্রীরূপ আসিয়া দেখিতে পাইলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছেন। শ্রীরূপ সলজ্জভাবে অমনি প্রাঙ্গণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন আনন্দে বিভোর হইয়াছেন। তিনি আহ্লাদে অধীর হইয়া শ্রীরূপের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে ধরিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গলাভে শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু যে নাচিতে নাচিতে "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার মর্ম্ম-সখা এক স্বরূপ ভিন্ন ঐ শ্লোকের মর্ম্ম আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। প্রভু শ্রীরূপের শ্লোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ এই যে শ্রীরূপ তাঁহার মনের ভাব কিরূপে জানিলেন? "য কৌমারহরঃ" শ্লোকের ভাষা, ভাব ও ছন্দের সম্পূর্ণ সাম্য রাখিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী নিমেষের মধ্যে "প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ" এই শ্লোক বিরচিত করেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ কাব্য-প্রকাশের শ্লোক ও স্বরূপের পদ-গান শুনিয়া মহাপ্রভুর মনের ভাব

বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বেও প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ মহাভক্ত, মহাকবি। তাঁহার এই শ্লোকটী প্রকৃতই কাব্যসিন্ধুর দুর্লভ সুধাস্বরূপ। এই শ্লোকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে, যথা ;—

যে কালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহা এই পদ মাত্র করেন গায়ন ॥

তথাহি পদম্।

"সেইতো পরাণ নাথ পাইনু,
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরিগেনু।"
এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

শ্রীরূপের রচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকটী প্রভুর ঠিক মনের কথা। প্রভু যাহা মনে করিয়া "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ সেই সেইভাব সেই ছন্দ ঠিক রাখিয়া উক্ত শ্লোক রচনা করেন। সুতরাং প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্লোকটী পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন :—

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন ॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের বর্ণন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাহা গোপবেশ, কাহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥—অন্ত্যলীলা।

ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের কি অদ্ভুত ভাববৈচিত্র্য! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি পাঠকগণের অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধিকা অনন্ত মাধুর্য্যময় মুরলীধারী শ্রীমদনমোহনের রূপমাধুরী দেখিয়া যেরূপ আকুল হইতেন, এই হস্তহীন "চকা-বকা" মুখ-বিশিষ্ট শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনে মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ন্যায় আকুল হইয়া "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, আর নয়ন-জলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই প্রাণনাথকে পাইয়াও মনের মত সঙ্গ-সুখ-সম্ভোগের আনন্দ অনুভব হইল না। "রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহনে" মন মাতিল না। সেই গোপবেশ, সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন-লাভের জন্য হৃদয়ের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। শ্রীরূপ বাস্তবিক উক্ত শ্লোকে মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকের টীকায় ঐ শ্লোকটীর শ্রীভাগবতানুগত ভাবের ধ্বনি করিয়া রাখিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও শ্রীভাগবতের ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা :—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন। গোপীগণ অতীব প্রেমিকা। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লইয়া কি করিবেন? গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, এবং ব্রজ ছাড়া অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণরস-মাধুর্য্য অনুভব করিতেও সমর্থ হয়েন না। রাজবেশ হাতী ঘোড়া ও জন-মানব-প্রবাহের কল্লোল-কোলাহলে তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়ে। তাঁহারা সেইজন্য গোপবেশ ও নির্জ্জন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের আকাঙ্ক্ষা করেন। এই শ্লোকে বক্রোক্তি দ্বারা তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন! উক্ত শ্লোকের

বৈষ্ণব-তোষিণী টীকায় "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের ধ্বনি দিয়া শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ" দ শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই তিনটী শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়া সবিশেষ রসের পুষ্টি করিয়াছেন। রসিক মহানুভব-চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহোদয় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে :—

হে নলিননাভ, হে অজ্ঞানধ্বান্তভাস্কর, আমরা তোমার তত্ত্বজ্ঞানানলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছি। আমরা চকোরী, তোমার শ্রীমুখশশীর হাসিমাখা জ্যোৎস্না-সুধাই আমাদের জীবনের অবলম্বন। আমরা তত্ত্বজ্ঞান লইয়া কি করিব? একবারে শ্রীবৃন্দাবনে চল। রাসাদিবিলাসের দ্বারা আমাদের প্রাণ রাখ। আরও দেখ, যোগেশ্বরগণ তোমার চরণ স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করেন, কিন্তু আমরা কি তাহা পারি? আমরা উহা বক্ষের উপর ধারণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকি। যোগেশ্বরগণ গম্ভীরবুদ্ধি, তাহারা তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিতে পারেন; কিন্তু আমরা একে অবলা, তাহাতে আবার বুদ্ধিহীনা, আমরা কি করিয়া তোমার ধ্যান করিব, তোমার শ্রীচরণ চিন্তা করিতে গেলেই আমরা মূর্চ্ছা সাগরে ডুবিয়া যাই। আমরা কোন বলে তোমার ধ্যান করিব? তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিলে লোকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পায় তাহা সত্য, কিন্তু যাহারা তোমার বিরহ-সমুদ্রে ভাসমান, তাহারা তোমার শ্রীচরণতরণীর সঙ্গাবলম্বন ভিন্ন কিছুতেই উদ্ধার পায় না। আর আমাদের সংসার কূপই বা কি? আমরা যে তোমার জন্য শিশুকাল হইতেই সংসার ছাড়িয়া তোমার বিরহসাগরের অকূল পাথারে ভাসিয়া চলিয়াছি। পাদপদ্মের চিন্তায় আমাদের কি হইবে? আমরা শ্রীচরণ-সঙ্গ ভিন্ন কিছুতেই দেহধারণ করিতে পারিব না। যদি বল "দ্বারকায় চল সেই খানেই তোমাদের সহিত কেলিবিলাস করিব।" আমরা তাহাও পারি না। শ্রীবৃন্দাবন আমরা বড় ভালবাসি। বৃন্দাবন ছাড়িতে পারিব না। তোমার এই রাজবেশ, আর তোমার এই রাজধানী,—ইহার কিছুই আমাদের

হৃদয়ে ভাল লাগে না। তোমার পরণে ধড়া, মাথায় চূড়া, আর হাতে মোহন বাঁশী, ঐরূপ দেখিতে আমরা বড় ভালবাসি।"

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের তালপত্রে লিখিত প্রাগুক্ত শ্লোকের ইহাই মর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপ-বেশ, কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

মহাপ্রভু শ্রীরূপের এই শ্লোকে প্রকৃতই বিস্মিত হইলেন। তিনি স্বরূপ গোসাঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপ, শ্রীরূপ আমার মনের কথা কিরূপে জানিল? স্বরূপ বলিলেন, তোমার কৃপা ভিন্ন কে তোমার মনের কথা জানিতে পারে! আমার মনে হয় তুমি কোন না কোন সময়ে ইহাকে কৃপা করিয়াছ, নচেৎ তোমার কথা অন্যে কি করিয়া জানিবে?

মহাপ্রভু। তা ঠিক্। পূর্ব্বে প্রয়াগে ইঁহার সহিত আমার যখন দেখা হয়, তখন ইঁহাকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া শক্তি সঞ্চার করি, এবং কিছু উপদেশও প্রদান করি। শ্রীরূপ রস-বিচারে অতি যোগ্য। তুমিও ইহাকে রসের বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিবে।

স্বরূপ। তুমি যে ইহার প্রতি কৃপা করিয়াছ, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? এই শ্লোক দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন এরূপ হয় না। "ফলেন ফল-কারণমনুমীয়তে।" অর্থাৎ ফল দেখিলেই ফলের কারণানুমান হইয়া থাকে। নৈষধকার বলেন :—

স্বর্গাপগাহেম মৃণালিনীণাং
নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ
অন্নানুরূপাং তনুরূপ ঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীত।

৩য়-সর্গ ১৭ শ্লোক নৈষধ।

অর্থাৎ দময়ন্তীকে হংস বলিতেছেন, আমরা স্বর্গনদীর স্বর্ণ কমলিনীর ও মৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করি। সুতরাং ভক্ষ্য বস্তুর

অনুরূপ শরীর সৌন্দর্য্য-সম্পৎ লাভ করিয়াছি, যেহেতু কারণ হইতেই কার্য্য উহার গুণ লাভ করিয়া থাকে।" শ্রীরূপের শ্লোক দেখিয়াই বুঝিয়াছি প্রভুর কৃপা ব্যতীত কখনও এমন শ্লোক রচিত হইতে পারে না। শ্রীল সার্ব্বভৌম এবং শ্রীল রায় রামানন্দ মহাশয়ও শ্লোক শুনিয়া ঐরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করেন।

যে শ্রীরূপ প্রভুর শক্তি-সঞ্চার-ফলে এইরূপ কবিত্ব ও রসতত্ত্ববিচারে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, স্বরূপ সেই শ্রীরূপকেও বিশেষরূপে রসতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য প্রভু দ্বারা আদিষ্ট হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে॥

মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও উহাঁয় রসের বিশেষ॥

অন্ত্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ প্রকৃতই যে রস-স্বরূপ ইহাতে তাহা আরও স্পষ্ট-রূপে বুঝা যাইতে পারে। মহাপ্রভুর কৃপা আদেশে শ্রীপাদ স্বরূপ রস-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপেরও রসতত্ত্ব শিক্ষার গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বরূপের সখা।

শ্রীপুরুষোত্তমে স্বরূপের একজন প্রিয়তম সখা ছিলেন,—শ্রীভগবান আচার্য্য। স্বরূপের অন্য সখা শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। তাঁহার কথা পরে বলিব। ভগবান আচার্য্য ঐশ্বর্য্যবিলাসের কোমল কোলে লালিত পালিত এবং প্রবর্দ্ধিত হইয়াও বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত ও পরিপূজিত হইতেন। ভগবান আচার্য্যের পিতা শতানন্দ খান প্রচুর সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। এই শতানন্দের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠের নাম ভগবান আচার্য্য ও কনিষ্ঠের নাম গোপাল ভট্টাচার্য্য। খান মহাশয়ের এক পুত্র আচার্য্য ও অপর পুত্র ভট্টাচার্য্য উপাধি লাভ করিলেন কি প্রকারে, এ সম্বন্ধে পাঠকগণের হৃদয়ে কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা শ্রীগ্রন্থে এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা দেখিতে পাইলাম না। এ সম্বন্ধে যুক্তি-সঙ্গত অনুমান এই যে শতানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান রাজ-সরকারে কার্য্য করিয়া খান উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এখনও অনেক স্থলে "খান" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। শতানন্দ খান মহাশয় বিষয়ী ছিলেন। বিষয়ানুগত পদবীতেই তাঁহার পদবী চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পুত্রদের জীবনস্রোত অন্য পথে পরিচালিত হওয়ায় তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পদবীতে জনসমাজে খ্যাত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল কাশীতে ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীভগবান "আচার্য্য" পদবী প্রাপ্ত হইলেন কেন, এ সম্বন্ধে আমাদের অনুমান প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীভগবান শাস্ত্রাধ্যায় করিয়া পরম পণ্ডিত হইলেন, আর্য্য-পথে তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইল। তিনি বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বন করিলেন।

যথা চৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥

*　　　*　　　*

তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়-বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য-প্রধান॥

যদিও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বংশপরম্পরায় "আচার্য্য" পদবী চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এই ভগবান যে আচার্য্য পদবী লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার নিজের আচরণে ও পাণ্ডিত্যে। তিনি সুপণ্ডিত, অশেষ শাস্ত্রোধ্যাপক, আর্য্যমার্গানুসারী ও বিষয়-বিমুখ। শাস্ত্রানুসারেই তিনি আচার্য্যপদলাভের উপযুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রকার বলেন ঃ—

১। আচারে শাসয়েদ্ যস্ত স আচার্য্য উদাহৃতঃ।
২। উপনীয় তু যঃ শিষ্য বেদমধ্যাপয়েদ্দিজঃ।
সঙ্কল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যঃ প্রচক্ষ্যতে॥
৩। আম্নায়তত্ত্ব বিজ্ঞানাচ্চরাচর সমাসতঃ।
যমাদিযোগসিদ্ধত্বাদাচার্য্য ইতি কথ্যতে॥

ইত্যাদি বচন-প্রমাণে সদাচারাভিজ্ঞ, সুনিপণ অধ্যাপক ও আম্নায়-তত্ত্ববিজ্ঞানশীল শ্রীভগবান্ খান আচার্য্য পদবী লাভের যথার্থ গুণবত্তা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃত আচার্য্যের যে সকল গুণ থাকা উচিত, সকলই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। বিলাসের কোমল কোলে প্রতিপালিত হইয়াও ভগবান আচার্য্য কঠোর বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী ছিলেন। যম নিয়মাদি দুশ্চর তপশ্চর্য্যা দ্বারা তিনি একান্ত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়-বিমুখতা ও বৈরাগ্যব্রত দেখিয়া শ্রীদামোদর-স্বরূপ তাঁহাকে আপন বলিয়া মনে করিলেন। ক্রমেই উভয়ের যখন গাঢ় পরিচয় হইতে লাগিল তখন উভয়েই উভয়কে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্যের হৃদয় সরল ও সতত সখ্যভাবময়, ব্রজ-বালকদের মত সদানন্দ ও প্রফুল্ল-ভাব, তাঁহার সেইরূপ উদ্যম ও নিরন্তর সেইরূপ তরুণ তারল্য।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

সখ্য ভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ গোসাঞীর সহ সখ্য ব্যবহার॥

কেবল ইহাই নহে। ইনি একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রিত। সুতরাং এতাদৃশ মহাপুরুষ যদি স্বরূপ-গোসাঞীর সখা না হয়েন, তবে আর তাঁহার সখার যোগ্য কে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীভগবান্ আচার্য্যের যত গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গুণ এই যে :—

"একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্য চরণ।" (২)

---

(২) একান্ত ভাবে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করা কাহাকে বলে, ভক্তি-নিষ্ঠ পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের নিমিত্ত এই সম্বন্ধে দুই একটী কথা এখানে আলোচ্য। ঐকান্তিকতা বা একান্ত ভাব কাহাকে বলে, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তৎসম্বন্ধে প্রমাণ আছে। এ স্থলে তাহা উল্লেখযোগ্য। তদ্‌যথা :—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তা স্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥

অর্থাৎ "যাঁহারা একান্তভাবে সর্ব্বদা বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই প্রতিনিয়ত ভাগবতচিত্ত ব্যক্তিগণ একান্তী নামে অভিহিত।" এই একান্ত ভাবটী কি, অন্য একটী শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

অর্থাৎ "সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। সাধুরা আমা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত আর কিছু জানি না।" ফলতঃ সকল পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগহৃদয়ে একমাত্র শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করাই ঐকান্তিকতা। সৎস্ত্রী যেমন সৎপতির হৃদয় প্রেম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া লয়েন, সাধুগণও একান্ত প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে তেমনি বশীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এতাদৃশ ভক্তগণকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা এই যে :—

যে দারাগার পুত্রাপ্তান প্রাণান্ বিত্ত মিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তু মুৎসহে।

অর্থাৎ "যাঁহারা স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রাণ ধনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?" ফলতঃ ভক্তজন-প্রিয় শ্রীভগবানের হৃদয় সততই তাঁহার একান্ত ভক্তগণের অধিকারভুক্ত।

শ্রীভগবান্ আচার্য্য সমস্ত বিষয় ও সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুতে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি-নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে আপন আলয়ে তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। প্রভু আমার সন্ন্যাসী। তাঁহার আহারের উপকরণ দেখিয়া শ্রীভগবান আচর্য্যের হৃদয়ে সময়ে সময়ে বড় দুঃখ হইত। বিশেষতঃ নিষ্ঠুর রামচন্দ্রপুরী প্রভুর সেবায় উপচারাধিক্য দেখিলেই কটাক্ষ করিতেন। এমন কি প্রভুর গৃহে একটী পিপীলিকা দেখিলে রামচন্দ্রপুরী তৎক্ষণাৎ প্রভুর সম্মুখেই বলিতেন "এই যে পিপীলিকা দেখিতেছি, রাত্রিতে অবশ্যই এখানে গুড়

এই একান্তিকা চারি প্রকার, তদ্‌যথা :—

(১) বাহ্য ধর্ম্মের প্রতি অনাদর যেমন :—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অথবা—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবনাত্মভাবিতঃ।
সঃ জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাং॥

(২) কর্ম্ম জ্ঞানাদির অশেষ-নিরপেক্ষতা, যেমন :—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমাঃ নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥

(৩) বিঘ্নসত্ত্বেও রতিপরতা, যেমন :—

আপদ্‌গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং সবৈ ভাগবতো নরঃ॥

(৪) প্রেমৈকপরতা যেমন,—

সেবা ময়ীশে কৃত সৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভর বার্ত্তিকেষু
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন যাঁহারা আমাতে সৌহার্দ্দ্য করিয়া তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, এবং আমাতে রতিবশতঃ স্ত্রী পুত্র দেহ গেহাদিতে রতিবিহীন হয়েন ও দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যাবৎমাত্র ধনের প্রয়োজন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহারাই মহৎ। ইহাই একান্তি-ভক্তের লক্ষণ।

আনা হইয়াছিল। বিরক্ত সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়লালসা ভাল নয়।" প্রভু এইরূপ শাসনবাক্য সসম্ভ্রমে ও নীরবে শুনিতেন, কোনও প্রত্যুত্তর দিতেন না। পরন্তু তিনি ইহাতে অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। আচার্য্য এই জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে গোপনে গোপনে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানা উপচারে তাঁহার সেবা করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঃ—

পণ্ডিতগোসাঞী ভগবান্ আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিন যদি করেন নিমন্ত্রণ॥
তাঁসভার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাহি যৈছে তার মন॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহা যৈছে যোগ্য তৈছে করেন ব্যবহার॥
কভু ত লৌকীক রীতি যৈছে ইতর জন।
কভুবা স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্য প্রায়।
কভু তারে নাহি মানে দেখে ভৃত্য প্রায়॥
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর, বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন প্রভু সেই মনোহর॥—অন্ত্যলীলা॥

সেবাবাদী রামচন্দ্রপুরীর শাসনে ভক্তগণ মনের সাধে প্রভুকে সেবা করাইতে পারিতেন না। তাই আমাদের প্রাণাধিক শ্রীভগবান আচার্য্য মধ্যে মধ্যে প্রভুকে গোপনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। একান্ত ভক্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্যের সেবানুরাগ কি মধুর ও সুন্দর!

এই শ্রীভগবান্ আচার্য্যের ছোট ভ্রাতা শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত পাঠ সমাপন করিয়া তাঁহার দাদার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ছোট ভাইটীকে লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন করাইলেন। ভগবানের ভ্রাতা গোপালকে দেখিয়া প্রভু বাহিরে বাহিরে শিষ্টাচার সম্মত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। না হওয়ার কারণ এই যে গোপাল তখনও ভক্তি-পথের

পথিক হয়েন নাই। ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই শ্রীভগবানের পরিতুষ্টি হয় না। কৃষ্ণভক্তি-বিহনে কিছুতেই প্রভুর উল্লাস জন্মে না।

গোপাল তাঁহার অগ্রজ শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহানুভবের নিকট পুরুষোত্তম অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কাশী হইতে বেদান্ত পাঠ করিয়া আসিয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছা, ছোট ভাইটী সকলের নিকট পরিচিত হউক। তাই তিনি একদিবস তাঁহার প্রিয় সখা দামোদর-স্বরূপকে বলিলেন "অভিন্ন হৃদয়, আমাদের গোপাল কাশী হইতে বেদান্ত পাঠ করিয়া আসিয়াছে, একবার তাহার মুখে বেদান্তভাষ্য শুনা যাউক না কেন?"

কথাটা স্বরূপের নিকট ভাল বোধ হইল না। স্বরূপ রস-স্বরূপ। ভগবান স্বরূপের প্রিয় সখা হইয়া স্বরূপের হৃদয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন নাই। স্বরূপের ক্রোধ হইল। স্বরূপের আবার ক্রোধ কি? অন্য কেহ এরূপ কথা বলিলে স্বরূপ সেস্থান হইতে নীরবে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু ভগবান আচার্য্য তাঁহার সখা। সখার সহিত সখার রসকোন্দল শুনিতে অতি মধুর। স্বরূপ বলিলেন "আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে। এখন দেখিতে পাইতেছি গোপালের সঙ্গ করিয়া তুমি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়াছ। ছি, ছি, ছি। মায়াবাদ শুনিতে তোমার এমন প্রবৃত্তি হইল কেন? শঙ্করের শারীরক ভাষ্য ঘোর মায়াবাদ। ইহা কি বৈষ্ণবের শুনা উচিত? যাহাতে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়, ক্ষুদ্র জীব আপনাকে "সোঽহং" বলিয়া মনে করে, এমন মায়াবাদ কি বৈষ্ণব সাধ করিয়া শুনিতে চায়? মায়াবাদ এমনি বিষপূর্ণ যে উহা বৈষ্ণবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই বৈষ্ণবতা নষ্ট হয়। যিনি মহাভাগবত, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণধন বলিয়া মনে করেন, মায়াবাদ শ্রবণ করিলে সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাসীর মনও ফিরিয়া যায়।"

আচার্য্য বলিলেন, "সেকি কথা! আমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ। গোপালের মুখে শাঙ্করভাষ্য শুনিয়াই চিত্ত বিচলিত হইবে, ইহাও কি হয়? শ্রীকৃষ্ণে আমাদের অটল বিশ্বাস। মায়াবাদে আমাদের কি করিবে? ভাষ্য শুনিলেই কি আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিবে?

স্বরূপ বলিলেন "আচ্ছা, মায়াবাদ শুনিয়া তোমার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্ত নাই বা টলিল। কিন্তু তুমি কি করিয়া মায়াবাদ শুনিবে? শুনিয়া কি তোমার কষ্ট হইবে না? মায়াবাদের মত এই যে, ব্রহ্মচিন্মাত্র, শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ মায়া-কল্পিত, অজ্ঞানবিলসিত, ভ্রমময় ও অসার। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রেম-নিকেতন শ্রীভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ কদর্য্য অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনিয়া তোমার হৃদয় কি বিদীর্ণ হইবে না?"

এই কথায় আচার্য্য লজ্জায় মুখ নত করিলেন, আর কোন উত্তর না করিয়া নীরবে আপন ক্রুটী স্বীকার করিলেন। আচার্য্য সেই দিন হইতেই বুঝিলেন তাঁহার স্নেহের সহোদর গোপালের সঙ্গ,—তাঁহার পক্ষে কুসঙ্গ-স্বরূপ। স্বরূপের প্রেম-তিরস্কারে ভগবানের চক্ষু ফুটিল, তিনি তাঁহার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গোপালকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, আর গোপালের সঙ্গ করিলেন না।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ এ স্থলে শাঙ্করভাষ্যের কথা-প্রসঙ্গে মায়াবাদের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই শ্রীভগবান আচার্য্যকে নীরব করিয়া দিলেন। শ্রীভগবান আচার্য্য ভক্ত ও পরম পণ্ডিত, কিন্তু অতি সরল। মায়াবাদের অন্তরালে যে নিদারুণ বিষরাশি রহিয়াছে, তিনি তাহা ভাবেন নাই। যে নিত্য-সত্য-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণের আরাধ্য পদার্থ, মায়াবাদের অসার যুক্তি সেই প্রিয়তম প্রাণারাধ্য পদার্থকে কাল্পনিক ও অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত করিয়া তোলে। ভক্তের প্রাণে এইরূপ ভগবদবজ্ঞা সহ্য হয় কি? স্বরূপের এই এক কথাতেই শ্রীভগবান আচার্য্য নীরব হইলেন। তিনিও ঐ মুহূর্ত্তেই তাঁহার অসঙ্গত অনুরোধের অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এই স্থানেই মায়াবাদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথার আলোচনা করিয়া শাঙ্করভাষ্য-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইতাম, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নাটক-সমালোচনায় শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখ নির্গত উপদেশ লহরীর আলোকেই সেই তত্ত্ব পাঠকগণের দৃষ্টি গোচর হইবে। এক্ষণে সেই প্রসঙ্গের উত্থাপনা করা যাইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্বরূপের গ্রন্থ-সমালোচনা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম এই সময়ে সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সন্দর্শন করিতেন। দেশের কবিগণ তাঁহার মহিমা ও কৃপা-সম্বন্ধে বাঙ্গলায় ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতেন। দেবোপাসক মনুষ্য ফুলের বাগানে গেলে তাঁহার প্রিয়তম উপাস্য দেবের জন্য যেমন বাছিয়া বাছিয়া ফুল-চয়ন করেন, কবিগণও তেমনি তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব-উদ্যানের সরস ও সুন্দর ভাবগুলি লইয়া, সরস ও সুন্দর ভাষাসূত্রে উহাদিগকে গ্রথিত করিয়া, কবিতা-কুসুমের মালা গাঁথিয়া, প্রভুর চরণে অর্পণ করিতেন। এইরূপে ভক্ত-কবিগণ কবিতা-কুসুমের সুন্দর গুচ্ছে অথবা কবিতা-কুসুম-মালায় আমাদের শ্রীপ্রভুর কুসুম-সুকোমল শ্রীচরণকমলের পূজা করিতেন। যাঁহার যেমন শক্তি, যাঁহার যেমন ভক্তি, তিনি সেইরূপ ভাব ও ভাষাতেই প্রভুর কৃপাসূচক কবিতা ও গ্রন্থ লিখিয়া আনিয়া ভক্ত-সমাজে পাঠ করিতেন। প্রভুর প্রতি অনুরাগ ব্যতীত ইহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা প্রকাশের কোনও অভিসন্ধি থাকিত না। তবে তাঁহাকে উহা শুনাইতে হইলে শ্রীদামোদর-স্বরূপের পরীক্ষা ও অনুমোদন ভিন্ন সে আশা সফল হইত না।

পূর্ব্ববঙ্গের একজন পণ্ডিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া একখানি নাটক লিখেন। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবান্ আচার্য্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি নাটক খানি লইয়া শ্রীভগবান্ আচার্য্যের নিকতনে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কবি প্রথমতঃ নাটক খানি শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে শুনাইলেন। সেখানে তখন আরও অনেক বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই নাটক শুনিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ

করিলেন। সকলেরই ইচ্ছা—মহাপ্রভুকে এই নাটক শুনাইতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীত হউক, শ্লোক হউক, আর গ্রন্থই হউক, স্বরূপের অনুমোদন ভিন্ন উহা মহাপ্রভুর শ্রবণ গোচর করাইবার আর অন্য উপায় নাই। রসাভাস বা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা শুনিলে মহাপ্রভুর অত্যন্ত ক্লেশ হয়। এইজন্য তাঁহার নিয়ম এই যে যদি কেহ কোন গ্রন্থ, গীত বা শ্লোক তাঁহাকে শুনাইতে ইচ্ছা করেন, পূর্ব্বেই স্বরূপ তাহার বিচার করিবেন। রসস্বরূপ স্বরূপের অনুমোদিত হইলে প্রভু তাহা শ্রবণ করিবেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

গীত শ্লোক গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঁঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥

সুতরাং শ্রীভগবান আচার্য্য স্বরূপের নিকট গিয়া বলিলেন "একটী কবি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিয়া আনিয়াছেন। আমি নাটকখানি শুনিয়াছি, শুনিয়া সুখী হইয়াছি। গ্রন্থখানি ভালই হইয়াছে। তুমি একবার শুনিয়া অনুমোদন করিলেই মহাপ্রভুকে শুনাইতে সাহস হয়।" স্বরূপ বড় তীক্ষ্ণ সমালোচক। স্বরূপের জানা আছে মহাভক্ত ভিন্ন কেহই বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত সমন্বিত, রসাভাসবিহীন শ্রীশ্রীলীলাত্মক নাটক লিখিতে সমর্থ নহেন। তাই তিনি তাঁহার প্রিয়সখা শ্রীভগবান আচার্য্যের কথায় একটু উপেক্ষা করিয়া বলিলেন "তুমি গোপ-অবতার, তোমার স্বভাব অতি উদার, যে-সে কথা, যে-সে গ্রন্থ, যে-সে শ্লোক শুনিলেই তোমার আহ্লাদ হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঠিক রাখিয়া, রস ঠিক রাখিয়া লেখা কি সকলেরই সাধ্যায়ত্ত? যে-সে কবির কাব্যে যে রসাভাস ও সিদ্ধান্ত বিরোধ ঘটিবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? এই সকল কাব্য শুনিয়া

মনে উল্লাস হয় না, প্রত্যুত ক্লেশের কারণই হইয়া থাকে। রস, রসাভাস, ভক্তি-সিদ্ধান্ত, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও নাটক-অলঙ্কার প্রভৃতিতে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় ভক্তজনশ্রবণযোগ্য নাটক লেখা অসম্ভব। তার পরে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা তো একবারেই দুর্গম ও রহস্যময়। এ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা সাধারণ কবির পক্ষে একবারেই অসঙ্গত।

যিনি একান্ত ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার যদি কাব্য নাটকাদি লিখিবার উপযুক্ত বিদ্যা ও প্রতিভা থাকে তবে তিনিই এই লীলা সম্বন্ধে নাটক লিখিতে পারেন। নচেৎ তাহা যে-সে লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্তরঙ্গ না হইলে তাঁহার কবিতা শুনিয়া বড় সুখের আশা করা যায় না। শ্রীরূপ যে দুইখানি নাটকের আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধ শুনিলেই হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠে।" স্বরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়া ঐ নাটক-শ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মনে হইতে পারে শ্রীস্বরূপ নাটক পড়িলেন না, দেখিলেন না, অথচ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ প্রতিকূল সমালোচনার সূত্রপাত করিলেন কেন? ইহার উত্তরে প্রথমতঃ এই বলা যাইতে পারে যে স্বরূপ এই কবির বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে হয় তো পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নাম ও গুণগ্রাম স্বরূপের অবিদিত ছিল না। এই অভিনব কবির যদিও মহাপ্রভুতে অনুরক্তি ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন অপরের লেখায় রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ-দোষ সংঘটিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তৃতীয়তঃ মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চার ভিন্ন বিশুদ্ধ, সিদ্ধান্তপূর্ণ, রসাভাসবিবর্জ্জিত, মাধুর্য্যময়, শ্রবণসুখদ, কাব্য শ্লোক বা গীতিকা রচিত হওয়া একবারেই অসম্ভব, ইহাও স্বরূপের বিশ্বাস ছিল। শ্রীরূপের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ" শ্লোক দেখিয়া স্বরূপ বলিয়াছেন—

———যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহুঁ জানিল॥

মহাপ্রভুর কৃপা ভিন্ন বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-সমন্বিত ভক্তিরসাত্মক কাব্যাদি

রচনা করা অসম্ভব, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এইরূপ মনে করিতেন। তাই শ্রীরূপের নাটক শুনিয়া রায় শ্রীরামানন্দ বলিয়াছিলেন—

তোমার শক্তি বিনে জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥

তদুত্তরে প্রভু বলেন "প্রয়াগে ইঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। ইনি অতি গুণবান্। সেখানে ইঁহার গুণে আমার হৃদয় মুগ্ধ হয়। রসের প্রচার করিতে হইলে এইরূপ কাব্য-প্রসঙ্গেরই প্রয়োজন। তোমরা সকলেই কৃপা করিয়া ইঁহাকে এই বর দাও যেন তোমাদের বরে ইঁহার ব্রজলীলা-প্রেমরস-বর্ণনে অধিকার জন্মে।"

রসের প্রচার করিতে হইলে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, মাধুর্য্যময়, প্রকৃত রসময় কাব্যের প্রচার একান্ত প্রয়োজন ইহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি। শ্রীরূপের নাটকের কথা উল্লেখ করিয়াই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের নিকটেও শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপের ঐ দুই নাটকের কথাই উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

রূপ যৈছে দুই কাব্য করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥

এই দুই কাব্যও সর্ব্বপ্রথমে শ্রীস্বরূপের নিকটেই উপস্থিত করা হয়। প্রথমতঃ শ্রীস্বরূপই ইহার রসাস্বাদন করিয়া পরে রসগ্রাহী বৈষ্ণব-সমাজে উপস্থিত করেন। পরমরসিকচূড়ামণি শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট এই গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ যাহা বলিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যামৃত উহা এইরূপ লিখিত আছে—

স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে
আরম্ভিয়া ছিলা ; এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া।
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।

প্রভুর কিরূপ আদেশে শ্রীরূপকে দুইখানি পৃথক নাটক করিতে হইল, এখানে সে কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার কৃপাময় আদেশ এই যে—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান্ কাঁহাতে॥

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্যই মহা প্রমাণ। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই বাক্য বলিলেন বুদ্ধিমান্ লোক আপন কল্পনাবলে তাঁহার একটা যুক্তি দিতে পারেন, অপরে বুদ্ধিবলে সে যুক্তি বিনষ্টও করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করাই আমাদের কর্তব্য কর্ম্ম। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই আদেশ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্‌যথা—

কৃষ্ণোঽন্যোযদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি।

কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণকে ইহাতে সীমাবদ্ধ করা হয়। যিনি সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত হয়েন, অসীম অনন্ত হইয়াও যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহে সসীম হইয়া বিরাজ করেন, তাঁহার সীমাবদ্ধতা ও অসীমতা মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অবিতর্ক্য। কিরূপে কি ভাবে সিদ্ধ ভক্তগণের নিকট তাঁহার লীলারসের পুষ্টি হয় তাহা তিনিই জানেন, আর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণই জানেন, উহা অপরের দুরধিগম্য।

আধুনিক শিক্ষিত ও উদারচরিত ব্যক্তিগণ উদার ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া এই কথায় কি মনে করেন, আমরা তাহা জানি না, কিন্তু প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীরূপকে এই আদেশ মানিয়া পৃথক্ নাটক রচনা করিয়া রসাভাস দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধাবস্থার তত্ত্ব কথা। বহির্জগতের মতামতের সহিত এ কথার কোন সম্পর্ক নাই।

রসের এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব স্বরূপ ও মহাপ্রভুর কৃপা ভিন্ন জানিবার আর অপর উপায় নাই। তাই শ্রীস্বরূপ যে-সে কবির কাব্য এইরূপ উপক্ষার

বিষয় ও শ্রবণের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি তাঁহার প্রিয় সখা শ্রীভগবান্ আচার্য্যের আশ্রিত কবির নাটক খানি পাঠ করিতে তত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আচার্য্য কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি শুনিলেই ভালমন্দের বিচার হইবে।" এইরূপে তাঁহার সখার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বরূপ ভক্ত-সমাজে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে সম্মত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

নাটক সমালোচনা ও মায়াবাদ।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর আজ পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নাটক পরীক্ষা করিবেন, ভক্তগণ নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে এই জন্য সমবেত হইলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনই নাটকের বিষয়, সুতরাং ভক্তগণের হৃদয়ে ঐ নাটক-শ্রবণের নিমিত্ত যেন আনন্দ আর ধরিতেছে না। যথাসময়ে শ্রীস্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাটক-প্রণেতা ব্রাহ্মণ অতীব ব্যগ্র ভাবে স্বরূপকে প্রণাম করিলেন। স্বরূপ বলিলেন "তোমার নাটকের নান্দী শ্লোক পাঠ কর, শুনি।

কবি পড়িতে লাগিলেন ঃ—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

শ্লোকটী শ্রবণ করা মাত্রই এক স্বরূপ ব্যতীত সকলেই এক বাক্যে এই শ্লোকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ কিছুকাল নীরব থাকিয়া যেন একটু অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, "ওহে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা কর, একবার শুনা যাউক।" স্বরূপের আদেশ পাইয়া কবি এই শ্লোকের যে

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য গোসাঞী তাহাতে শরীরী মহাধীর॥
সহজ জন্য জগতের চেতনা করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূত॥

অর্থাৎ স্বভাবতঃ জড় ও অশেষ বিশ্বের চৈতন্য উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নযুগলশীল শ্রীজগন্নাথ নামধেয় দেহে যে কনক-কান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আত্মার স্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু স্বরূপের মুখে অসন্তুষ্টির চিহ্ন স্পষ্টতঃই প্রকাশ পাইল। স্বরূপ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন "মূর্খ, এই বুঝি তোমার নাটক লেখা? এই শ্লোকে তুমি যে কি ঘোরতর অপরাধ করিয়া রাখিয়াছ তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পার নাই।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তারে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥"

মহাপ্রভুর ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াই অবধারণ করেন। "শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞক দেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আত্মস্বরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন" এই কথায় শ্রীমূর্ত্তিকে জড় বলিয়া আরোপিত করা হইয়াছে। তাই স্বরূপ রুষ্টভাবে বলিলেন "শ্রীজগন্নাথকায় পূর্ণানন্দ ও চিৎস্বরূপ। উহাকে তুমি প্রাকৃত, জড় ও নশ্বরকায় বলিয়া কল্পনা করিয়াছ। প্রাকৃত দেহে যেমন আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সচেতন করে, পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথদেহ-সম্বন্ধেও সেইরূপ কল্পনা করা ঘোরতর অপরাধ। ইহাতে যে কেবল এক জগন্নাথের স্থানে অপরাধ হইয়াছে তাহা নহে, মহাপ্রভুর নিকটও তোমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে।"

পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
তারে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥

কোন দেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে সজীব করা ক্ষুদ্র জীবাত্মার কার্য্য। কিন্তু মহাপ্রভু পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যশীল, তিনি চিদানন্দদেহে স্বীয় ঐশ্বর্য্যে স্বীয় মহিমায় স্বপ্রকাশ। ক্ষুদ্র জীবাত্মার ন্যায় তিনি অপরদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হইবেন কেন? ক্ষুদ্র জীবাত্মা কর্ম্মফলে প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সচেতন করে। জীব-জগতে এই জন্য দেহ-দেহীর ভেদ রহিয়াছে। দেহী চলিয়া গেলে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। তদ্‌যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

অর্থাৎ মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র সমূহ গ্রহণ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করেন।

কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বরাট। তিনি স্বরূপ-শক্তি-বিশেষে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র জীবাত্মার ন্যায় তাঁহাকে অপর দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি যেমন আনন্দ স্বরূপ, তাঁহার দেহও তদ্রূপ। এই জন্যই "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ" বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। বরাহপুরাণ বলেন—

ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তি র্মেদমজ্জাস্থিসম্ভবা।
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতোঃবিভুঃ॥

শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে লিখিত আছে ঃ—

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, সুতরাং শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সচ্চিদানন্দরূপ। চিদ্রূপ শ্রীবিগ্রহ নিত্য, বিভু সর্ব্বাশ্রয়, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুর অতিরিক্ত, প্রত্যগ্‌রূপ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বশ্রুতিসিদ্ধ সুতরাং পরম তত্ত্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভ দেব বলিয়াছেন—

ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং
তত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ

পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরাদ্
অতোহি মামৃষভং প্রাহু রার্য্যাঃ

অর্থাৎ হে পুত্র! আমার মনুষ্যাকার এই শরীর অতীব দুর্বিভাব্য ইত্যাদি। এই উপলক্ষে ষট্‌সন্দর্ভকার পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন ঃ—"নবেবং ঋষভদেবস্যাপি বিগ্রহে তাদৃশতাচেৎ কিমুত স্বয়ং ভগবতঃ" অর্থাৎ ঋষভ দেবের দেহের সম্বন্ধেই যদি এই কথা হয়, তবে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের আর কথা কি? শ্রীভগবানের অংশাদির শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধেও শ্রীভাগবত বলেন—

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ
অস্পৃষ্ট ভুরি মাহাত্ম্য অপিহ্যুপনিষদ্‌ দৃশাম্।

হে মহারাজ! সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্র রূপ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই তাঁহাদের মূর্ত্তি স্বরূপ হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের মাহাত্ম্য জ্ঞান-চক্ষু আত্মজ্ঞজনগণেরও স্পর্শযোগ্য হয় নাই।

শ্রীভাগবতে বহু স্থলেই তাঁহার আনন্দ-মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। যথা—

"আনন্দ মূর্ত্তিমুপগৃহ্য দৃশাত্মলব্ধং।"

অর্থাৎ মথুরাবাসি স্ত্রীগণ উদ্ঘাটিত নেত্ররূপ-দ্বার দিয়া মনোমধ্যে উদিত আনন্দমূর্ত্তি বিভুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিরহজ ব্যথা প্রশমিত করিলেন। আবার কুব্জার কথাও শুনুন—

দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্যকান্তঃ আনন্দমূর্ত্তিমজহাদতিদীর্ঘ তাপম্।

কুব্জা দুই স্তনের মধ্যগত আনন্দ মূর্ত্তি কান্তকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকালের হৃদয়তাপ প্রশমিত করিলেন। লীলাশুক এই শ্রীমূর্ত্তিকে একবারেই "আনন্দ-সংপ্লব"বলিয়া বিনিশ্চয় করিয়াছেন, যথা—

মাধুর্য্য-বারিধি-মদাম্বু-তরঙ্গভঙ্গী-
শৃঙ্গার-শঙ্কুলিত শীত কিশোর বেশং
আনন্দহাস ললিতাননন-চন্দ্রবিম্ব
মানন্দ-সংপ্লবমনুপ্লবতাং মনো মে। (৩)

---

* (৩) মৎকৃত বেদান্তভাষ্য ও শ্রীআনন্দমীমাংসায় মায়াবাদ ও শ্রীআনন্দ মূর্ত্তি সম্বন্ধে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই মত যখন শ্রীবিগ্রহের স্বকীয় স্বরূপ, তখন সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ক্ষুদ্র দেহীর ন্যায় অপর দেহ গ্রহণ করিবেন কেন? সুতরাং বঙ্গদেশীয় কবিলিখিত বর্ণনায় তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বে দোষারোপ করা হইল। তাই পণ্ডিতকুল মুকুটমণি শ্রীস্বরূপ বলিলেন—

দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার, এই রতি॥

তিনি আরও বলিলেন এই বাক্যে তোমার আরও এক অপরাধ হইয়াছে। তুমি শ্রীভগবৎসম্বন্ধে দেহদেহিভেদ-কল্পনা করিয়াছ। শ্রীভগবানে কখনও দেহদেহিবিভাগ হইতে পারে না। তদ্‌যথা মহাবরাহ-পুরাণে ঃ—

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হেয়োপাদেয়রহিতা নৈব প্রাকৃতিকাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দ-সন্দোহো জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
দেহদেহিভিদা চা'ত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

শ্রীভগবৎ সন্দর্ভধৃত মহাবারাহপুরাণ বচন।

অর্থাৎ পরমাত্মার যে সকল শ্রীদেহ আছেন, তৎসমুদায় নিত্য শ্বাশত এবং হেয়-উপাদেয় রহিত। সেই শ্রীমূর্ত্তি সকল অপ্রাকৃত পরামানন্দ রাশি এবং সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানমাত্র। ঈশ্বরে কখনও দেহদেহিভেদ নাই।

শ্রীলঘুভাগবত বলেন—

সচ্চিদানন্দ সান্দ্রত্বাৎদ্বয়োরেবাবিশেষতঃ
ঔপচারিকএবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনঃ।

তথাচ কৌর্ম্মে—

দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।

সিদ্ধান্ত রত্নাকরে পূজ্যপাদ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—

যদাত্মিকো ভগবান তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ।

অর্থাৎ শ্রীভগবান যদাত্মক তাহার শ্রীবিগ্রহও তদাত্মক। শ্রীভগবান জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক। তাঁহার শ্রীবিগ্রহও তথাবিধ।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ জড় নহেন—ইনি সচ্চিদানন্দ। তবে যে, ভগবদ্দেহের বিনাশ ও নির্য্যাণ প্রভৃতির কথা শুনা যায় উহার উদ্দেশ্য কেবল অসুর-বিমোহনমাত্র। তদ্‌যথা—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জনাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনা মবেহি যথা নটস্য।

ফলতঃ সাধারণ ঐন্দ্রজালিকগণই যখন ইন্দ্রজাল-সাহায্যে স্বীয় অঙ্গ-ছেদনাদি দ্বারা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে, তখন শ্রীভগবানের মায়ায় তাঁহার আত্মনির্য্যাণ-ব্যাপারে অসুর-বিমোহন অথবা অপর কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহার একটী মায়াদেহ সাধারণের সমক্ষে পরিলক্ষিত না হইবে কেন? ফলতঃ শ্রীভগবানের জড়দেহ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মান মব্যয়ম্
আরোপয়ন্তি জনিমং পঞ্চভূতাত্মকং জড়ম্।

শ্রীভাগবতে শ্রীভগদ্বাক্যং।

ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তি র্মেদমজ্জাস্থিসম্ভবা।
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাং সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ॥ বরাহবাক্যং।

শ্রীবিগ্রহ ভিন্ন উপাসকগণ তাঁহার ধ্যান করিতে আদৌ সমর্থ হয়েন না। তদীয় ভক্তউপাসকগণের ধ্যানের জন্য তিনি তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রকটন করেন। ফলতঃ চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করা গুরুতর অপরাধ। ইহাই মায়াবাদের একটা প্রধানতম দোষ। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের সভায় সন্ন্যাসীদিগকেও কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সেই স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, স্বরূপ এস্থলে সেই দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তদ্‌যথা :—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ
মানন্দমাত্র মবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেক মবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি।

অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরম, তোমার এই রূপের পর আর কোন পূর্ণভগবদ্রূপ আমি দেখিতে পাই না। নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ ব্রহ্ম ইঁহার মাত্রা, ইঁহাতে সৃষ্টাদি কল্পনা নাই, ইঁহার শক্তি মায়াসম্ভিন্ন নয়, ইনি অংশপুরুষ দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করেন, ইনি অদ্বিতীয়, ইনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন। সমস্ত ভূত ও ইন্দ্রিয়ের আত্মা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। ভগবন্ আমি তোমার এই রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

তদ্বা ইদং ভুবন-মঙ্গল-মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তং উপাসকানাং
তস্মৈ নমো ভগবতেহনু বিধেম তুভ্যং
যো নাদৃত নরকভাগ্‌ভি রসৎপ্রসঙ্গৈঃ।

অর্থাৎ হে ভুবনমঙ্গল, আমরা তোমার উপাসক। তোমার সেই সচ্চিদানন্দরূপ আমাদিগের মঙ্গলার্থ ধ্যানে দেখাইলে। কুতর্কপরায়ণ বহির্ম্মুখগণ তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মায়া-কল্পিত বলিয়া অনাদর করিয়া নরকগামী হয়। আমরা সততই তোমাকে প্রণাম করি।

এখন দেখা যাইতেছে যে জীব-সম্বন্ধে দেহদেহি ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীভগবান সম্বন্ধে তাদৃশ ভেদ কল্পনা করাও অপরাধ। পূর্ব্ববঙ্গীয় নাটককার প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথ দেহের আত্মা বলিয়া বর্ণনা করায় শ্রীজগন্নাথ দেহকে প্রকারান্তরে জড় বলিয়া কল্পনা করেন। ইহাতে তিনি শ্রীজগনাথ দেবের নিকট অপরাধী হইলেন। আবার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীজগন্নাথ-দেহের দেহী বলিয়া কল্পনা করিয়া ক্ষুদ্রজীবস্ফুলিঙ্গবৎ বর্ণনা করিলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটেও তিনি অপরাধী হইলেন। ঈশ্বরে ও জীবে পার্থক্য কি, তাহা প্রদর্শন করার জন্য স্বরূপ আরও বলিলেন ;—

হ্লাদিন্যাসম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ
স্বাবিদ্যো সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।

ভগবৎ সন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূত্রম্।

মায়াবাদে জীব ব্রহ্মে প্রভেদ নাই। কিন্তু এই মত নিতান্ত অসার ও অশ্রদ্ধেয়। জীব ও ঈশ্বরের অনন্ত প্রভেদ। শ্রীভগবান্ হ্লাদিনী ও

সম্বিৎ শক্তিতে আলিঙ্গিত হইয়া জ্ঞানানন্দ স্বরূপ। আর জীব—অজ্ঞানে আবৃত ও বিবিধ ক্লেশের নিকর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহার অনুবাদ এইরূপ—

সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণকৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম।
সেইতো পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

মধ্যলীলা ১৮শ পরিচ্ছেদে।

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গে দেহিত্ব আরোপিত হওয়ায় স্বরূপ মহাদুঃখে পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিকে অপরাধী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। শ্রীবিগ্রহে করপদাদির সাক্ষাৎকারে যদিও স্বগতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাও বাহ্য প্রতীতিমাত্র, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ কেবলই আনন্দমাত্র। তদ্‌যথা ঃ—

নির্দ্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীর গুণৈশ্চ হীনঃ
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি
সর্ব্বত্রচ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা।

নারদ পঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মুগ্ধত্বাদিদোষশূন্য ও সার্ব্বজ্ঞত্বদিগুণপূর্ণবিগ্রহ, ইনি আত্মতন্ত্র, জড়শরীর-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, আনন্দহস্ত, আনন্দপাদ, আনন্দমুখমণ্ডল, আনন্দোদরাদি, এবং সর্ব্বত্র স্বগতভেদ বিবর্জ্জিত। তবে যে করচরণাদির ভেদ প্রতীতি হয়, তাহা কেবল তদীয় নানাবির্ভাবসংঘটনপটীয়সীবিশেষ-শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। এই স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদরহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে মায়াবাদীরা মায়িক বলিয়া কল্পনা করে। ইহা ঘোরতর অপরাধ। শ্রীচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত এই যে—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥

দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নামরূপ স্বরূপ বিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণ-লীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সচিদানন্দ ॥

শ্রীভগবৎ সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত এই যে—

কৃষ্ণমেন মবেহিত্বমাত্মান মখিলাত্মনাং
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।

এনং "নৌমীড্য তেহভ্র বপুষ" ইত্যাদি বর্ণিত রূপং অবেহি। মৎ প্রসাদলব্ধ:বিদ্বত্তয়েবানুভব। নতু তর্কাদিনা বিচারয়েত্যর্থদি এবংভূতোহপি মায়য়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্ব্বস্থাপি স্বাত্মানং প্রতিচিত্তাকর্ষণায় দেহীব জীব ইব আভাতি ক্রীড়তি। ইব শব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্তু ন জীববৎ পৃথক্ দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে।

অর্থাৎ "এনং" শব্দে পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপই বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ আমার প্রসাদলব্ধজ্ঞানদ্বারাই অনুভব কর, তর্কাদি দ্বারা এই তত্ত্ব বিচার করিও না। শ্রীভগবান্ এবংভূত হইয়াও মায়া (কৃপা) দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত (আপনার প্রতি সকলের চিত্তাকর্ষণ করার নিমিত্ত) দেহীর ন্যায় (জীবের ন্যায়) ক্রীড়া করেন। "দেহীইব" শব্দ প্রয়োগের অর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ জীবের ন্যায় পৃথক্ দেহে প্রবেশ করিয়া স্বপ্রকাশক হয়েন না, স্বীয় স্বরূপ-শক্তিতে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয়েন।

পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহের যে লক্ষণ অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন—

"অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতং। তচ্চযুক্তং—সর্ব্বশক্তিযুক্ত পরমবস্ত্বেকরূপত্বাত্তস্য। তত্র যো নিজান্তরঙ্গনিত্যধর্ম্মঃ শ্রীবিগ্রহাগমক স্তৎসংস্থানলক্ষণস্তদ্বিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব শ্রীবিগ্রহঃ। স এব চান্তরঙ্গধর্ম্মান্তরাণামৈশ্বর্য্যাদীনামপি নিত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বয়ং ভগবান্।"

অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের যে পূর্ণস্বরূপ-লক্ষণত্ব সাধিত হইল, তাহা উপযুক্তই হইল। কেননা, সর্ব্বশক্তিযুক্ত যে পরম বস্তু তাহা এক ভিন্ন দুই নহেন। নিজান্তরঙ্গ নিত্যধর্ম্ম শ্রীবিগ্রহতাগমক। এই শ্রীবিগ্রহতা-গমক যে সংস্থানলক্ষণ, এবং সেই সংস্থানলক্ষণবিশিষ্ট পরমানন্দলক্ষণ যে বস্তু, তাহাই শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহই ঐশ্বর্য্যাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম সকলেরও নিত্য আশ্রয়। সুতরাং এই বিগ্রহই শ্রীভগবান্।"

এই সকল লক্ষণ দ্বারা মায়াবাদ নিরস্ত হয় এবং অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েন। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অপার। আমরা এখানে এই সিদ্ধান্ত-নিবহের দিঙমাত্র নির্দ্দেশ করিলাম। শ্রীস্বরূপ পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণের নাটকের নান্দীতেই সিদ্ধান্তবিরোধ দেখিয়া ব্রাহ্মণের ও অন্যান্য ভক্তগণের উপকারের জন্য শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহাকে সংসিদ্ধান্তের সার শ্রবণ করাইয়া বলিলেন—

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥

পরম কারুণিক শ্রীস্বরূপ কবির নাটকের নান্দী-শ্লোক যে সিদ্ধান্ত-বিরোধে প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা যে কাব্যের এত প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহার নান্দী শ্লোকেই এইরূপ ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত-বিরোধ ছিল, ইহা দেখিয়া সকলেই লজ্জিত হইলেন। কবি তো লজ্জা ভয় ও বিস্ময়ে যৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার এই বিমর্ষভাব দেখিয়া স্বরূপের দয়া হইল। তিনি তাঁহার হিতের জন্য কৃপা করিয়া অতঃপর যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে জীবমাত্রেরই পরম হিত সাধিত হয়। এখন তাহাই আলোচ্য।

অষ্টম অধ্যায়।

স্বরূপের সদয় উপদেশ।

নান্দী শ্লোকের সিদ্ধান্ত-বিরোধ-প্রদর্শন করায় পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অতীব ভীত হইলেন। কেননা শ্রীস্বরূপ স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলেন এই প্রকার অসৎসিদ্ধান্তিত শ্লোকে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের নিকটেই ব্রাহ্মণের অপরাধ হইয়াছে। এ কথায় ব্রাহ্মণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ নিজে গৌরভক্ত। তবে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মর্ম্ম তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার শ্লোক মন্দ হউক, সেই নিন্দায় তাঁহার কোনও দুঃখের কারণ নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার অপরাধ হইয়াছে, এই কথায় ব্রাহ্মণের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু জল নীরবে গড়াইয়া পড়িল। শ্রীস্বরূপ পরম কারুণিক। এই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করার জন্যই তো তাঁহার এত কথায় অবতারণা! তাহা না হইলে তিনি নান্দী শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়াই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া উঠিয়া যাইতেন। স্বরূপ জানিতেন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর ভক্ত, তবে একান্ত ভক্ত নহেন এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও অভিজ্ঞ নহেন। স্বরূপের কৃপা হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত জগতের হিতের জন্য এই সময়ে কতিপয় সুধামাখা উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীস্বরূপ বলিলেন,"তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই শ্রীভগবান অবশ্য তোমায় কৃপা করিবেন। এখন গ্রন্থ লেখা রাখিয়া দাও কিছুদিন বৈষ্ণবের নিকট গিয়া শ্রীভাগবত পাঠ কর। একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্য-চরণ আশ্রয় কর, আর প্রতিনিয়ত শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের কর। তোমার পাণ্ডিত্য আছে তাহা আমি জানি, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয় না করিলে, তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ না করিলে, সিদ্ধান্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রভাব অপর কিছুতেই অধিগম্য হয় না। সিদ্ধান্ত-মর্ম্ম না জানিলে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণন করা বিড়ম্বনা মাত্র। সহস্র প্রকারে পাণ্ডিত্য থাকুক,

কিন্তু সিদ্ধান্ত-জ্ঞান-বিহীন পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্যই নহে। তুমি অবশ্যই অতীব প্রীতি-সহকারে এই শ্লোক রচনা করিয়াছ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে দুই দিকেই দোষ পড়িয়াছে।"

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলা বা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনা করিতে চাহেন অথবা কিছু বলিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীস্বরূপের এই উপদেশ আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ। তোমার পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু সৎসিদ্ধান্ত জ্ঞানের অভাবে তোমার গ্রন্থের কথা ভক্তজনের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইবে। তোমার বর্ণনা শক্তি থাকিতে পারে, তুমি চিত্রকরের মত রং ফলাইয়া লীলার ঘটনা বিশেষরূপে আঁকিয়া তুলিতে পার, কিন্তু সিদ্ধান্তের ও রসের নিয়মজ্ঞানের এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হৃদয়গ্রাহী ভাবের অভাবে তোমার অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি অস্থান-সন্নিবিষ্ট, অপ্রযুক্ত ও স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এ জগতের যেমন নিয়ম আছে, চিন্ময় জগতেও তাদৃশ নিয়ম রহিয়াছে। সেই সকল নিয়মের দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, অথবা ঐ সকল নিয়মে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, বর্ণনা অস্বাভাবিক ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে। অন্য প্রকার শত পাণ্ডিত্যের সহায়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিলেও সিদ্ধান্ত-বিরোধে ও রসভঙ্গে শ্রীলীলা ভক্তজনের অপাঠ্য হইয়া পড়েন। এইজন্য শ্রীস্বরূপের প্রথম উপদেশ এই যে—

১। "যদি শ্রীলীলাগ্রন্থ লিখিয়া জীবন সার্থক করিতে হয়:তবে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত পড়িতে হইবে।" এই উপদেশের প্রথম মর্ম্ম "ভাগবত পাঠ কর।" আর দ্বিতীয় মর্ম্ম, "বৈষ্ণবের নিকট উহাঁর উপদেশ গ্রহণ কর।" আমরা আগে শ্রীভাগবতের কথাই বলিতেছি। শ্রীভাগবতই বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রধানতম শ্রীগ্রন্থ। পুরাণাদিতে শ্রীভাগবত পুরাণের অনন্ত মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এখানে এতৎ সম্বন্ধে দুই একটী মাত্র উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি। তদ্‌যথা—

১। নিশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুত আত্মবতাং বরঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানং সারং সারং সমুদ্ধৃতং॥

২। কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ

৩। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে
ভক্তি রুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।

৪। সর্ব্ববেদান্তসারংহি শ্রীভাগবতমিষ্যতে
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতি ক্বচিৎ

৫। শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণ মমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্
যস্মিন্ পারম হংস্য মেক মমলং জ্ঞানং পরংগীয়তে
যত্রজ্ঞানবিরাগভক্তি সহিতং নৈষ্কর্ম্মমাবিস্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্চেনরঃ।

এতাদৃশ আরও বহুতর প্রমাণে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য উদ্ঘোষিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে কেন, এখন তাহার কারণ বলা যাইতেছে। পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অনেকেই শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের যাদৃশ অধিগম্য, অপরের পক্ষে সেরূপ নহে। শ্রীধর স্বামী স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং নবুদ্ধ্যা নচটীকয়া।"

অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সহকারেই ভাগবত বুঝিতে হইবে, টীকার ও বুদ্ধির সাহায্যে শ্রীভাগবতের মর্ম্মানুভব হইবে না। সুতরাং ভক্তিরসপুষ্ট শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকটই শ্রীভাগবত অধীতব্য। নচেৎ শ্রীভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম কিছুতেই হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে না।

ভগবদ্ধর্ম্মবক্তারং ভগবচ্ছাস্ত্র বাচকং
বৈষ্ণবঃ গুরুবদ্ভক্ত্যা পূজয়েজ্ জ্ঞানদায়কং।

ফলতঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম-বক্তা ব্যতীত অপরের পক্ষে শ্রীভাগবত-গ্রন্থের মর্ম্মানুভবই সম্ভবনীয় নহে। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥

* * *

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥

* * *

গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সবে দুঃখে ভাবেন অপার॥

সুতরাং মহাধ্যাপক হইলেও শ্রীভাগবতের মর্ম্মানুভব সকলের সাধ্যায়ত্ত ; নহে। এইজন্য শ্রীভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণব-পণ্ডিতের নিকটে শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া সদ্ধর্ম্ম ও সৎসিদ্ধান্ত অবগত হইতে হইবে, ইহাই শ্রীস্বরূপের উপদেশ।

তাঁহার দ্বিতীয় আদেশ একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করা। কি প্রকারে "একান্ত ভাবে" শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিতে হয়, ইতঃপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ন্যায়াচার্য্য শ্রীভগবান আচার্য্য কি প্রকারে একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্য চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি প্রকারে একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্যচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভক্তগণের তাহা অবিদিত নাই। পরম কারুণিক শ্রীস্বরূপ এই নাটককারকেও তাদৃশ ভাবে শ্রীচৈতন্যচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ করিলেন।

তাঁহার তৃতীয় উপদেশ এই যে,

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥

শাস্ত্র অনন্ত মুখে ভক্তসঙ্গের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। এস্থলে

আত্মশোধনের জন্য এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি রস।
তাহার হৃদয় তার প্রেমে হয় বশ॥

শ্রীসনাতন শিক্ষায় আমাদের পতিত-উদ্ধারণ মহাপ্রভু এই বিষয়ে যে সকল অমৃতায়মান উপদেশ বাক্য বলিযাছেন, সেই সকল বাক্য অতীব শক্তিশীল এবং সর্ব্বত্রই হিতকর। প্রভুর সুধাময়ী উপদেশবাণী এই যে—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

ইহা অতি আশার কথা। শ্রীভগবান দয়াময়। তিনি সাধুরূপে কখন কখন দর্শন দিয়া জীবের পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবচ্যুত-দর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন॥

অর্থাৎ আমি অধম হইলেও আমার শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইবে। কেননা, দেখিতে পাওয়া যায় কালরূপ নদীতে নীয়মান হইয়াও কখন কখন কেহ কেহ পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ পরিত্রাণ লাভের সময়ে চিন্ময়ের নিয়মবশে পরম হিতকর সাধু-সঙ্গ সংঘটিত হয়।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।

হে অচ্যুত এই সংসার ভ্রমণশীল জনগণের যখন সংসার-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহার পক্ষে তোমার ভক্তজনের সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। তৎসঙ্গ প্রাপ্তি ঘটিলেই ইতর সর্ব্বসঙ্গের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলের নিয়ন্তাস্বরূপ যে তুমি,—সেই তোমাতেই তখন তাঁহার রতি জন্মিয়া থাকে।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥

শ্রীভাগবত বলেন—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ
র্বিনা মহৎ পাদ রজোভিষেকাৎ।

অর্থাৎ হে রহূগণ মহৎপাদরেণুর অভিষেক ব্যতীত তপঃ ইজ্যা, সন্ন্যাস, বেদপাঠ ও অন্যান্য প্রকার বহুবিধ সাধনা প্রভৃতি কোন প্রকার কার্য্য দ্বারাই এই ভগবানকে লাভ করা যায় না।

নৈষাং মতি স্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ বিষয়াভিমান-বিরহিত মহত্তমগণের চরণরেণু দ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ মানুষের মতি নিবৃত্তি-ফলপ্রদ শ্রীভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।

শ্রীভগবৎ সঙ্গি-সঙ্গের কণামাত্রও যখন স্বর্গাপবর্গের সহিত তুলনা করিতে পারি না, তখন উহা মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে তুলনা হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

উক্ত শ্রীগ্রন্থের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক এই যে—

মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি-সঙ্গম্
মহান্তস্তে শমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।

পণ্ডিতেরা মহৎ সেবাকেই ভগবৎ প্রাপ্তির এবং যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গকে নরক প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ বলিয়াছেন। যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধ-বিহীন ও সর্ব্বভূতের হিতকারী তাঁহারাই মহান্।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোক এই যে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদার্থপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি॥

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—সাধুজনের সহিত সম্মিলন হইলে আমার প্রভাব-প্রকাশক যে সকল কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন, সেই সকল সেবনে আমাতে আশু অবিদ্যানিবর্ত্তক শ্রদ্ধা রতি এবং প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীনারায়ণ-ব্যূহ-স্তবে লিখিত আছে—

যে ত্যক্ত লোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশংগতাঃ।
ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥

এবং শ্রীভগবদ্ভক্ত মাহাত্ম্যামৃতবারিধেঃ।
বিচিত্রভঙ্গলেখার্হোলোভলোলং বিনাস্তি কঃ॥ *
অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তজনানাং সঙ্গতিঃ সদা
কার্য্যা সর্ব্বৈ প্রযত্নৈশ দ্যৌলোকৌ বিজিগীষুভিঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে—

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

এ সম্বন্ধে সংস্কৃত বচন এই যে—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তিরঙ্ঘ্রি সেবনে।
নাম সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরা মণ্ডলে স্থিতিঃ॥

অর্থাৎ স্বসদৃশ বাসনাশালী প্রেমবান্ এবং আপনা হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট সাধুর সঙ্গ, রসজ্ঞ ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন, বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির চরণ সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরামণ্ডলে বাস এই পঞ্চ অঙ্গই সাধনার প্রধান। পরম উদার, পরম কারুণিক প্রভুর আরও দয়াসূচক আশ্বাসময় আদেশের কথাও শুনুন—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥

সুতরাং একমাত্র সাধুসঙ্গও প্রেমোৎপত্তির হেতু। প্রেমোৎপত্তি হইলেই প্রেমধামের নিয়ম স্বতঃই হৃদয়ে স্ফূর্ত্ত হয়েন। তখন আর সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা রস-ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না, বিশুদ্ধ আনন্দ-রসের প্রবাহে হৃদয় স্বতঃই আপ্লুত হইয়া যায়। সুতরাং শ্রীআনন্দঘন শ্যামসুন্দর বা গৌরসুন্দরের লীলা-বর্ণনে তখন আর ভক্তের কোন ভয়ের কারণ থাকে না। কেন না, তাঁহার কৃপাবলে হৃদয়ে সর্ব্ববিদ্যাই স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

প্রাণাধিক শ্রীদামোদর-স্বরূপ নাটক-লেখক পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে এক

কথায় সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, পাঠক যতই সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন, যতই সেই বিষয়ের আলোচনা করিবেন, ততই হৃদয়ে তাঁহার শ্রীমুখের সেই উপদেশের বহুল বিস্তার বাড়িয়া চলিবে,—সমগ্র শাস্ত্র যেন এক বাক্যে তাঁহার ঐ এক কথার সমর্থন করিতেছেন। আমরা এ স্থলে সেই অমৃতোপম উপদেশের আবার পুনরুক্তি করিতেছি—

"চৈতন্য ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে সে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥"

ফলতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত শাস্ত্রীয় সৎসিদ্ধান্ত কি, ভক্তি কি, প্রেম কি,—ইহার কোন তত্ত্বই হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রসমূহ ভক্তসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন—

ভক্ত জানে প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণ মর্ম্ম না জানয়ে আর ॥
কোটী জন্ম যদি যোগ তপ করি মরে।
ভক্তি বিনে কোন কর্ম্ম ফল নাহি ধরে ॥
ভক্তি সেবা বিনা হেন ভক্তি নাহি হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

শাস্ত্র বলিতেছেন—

ভগবদ্ভক্ত পদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তুতে।
সৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিল মুত্তমম্ ॥

"যাঁহাদের সঙ্গ, সাধ্য ও সাধন স্বরূপ সেই ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মের পাদুকার প্রতিও আমার নমস্কার।" ভক্ত-সেবা ভিন্ন ভক্তি লাভ দুরূহ ব্যাপার। ভক্তি কি, তৎসম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রে সবিস্তার আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব-দর্শন বলেন—

হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিঃ।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপবিশেষভূত হ্লাদিনী শক্তি এবং সম্বিদ্ শক্তির সারই ভক্তি।

শ্রুতি বলেন—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্
মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি।

ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ব প্রকার ফল-কামনা-শূন্য হইয়া শ্রীভগবানে মনঃ-কল্পনই ভক্তি।

নারদ পঞ্চরাত্র বলেন—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষিকেন হৃষিকেশ-সেবনং,—ভক্তিরুত্তমা॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনুকূল্য সহকারে তৎপর ভাবে শ্রীভগবানের ভজনাই ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যভাগবত এই ভক্তির পরিস্ফুট লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ধন।
"ভক্তি" এই—কৃষ্ণ নাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ বলি কাঁদিলে সে কৃষ্ণধন মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে, কৃষ্ণ না ভজিলে॥

শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে যখন প্রাণের ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, আর হৃদয় যখন অনবরত কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়ায়,—আর "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ, তুমি কবে আমায় দর্শন দিবে" এই ভাবে যখন চিত্ত ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে থাকে, হৃদয়ের সেই আর্ত্তিই ভক্তি। প্রাণের ধনকে নিকটে পাইলেও যেন তাঁহার বিচ্ছেদ-ভয়ে তাঁহার জন্য সততই প্রাণ আকুল থাকে। বিরহের এই আকুলতায় সর্ব্বত্রই হৃদয় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। ভক্তসঙ্গসাহায্যভিন্ন এই উক্তির লেশমাত্র লাভ অসম্ভব ব্যাপার। তবে মহোদার শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ কৃপার কথা স্বতন্ত্র। নতুবা শ্রীশ্রীকৃপাই জীবের প্রধান সম্বল। সাধুসঙ্গলাভে ইতর-রাগ দূরীকৃত হয়, দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্রাদির জন্য মোহজনিত দুশ্চিন্তা অপহৃত হইয়া শ্রীশ্রীভগবানের পদারবিন্দে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, যথা শ্রীমদ্ভাগ-

বতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ধ্রুব মহাশয় বলিতেছেন—

তেনস্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্য
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ
যেত্বব্জনাভ ভবদীয় পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্য লুব্ধ হৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ।

অর্থাৎ আপনার পদারবিন্দ মকরন্দ লাভের জন্য যাঁহাদের হৃদয় অনুক্ষণ প্রলুব্ধ, এতাদৃশ একান্ত ভক্তগণের শ্রীচরণ-সঙ্গ যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহাদের অতি প্রিয় দেহ-ধন-মিত্র-পুত্র-কলত্র-প্রভৃতিতে আর বিন্দু মাত্রও স্মরণ থাকে না।" সুতরাং ভক্তচরণসঙ্গ ভিন্ন ভক্তি লাভের উপায় নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণ স্পষ্টতঃই বলিতেছেন—

ভক্তিস্তুভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

এ স্থলের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথাও স্মরণ করুন—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম॥

অর্থাৎ যাঁহারা অচ্যুত শ্রীভগবানের সেবা করেন, সিদ্ধি-সম্বন্ধে তাহাদের সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু তদ্ভক্ত-চরণসেবীদিগের আর সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাই লিখিত হইয়াছে—

এতেক বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত সেবা হইতে সে লাভে কৃষ্ণপায়

ফলতঃ সর্ব্বদা ভক্তগণের শ্রীচরণান্তিকে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা-পরিচর্য্যা করাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের উপায়। ভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবানে অভিন্ন বুদ্ধি করাও তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যথা পুমান ন স্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিষুকচিৎ।
পারক্যং বুদ্ধিং কুরুতে এবংভূতেষু মৎপরঃ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার এইরূপ অনুবাদ লিখিত হইয়াছে—

ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যেমন বাহু অঙ্গুলী চরণ॥

ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে জাড্যদোষ দূরে যায়, সত্য বাক্যে প্রবৃত্তি জন্মে, জ্ঞান-মান ও যশের উন্নতি হয়, সর্ব্ব পাপ প্রণষ্ট হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, ভক্তিলাভ হয়, সুতরাং শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিতে আর সন্দেহ থাকে না। যথা—

১। জাড্যং ধিয়ং হরতি, সিঞ্চতি বাচি সত্যম্
জ্ঞানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিম্
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিংন করোতি পুংসাম॥

১। অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয় সংযোজয়ত্যপি
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ।

শাস্ত্রে তীর্থাদি সেবন এবং সর্ব্ব সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গের অধিকতর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত-জনসঙ্গের আর একটী অপূর্ব্ব মহিমা যোগবাশিষ্ঠে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমে॥

বিদ্বজ্জন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমাগমে শূন্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু দূরীকৃত হইয়া অমৃতত্ব উপজাত হয়, অনর্থও যে অর্থত্বে পরিণত হয় এই শ্লোক তাহারই প্রমাণ।

দেহিদেহাদি সম্বন্ধে বিস্মরণোৎপাদন, মোক্ষপ্রদত্ব, সর্ব্বসারত্ব, ভগবৎ কথামৃতপানের নিদানত্ব, ভক্তিসম্পাদকত্ব,—প্রভৃতি বিবিধ গুণ ভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভক্তসঙ্গ জগতের আনন্দবর্দ্ধন করেন, তদ্‌যথা—

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী
নানন্দয়তি কংনাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা।

অপর কথা আর কি আছে, ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ স্বতঃই পরম পুরুষার্থ এবং ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেও বশীভূত করার উপায় বলিয়া শাস্ত্রে

পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন এইজন্য ভক্তগণ সততই ভগবদ্ভক্ত জনের সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধ্রুব মহাশয় প্রার্থনা করিতেছেন—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরু ব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ কথামৃতপান মত্তঃ।

"হে ভগবান তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি-প্রবহনশীল অমলাশয় মহাপুরুষগণের সহিত যেন নিরন্তর আমার সঙ্গ হয়, কেননা, তাঁহাদের সঙ্গ লাভ হইলে সতত তোমার গুণকথামৃত-পানে প্রমত্ত হইয়া অতি সহজেই এই দুঃখপ্রদ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব।"

প্রচেতাগণ বর প্রার্থনা কালে বলিয়াছিলেন—

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ
তাবদ্ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নে ভবে ভবে।

অর্থাৎ "শ্রীভগবান যদি বর দিতে হয় তবে এই বর প্রদান করুন যে আপনার মায়া-স্পৃষ্ট হইবা যত কাল এই কর্ম্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাবৎকাল জন্মেই জন্মেই যেন আপনার দাসানুদাসগণের সঙ্গলাভ করিতে পারি।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের প্রার্থনা এই যে—

তস্মাদমু স্তনুভৃতা মহমাশিষোজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বৈভব মৈন্দ্রিয় মাবিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামিতে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মানোপনয় মাং নিজভৃত্য-পার্শ্বম্॥

"হে ভগবন, প্রাণধারি ব্যক্তিমাত্রেরই পরিণাম আমার জানা আছে, সুতরাং আয়ু, স্ত্রী, সম্পত্তি, এমন কি ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় লাভ ও বাঞ্ছা করি না, অণিমাদি সিদ্ধির প্রতিও আমার অভিলাষ নাই। আমার জানা আছে মহাপরাক্রমশীল কাল-চক্রে সকলেই যথাসময়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। এ অকিঞ্চিতের প্রার্থনা এই যে আমার যেন সততই

আপনার ভৃত্যবর্গের সঙ্গ-লাভ ঘটে, আমি যেন তাঁহাদের শ্রীচরণান্তিকে একটু স্থান পাইতে পারি।"

আমার প্রাণের প্রাণ চির-সুহৃদ শ্রীস্বরূপদামোদর তাই আমাদের জন্য সকল উপদেশের সার এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।"

শাস্ত্রে ভক্তসঙ্গ-মাহাত্মের শেষ নাই। কেবল আত্মশোধনের জন্য এস্থলে শাস্ত্রীয় ভক্তমহিমা যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

শ্রীস্বরূপদামোদরের আর একটী উপদেশের বিষয় যদিও ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ইঁহার আরও একটু বিবৃত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার উপদেশ এই যে,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

শ্রীভাগবত পাঠ করিতে হইলে বৈষ্ণবের নিকটেই শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে গ্রন্থের অভিমত পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। বৈষ্ণব পণ্ডিত ভিন্ন শ্রীভাগবতের প্রকৃত অর্থ অপরে পরিস্ফুট করিতে পারে না। বিশেষতঃ অনেক স্থলেই ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম আদৌ না বুঝিয়া তাঁহারা অপর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সেই সকল অসৎসিদ্ধান্তসঙ্কুল ব্যাখ্যা শ্রোতৃবর্গের অকল্যাণেরই হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং অবৈষ্ণবের স্থানে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে নাই।

দ্বিতীয়তঃ অবৈষ্ণবের নিকট প্রকৃত বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে গেলে তাঁহার যে কি বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, সাক্ষাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতই তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা এ স্থলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ হইতে সেই বিষম বিড়ম্বনাজনক শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রকাশের পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীবাস প্রমুখ কতিপয় ভক্ত শ্রীভাগবত শুনিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। যেখানেই শ্রীভাগবত পাঠ হইত, সেইখানেই শ্রীবাস পণ্ডিত অতীব আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন, প্রাণ পূরিয়া ভাগবত শ্রবণ করিতেন এবং প্রেমানন্দে উদ্বেলিত হইতেন, বর্ষাসলিলে উচ্ছ্বসিত সিন্ধুপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে

প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিত, আর তিনি প্রেমবেগে কান্দিয়া আকুল হইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শ্রীনবদ্বীপে তখন শ্রীভাগবত পাঠের প্রচলন অতি বিরল ছিল। কোন কোন পণ্ডিত কদাচ শ্রীভাগবত পাঠ করিতেন, কিন্তু সে পাঠ নামমাত্র। শ্রীভাগবতের যাহা প্রাণ এই সকল পাঠকগণের তাহা বিদিত ছিল না। প্রেমময় ভাগবত শুষ্ক জ্ঞানীদের হাতে পড়িয়া বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইতেন। ভক্তগণ সে ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহারা শ্রীভাগবতের মূল শ্লোক শুনিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইতেন। নবদ্বীপে তখন যেরূপে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা হইতেন, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তৎসম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

যদিচ পড়ায় এক গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি অভিমত॥

ফলতঃ এই বিষম দুর্দ্দিনে ভক্তগণ আকুল প্রাণের পিপাসা-প্রশমনের জন্য শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে যেখানে-সেখানে যাইতেন, তজ্জন্য যথেষ্ট বিড়ম্বিতও হইতেন। এই সময়ে শ্রীনবদ্বীপে একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবত পাঠক ও ব্যাখ্যাকারক বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম দেবানন্দ। ইনি মহেশ্বর বিশারদ মহাশয়ের জাঙ্গালে বাস করিতেন। এই বিশারদ মহাশয়ের নাম পাঠকবর্গের সুপরিচিত না হইলেও, ইহার সুযোগ্য পুত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গলীলার মহানুভব মহাপুরুষ। যাহা হউক, মহেশ্বর বিশারদ মহাশয় অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার জাঙ্গালে এই দেবানন্দ পণ্ডিতকে স্থান দান করিয়াছিলেন।

দেবানন্দ আজন্ম উদাসীন, জ্ঞানী, তপস্বী ও অতি শান্ত। কি প্রকারে মোক্ষলাভ হইতে পারে, দেবানন্দ সততই সেই চেষ্টায় নিমগ্ন থাকিতেন। তখনও ভক্তিধারায় বসুন্ধরা পরিসিক্ত হয় নাই, তখনও শ্রীগৌরচন্দ্রিমার প্রফুল্ল কিরণে প্রেমভক্তির সুধাবর্ষণ ঘটে নাই, তখন লোকে ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসী হইতেন, সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষপথের অনুসন্ধান করিতেন। দেবানন্দেরও সেই অবস্থা। তিনি যত্নের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। তাঁহার নিকট দুই চারিজন ছাত্রও শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ

লইতেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, ভক্তি কাহাকে বলে তাহা তিনি তখনও জানিতেন না! ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
জানিবারে যোগ্যতা আছে শুনি তান।
কোন অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর॥

এই দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট শ্রীভাগবত পাঠ শ্রবণ করার জন্য শ্রীবাস একদিন বড় ব্যাকুল হইয়া তাঁহার বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখেন, দেবানন্দ শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীবাস পরম ভক্ত। দেবানন্দ কি :ব্যাখ্যা করিতেছেন সে দিকে শ্রীবাসের লক্ষ্য নাই। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোক শুনিয়াই বিহ্বল হইতে লাগিলেন, অক্ষরে অক্ষরে শ্রীভাগবত তাঁহার নিকট প্রেমময় বলিয়া বোধ হইল, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিল, তিনি আকুল ও অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ ভিজিয়া গেল। তাঁহার এইরূপ রোদনে পড়ুয়াগণ বড় বিরক্ত হইল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "একি জঞ্জাল, পাঠের সময়ে এইরূপ গোলযোগ হইলে কি আর পাঠ চলে?"

প্রেমে মগ্ন শ্রীবাসের কর্ণে পড়ুয়াদের এই মন্তব্য প্রবেশ করিল না। তিনি ভাবরসে মজ্জিত হইয়া অঝোরনয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, আর ঘন ঘন শ্বাসে রোদনের ধ্বনি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রেমময় শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন—

সম্বরণ নহে শ্রীবাসের ক্রন্দন।
চৈতন্যের প্রিয়দেহ,—জগতপাবন॥

দুর্ম্মতি পড়ুয়াগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তাহাদের নিদারুণ ক্রোধ উপস্থিত হইল, অধমেরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়দেহ শ্রীবাসকে টানিতে টানিতে ঘরের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেবানন্দ এত বড় পণ্ডিত এবং সুশান্ত হইয়াও তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত ছাত্রগণকে এই ঘোরতর কুকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না। তিনি আপন চক্ষে এইরূপ ভক্ত-বিড়ম্বনা দর্শন করিলেন। শ্রীবাস বাহ্যজ্ঞান পাইয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া আপনার ঘরে গেলেন। ছাত্রগণ শ্রীবাসের যে বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার দুঃখের কারণ নহে, দেবানন্দ এমন সুবিজ্ঞ হইয়াও যে ছাত্রগণকে এই অসৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না ইহাও তাঁহার দুঃখের কারণ নহে। তাঁহার দুঃখের কারণ এই যে, তিনি সুধামধুর ভাগবত শ্রবণ করিতে পারিলেন না! ফলতঃ অবৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে গেলে ভক্তের পক্ষে এরূপ বিড়ম্বনা বড় বিচিত্র ব্যাপার নহে। কুব্যাখ্যায় কান দিলে যে কুফলোৎপত্তি হয় তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীগৌরভগবান প্রকাশিত হইয়া এই দেবানন্দকেও কৃপাদণ্ড করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তে পরিণত করিয়াছিলেন। এ স্থলে সে ঘটনার উল্লেখ না করিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ বোধ হইবে।

এক দিবস প্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া মহেশ্বর বিশারদ মহাশয়ের জাঙ্গালের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, দেখিতে পাইলেন বৃদ্ধ দেবানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে ব্যাখ্যার দুই একটী কথা প্রভু শুনিতে পাইলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভুর হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "একি ব্যাখ্যা হইতেছে, এ লোকটা কখনও ভাগবতের অর্থ জানে না। এ ভাগবত পড়ে কেন; ভাগবতে ইহার কি অধিকার আছে? সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভাগবত-গ্রন্থরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভক্তিই ভাগবতের একমাত্র পুরুষার্থ। ভাগবত প্রেমময়, ইহাই চারি বেদের অভিপ্রায়। বেদচতুষ্টয় দধিস্বরূপ, ভাগবত উহাদের নবনীত, ভাগবতই সমগ্র শাস্ত্রের সার। শুক চারিবেদ মন্থন করিয়া এই নবনীত আবিষ্কৃত করিলেন, পরীক্ষিত এই নবনী সেবনে ভবরোগের হস্ত

হইতে মুক্ত পাইয়া প্রেমসুধাস্বাদে অমর হইলেন।" প্রভু এই বলিয়া ভাগবতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকটন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সার পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্ব-সন্দর্ভেই পাঠকগণ তাহার প্রমাণ ও বিচার দেখিতে পাইবেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এ সম্বন্ধে শ্রীভগবদুক্তি এইরূপ লিখিত আছে। দেবানন্দের উল্লেখ করিয়া প্রভু বলিতেছেন—

এ বেটার ভাগবতে কোন অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সব জানে ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥

দেবানন্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভক্তির কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। তিনি ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "ছি! ছি! এই কি ভাগবত ব্যাখ্যা। ভক্তি ভিন্ন কি ভাগবতের ব্যাখ্যা হয়? ভক্তি ভিন্ন যে ভাগবতের ব্যাখ্যা করে, সে আদৌ ভাগবত-অধ্যয়নের অধিকারী নহে। এই লোকটা নিরবধি ভাগবত পাঠ করিতেছে, অথচ ভাগবতের বিন্দুমাত্র মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে না।" বলিতে বলিতে প্রভুর ক্রোধের উদ্রেক হইল, তখন তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজ পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥

এই বলিয়া প্রভু দেবানন্দের শ্রীভাগবত গ্রন্থ ছিন্ন করিতে ধাবিত হইলেন। প্রভুর ভক্তগণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভুর গতিরোধ করিলেন। করুণাময় প্রভুর এই লীলা কেন—এ ক্রোধপূর্ণ লীলা কেন? দেবানন্দ

উদাসী, শান্ত ও তপস্বী। তিনি আপন মনে শ্রীভাগবত পাঠ করিতে-ছিলেন, প্রভু তাঁহার গ্রন্থ "চিরিতে" উদ্যম করিলেন কেন? করুণাময়ের এ ক্রোধ কেন,—শা৻ স্থর প্রতি এ ক্রোধ কেন?

ভক্ত পাঠকগণ, আপনারা এই তত্ত্বের বিচার করুন। এখানেও যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করা যাইতেছে। প্রভু করুণাময়। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই করুণার পরিচায়ক। দেবানন্দের সম্পত্তির মধ্যে শ্রীভাগবত এক প্রধান সম্পত্তি। এখন যেমন একটী টাকা ব্যয় করিলেই একখানি শ্রীভাগবত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তখন সে সুবিধা ছিল না। মুদ্রাঙ্কনের তখনও প্রচলন হয় নাই। একখানি ভাগবত লিখিয়া লওয়া তখন কম পরিশ্রমের ফল বলিয়া পরিগণিত হইত না। এই সকল গ্রন্থ সহসা সকলের লভ্য ছিল না। সুতরাং শ্রীভাগবতখানি দেবানন্দের এক প্রধানতম সম্পত্তি ছিল। তিনি বিষয়ত্যাগী, উদাসী, ইহাই তাঁহার নিকট "সাত রাজার ধন" বলিয়া মনে হইত। কিন্তু প্রভু দেখিলেন দেবানন্দ এই মহাধনের সদ্ব্যবহার করিতেছেন না। যে ধনে জগতের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়, অনুপযুক্ত হস্তে পড়িলে তদ্দ্বারা জগতের অশেষ অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যিনি জগতের হিতৈষী, তাঁহার মনে হয় এইরূপ অসৎ কার্য্যে ব্যয়শীল লোকের হস্তে শক্তিশীল অর্থ না রাখাই সঙ্গত। কেন না, উহাতে একদিকে যেমন অর্থের অপব্যয় হয়, অপর দিকে তেমনি আবার জগতের অমঙ্গলেরও আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত ধন হইতে যেমন সুপরামর্শ বলিয়া মনে হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। প্রেম শ্রীভাগবতের প্রাণ। ভক্তি ব্যাখ্যা না হইলে শ্রীভাগবত-অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে। দেবানন্দ শ্রীভাগবত খানি হাতে পাইয়া প্রকৃত অর্থের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছিলেন, আর ঐ প্রকার ব্যাখ্যায় জগতের অনিষ্ট হইতেছিল। জগৎহিতৈষী প্রভু এই জন্য উহাঁর একমাত্র সম্পত্তি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে যাহার অধিকার নাই, তাহাকে সেই অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে সৎলোকের মনে স্বভাবতঃই কষ্ট হয়। তারপরে যিনি ঐ ব্যক্তির অভিভাবক, তিনি তাহাকে অনধিকার-চর্চ্চায়

প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা। কোন শিশুকে তাহার অভিভাবক আগুণ লইয়া খেলা করিতে দেখিলে তিনি তাহার হাত হইতে অগ্নির আধার কাড়িয়া লইয়া উহা সুদূরে নিক্ষেপ করেন। এ স্থলে প্রভুও তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবানন্দ আগুণ লইয়া খেলাইতেছিলেন। তিনি শ্রীভাগবতের প্রকৃত মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীভাগবতরূপ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার গ্রন্থখানি ছিঁড়িয়া দিতে উদ্যম করিয়াছিলেন। অভিভাবকের তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইল না। ভক্তগণ প্রভুর কার্য্যে বাধা দিলেন। ভক্তবশ ভগবান্ নিবৃত্ত হইলেন।

প্রভু তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু পরে দেবানন্দের প্রতি করুণা করিয়াছিলেন। আর একদিন পথে দেবানন্দের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। দেবানন্দের ঘোরতর অপরাধের কথা প্রভুর মনে হইল। সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর মনে হইল, শ্রীবাসের নিকট দেবানন্দ সাধু ও উদাসী হইয়াও কি মহান্ অপরাধ করিয়াছেন! দেবানন্দের সাক্ষাতে তাহার পড়ুয়াগণ পরম ভক্ত শ্রীবাসের যে বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা করিয়াছিল, দেবানন্দ তাহাতে কিছু বাধা দিলেন না। দেবানন্দের নিকট ভক্তের অবমাননা হইল, তিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিলেন, অথচ তাঁহার ছাত্রদিগকে নিবারণ করিলেন না।

দেবানন্দের এই অপরাধের কথা তুলিয়া প্রভু বলিলেন "দেবানন্দ, তুমি তো লোককে খুব ভাগবত পড়াও, দেখিতেছি! শ্রীবাস পণ্ডিত যেন-তেন লোক নহেন, তিনি একজন পরম ভক্ত মহাপুরুষ। শ্রীগঙ্গাও যাঁহার দর্শন পাইলে পবিত্র হয়েন, এই শ্রীবাস তোমার মুখে ভাগবত শুনিতে আসিলেন, আর তোমার শিষ্যেরা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিল! ভাগবত শুনিয়া যিনি কাঁদিয়া আকুল হয়েন, তিনি কি এইরূপ লাঞ্ছিত হইবার যোগ্য? তুমি যেরূপ ভাগবত পড়াও সে সব আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি নিজেই ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পার নাই, তুমি আবার অপরকে কি বুঝাইবে? প্রেমময় ভাগবত

পড়িলে যে আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ তুমি আস্বাদন করিতে পার নাই, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

দেবানন্দ ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, আর কোন উত্তর করিলেন না। প্রভুও আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে দেবানন্দের মনে কেমন-এক-প্রকার অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীর শ্রীমুখখানি, তাঁহার ক্রোধ-গম্ভীর অথচ অতি সংযত কথা দুটী দেবানন্দের হৃদয়ে যেন দিবারাত্র জাগিয়া রহিল। তিনি মনে মনে বলিতেন, "হায় শ্রীবাসের নিকট আমার কি গুরুতর অপরাধই হইয়াছে। শ্রীভাগবত শুনিয়া যিনি কাঁদিলেন, তাঁরে কিনা আমার দুর্ব্বৃত্ত ছাত্রেরা এইরূপ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিল! আর আমি কাহাকেও ভাগবত পড়াইব না।" ফলতঃ ইহার পর হইতে দেবানন্দ সম্ভবতঃ শ্রীভাগবতের অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দেবানন্দের শ্রীভগবদ্‌বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল না। ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ ভিন্ন শ্রীভগবানের ভগবত্তা সাধারণের হৃদয়ে পরিস্ফুট হওয়া অসম্ভব।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধ দেবানন্দের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভু তখন নবদ্বীপ লীলা সাঙ্গ করিয়া নীলাচলে বসিয়া সমগ্র ভারতে প্রেমের প্রবল বন্যা বিস্তার করিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনও দেবানন্দের অপরাধ বিমোচন হয় নাই। ভক্তাপরাধের ন্যায় ভক্তির অভ্যুদয়ের প্রবল বাধা আর কি হইতে পারে। সমগ্র দেশ শ্রীগৌরপ্রেমে মাতিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি দেবানন্দের হৃদয়ে শ্রীগৌরপ্রেমের বিন্দুমাত্রও নিপতিত হইল না। অনেক দিন পরে প্রভু কুলিয়া আসিলেন। কুলিয়ায় প্রভুর শ্রীচরণার্পণে যে বিশাল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, শ্রীমদ্‌বৃন্দাদাস সে লীলা বর্ণনা করিয়া ভক্তসমাজকে চিরানন্দে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সময়ে দেবানন্দের কর্ম্মভোগ-ফল ক্রমেই ক্ষয় পাইয়া আসিয়াছিল। একদিন দেবানন্দের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, তাঁহার যুগ যুগান্তরের, শত জন্মের সংসারবন্ধন ক্ষয় হইল, আর নিরন্তর-কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল তনু বক্রেশ্বর পণ্ডিত সেই দিন হাসিতে হাসিতে,

কাঁদিতে কাঁদিতে, "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে নাচিয়া নাচিয়া দেবানন্দের আশ্রমে আসিয়া দেখা দিলেন।

দেবানন্দ শ্রীবক্রেশ্বরের তেজঃপুঞ্জ প্রেমবিহ্বল শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া কি-জানি-কেমন এক আকর্ষণে তাঁহার চরণতলে গড়াইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত বক্রেশ্বর দেবানন্দের ভক্তিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া তাঁহাকে চরণ ছায়ায় শীতল করিলেন। দেবানন্দ অতি যত্নে অতি প্রেমে বক্রেশ্বরের চরণ সেবা করিতে লাগিলেন। বক্রেশ্বর দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা—সে তরঙ্গের বিরাম নাই,—সে প্রবাহের বিশ্রাম নাই। সারা দিন সারা রাত্রি সমান কীর্ত্তন! দেবানন্দের আশ্রমে শ্রীকীর্ত্তন ও নর্ত্তন একবারে লাগিয়া রহিল। বক্রেশ্বর নাচিতে নাচিতে ধূলায় পড়িতেন, আর দেবানন্দ সেই শ্রীধূলা লইয়া আপন অঙ্গে মাখিতেন। এইরূপ ভক্তসেবার ফলে,—ভক্ত-চরণ-ধূলির প্রভাবে দেবানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস জন্মিল।

শ্রীভগবানে বিশ্বাস উৎপত্তি ভক্তসেবা ভিন্ন হয় না। শ্রীদেবানন্দ আজন্ম উদাসীন, জ্ঞানবান্ ভাগবত-পাঠক, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ ও পরম ধার্ম্মিক,—এত গুণ সত্ত্বেও শ্রীগৌরভক্ত-সঙ্গ ব্যতিরেকে শ্রীগৌরে আদৌ তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই। অবশেষে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের চরণছায়া পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের তাপ দূরে গেল, মনশ্চক্ষু প্রসন্ন হইল, শ্রীগৌরতত্ত্ব তখন তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইল।

এক দিবস তিনি অতীব অনুরাগ-ভরে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সহিত শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের চরণকমলসন্দর্শন করিতে গেলেন। শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়া দেবানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় একদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু করুণাময় প্রভু তখন তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিলেন, ডাকিয়া তাঁহাকে লইয়া একটু গোপনে বসিয়া বলিলেন, "দেবানন্দ তোমার যত অপরাধ ছিল ভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে সে সকল হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ। বক্রেশ্বরের সঙ্গলাভেই তুমি আজ আমাকে দেখিতে পাইলে।" এই বলিয়া প্রভু আপন ভক্ত বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্ত-মাহাত্ম্য শুনিয়া দেবানন্দের হৃদয়

আরও নির্ম্মল হইল। তখন তিনি সাক্ষাৎ প্রভুকে চিনিতে পারিয়া স্তব করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈব দোষে তোমা না জানিনু।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু॥
সর্ব্ব ভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাঁগো তোমাতে হউক অনুরাগ॥
এক নিবেদন মোর তোমার চরণে।
ক করি উপায় প্রভু কহিবা আপনে॥
মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ,—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈঞা।
ভাগবত পড়াও আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে.
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥

দেবানন্দের প্রতি তখন শ্রীভগবান্ যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই প্রতিপাল্য। প্রভুর উপদেশ এই যে—

১। মনে রাখিবে ভক্তি ভাগবতের প্রাণ। ভাগবতের ভক্তি-ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যা করিবে না।

২। ভক্তি নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয় ও অব্যয়। মহাপ্রলয়েও ইহাঁর বিনাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা ভিন্ন ভক্তিতত্ত্বের উদয় হয় না।

৩। শ্রীভাগবত এই ভক্তিতত্ত্ব প্রকটন করেন, এইজন্য সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে ভাগবতই সার শাস্ত্র। শ্রীভাগবত অপৌরুষেয়। ইহা কাহারও কৃত নহে। ভক্তিযোগে কৃষ্ণের কৃপায় ব্যাসের কৃষ্ণস্মৃতিতে ভাগবততত্ত্ব উদিত হইয়াছিল।

৪। অজ্ঞও যদি ভাগবতের শরণ লয়, তাহারও ভাগবতের অর্থজ্ঞান হইতে পারে। প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ। কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিয়া ভাগবত বুঝাইবে।

দেবানন্দের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের নিকট

শ্রীভাগবত-পাঠের উপদেশ পাইলেন। করুণাময় প্রভু দেবানন্দ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া সকলের প্রতি এই হিতগর্ভ উপদেশ করিলেন।

এইজন্য আমাদের প্রাণাধিক শ্রীস্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর বলেন—

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস-মাত্র।
ইহা বুঝে যেই হয় কৃষ্ণ কৃপাপাত্র॥
দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ কৃপাপাত্র॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত-ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥

সুতরাং বৈষ্ণবের স্থানে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের নিকট শ্রীভাগবত না শুনিলে ভক্তিরসের পুষ্টি হয় না। এমন কি জনসাধারণের আদৌ ভক্তির সঞ্চার হয় না। এই জন্যই শ্রীস্বরূপের উপদেশেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশেরই প্রতিধ্বনি উদ্ঘোষিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

অনুকূল সমালোচনা।

শ্রীস্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়া বলিলেন "এইরূপে অগ্রে সতত শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গ কর, শ্রীগৌরাঙ্গচরণে একান্ত ভক্ত হও, বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়ন কর। ইহাতে তোমার সিদ্ধান্ত-জ্ঞান জন্মিবে, তখন তুমি নির্ম্মলভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লীলাবর্ণনে সমর্থ হইবে। তুমি তোমার মনের সাধে শ্লোক রচনা করিয়াছ, তোমার শ্লোকের তুমি যে অর্থ করিয়াছ সে অর্থে উভয় পক্ষেই দোষ ঘটিয়াছে।

কিন্তু শব্দ সাক্ষাৎ ব্রাহ্মীশক্তি,—সাক্ষাৎ সরস্বতী। তুমি রীতি' না জানিয়া যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে শব্দের সহিত শব্দ গ্রথিত করিয়া শ্লোক রচনা কর না কেন, সরস্বতী-মুখে উহার নির্ম্মল ব্যাখ্যা হইবেই হইবে। উহা শব্দ-শক্তির এক বিশেষ চমৎকারিত্ব,—বিশেষ অলৌকিকত্ব। দৈত্য-গণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছে, সরস্বতী-মুখে সেই সকল শব্দ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেখ, শ্রীমদ্ভা-গবতের দশম স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকটী ইন্দ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদে পূর্ণ। শ্লোকটী এই—

বাচালং বালিশং স্তব্ধ মজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং॥

ইহার অর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে গোপগণ যখন শ্রীবৃন্দাবনের ইন্দ্রপূজা উঠাইয়া দিলেন, ইন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য না জানিয়া বলিয়া-ছিলেন "বাচাল, বালিশ (শিশু), স্তব্ধ (অবনীত), অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য ও মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে।" যদিও এই সকল নিন্দাবাদসূচক বাক্য দ্বারা ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু শব্দশক্তি সরস্বতী-মুখে এই সকল শব্দ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের

স্তুতি করা হইয়াছে। বাচাল—বেদ প্রবর্ত্তক, শাস্ত্র-যোনি ; বালিশ—শিশুর স্থায় নিরভিমান ; স্তব্ধ—শ্রীকৃষ্ণের বন্দনীয় কেহই নাই সুতরাং তিনি অনম্র ; অজ্ঞ—যাহা হইতে জ্ঞানবান কেহই নহে তিনি অজ্ঞ ; পণ্ডিতমানী—ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও বহু মাননীয় ; কৃষ্ণ—সদানন্দরূপ ; মর্ত্ত্য সদানন্দরূপ হইয়া ভক্তবাৎসল্যে মানুষরূপে প্রতীয়মান ;— তদ্দ্বারাই সরস্বতী মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তবই প্রকাশ পাইতেছেন। জরাসন্ধাদি দৈত্য-গণের নিন্দাবাদও এইরূপেই পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ সরস্বতী কখনও শ্রীভগবানের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহাকে প্রকৃত অর্থ ই প্রকাশ করিতে হইবে।

তোমার শ্লোকের তুমি যেরূপ ব্যখ্যা করিয়াছ, তাহা দোষজনক বটে। কিন্তু সরস্বতী-মুখে উহার প্রকৃত অর্থ আছে, তাহা নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। উহা এইরূপ,—জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে ও শ্রীভগবানে কোন ভিন্ন ভাব নাই। এক তত্ত্ব হইয়াও তিনি দুইরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এখানে তাঁহার একরূপ,—দারু ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। সংসার-তারণের নিমিত্ত তাঁহার স্বীয় অচিন্ত্যস্বরূপ ইচ্ছা শক্তিতেই তিনি দুইরূপে প্রকাশিত হইলেন। একরূপ শ্রীজগন্নাথ, আর একরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ। একরূপ স্থাবর—অপর রূপ জঙ্গম। দারু ব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেই লোকের সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্তু সকলের সে সৌভাগ্য হয় না। সকল দেশের সকল লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে পারেন.না। তিনি পরম দয়ালু। তাই তিনি তাঁহার শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকাশিত করিলেন, এবং দেশে দেশে যাইয়া জীব-নিস্তার করিলেন। তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সব দেশের সব লোক নারে আসিবার।
গৌর জঙ্গম রূপে কৈল অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা॥

উভয় শ্রীমূর্ত্তিই বস্তুতঃ এক। জীব-নিস্তারের জন্য তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তি। এক তত্ত্ব হইয়াও জী[illegible] নিস্তারের জন্য তাঁহার বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি

প্রকাশ ও বিবিধ লীলা। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে স্থাবর ও জঙ্গম উভয় শ্রীমূর্ত্তিই বিরাজমানা।

শ্রীস্বরূপের এই ব্যাখ্যার সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত বর্ণনাটীও ভক্তজনগণের অবশ্য পাঠ্য—

নীলাচলবাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক "হরি" বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
এই তো "সচল জগন্নাথ" সবে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভুলে॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সেই স্থানের ধূলি লুট করেন সকল॥
ধূলি লুট পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।
তাঁহার আনন্দ হয় অকথ্য কথন॥
কিবা সেই শ্রীবিগ্রহ,—সৌন্দর্য্যানুপাম।
দেখিতে সবার চিত্ত হরে অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ ধারা শ্রীনয়নে।
"হরে কৃষ্ণ" নামমাত্র শুনি শ্রীবদনে॥

নীলাচলবাসিগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকৃতই "সচল জগন্নাথ" বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কলিযুগে লুকাইতে পারেন নাই। আনন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোকেরও তদীয় স্বয়ং-ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া স্বরূপ বলিলেন "তোমার শ্লোকের ইহাই প্রকৃত অর্থ। তুমি যে এই শ্লোক রচনা করিয়াছ ইহাই তোমার সৌভাগ্য। তুমি ভক্তিবশে শ্লোক রচনা করিয়াছ, শ্রীভগবান অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিতেও যাহারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করে, পরম কারুণিক শ্রীনাম সেই নিন্দুকদিগকেও উদ্ধার করেন।

কবি এই উপদেশ পাইয়া অতি দীনভাবে দন্তে তৃণ লইয়া সকল ভক্তের শ্রীচরণে পড়িতে লাগিলেন, আর সকলের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তাঁহার যেন শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তচরণে ভক্তি জন্মে। ভক্তগণ তাঁহাকে আপন বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করাইলেন। কবি দেশ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাঁহার দেশে যাওয়া হইল না, তিনি আনন্দময়ী শ্রীলীলায় আকৃষ্ট হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল নীলাচলেই যাপন করিলেন। তাঁহার নাটক-পরীক্ষা করিতে বসিয়া দয়াময় শ্রীস্বরূপ-দামোদর তাঁহাকে একবারে জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন। ইহা শ্রীস্বরূপের কৃপারই চিরশুভ ফল।

দশম অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ।

শ্রীরথযাত্রায় প্রভুর নর্ত্তন, "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক-আবৃত্তি, এবং শ্রীস্বরূপের "সেই তো পরাণ নাথ পাইনু" গানের বিষয় পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। রথের অব্যবহিত পরে আবার ইহার কিঞ্চিৎ সবিস্তার উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। রথাগ্রে প্রভুর নর্ত্তন ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রীকীর্ত্তন বর্ণন করিতে প্রকৃতই লোভ জন্মে। কিন্তু সে চিত্র মনে করিতে গেলেই অনন্ত আনন্দের তরঙ্গে চিত্ত ডুবিয়া যায়, সুতরাং উহার এক কণাও পরিস্ফুট করা যায় না। পাঠকগণ এই আনন্দের অনন্ত সমুদ্রের কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিবেন। তাহাতে দেখিতে পাইবেন, শ্রীশ্রীপ্রভু ও তাঁহার স্বরূপ শ্রীকীর্ত্তন সম্প্রদায়গণ লইয়া রথাগ্রে গোলকের কীদৃশ আনন্দাভিনয় করিয়া ভক্তগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

এই রথের দিবসে মহারাজ প্রতাপরুদ্র বলিয়াছিলেন—

আয়াতোঽদ্য রথোৎসবস্য দিবসো দেবস্য নীলাচল
ধীশস্যাদ্য পুরো নটিষ্যতি নিজানন্দেন গৌরোহরিঃ
বিশ্রান্তির্নটনাবসানসময়ে কর্ত্তাব্যা জাতাবনে।
হন্তাদ্যৈব মনোরথঃ সফলতাং যাস্যত্যয়ং মাদৃশঃ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮ম অঙ্কে।

অর্থাৎ "আজ নীলগিরির অধীশ্বর শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন; আজ রথের সম্মুখে নিজপ্রেমানন্দে গৌরহরি নৃত্য করিবেন। তার পরে জাতি ফুলের বাগানে যাইয়া বিশ্রাম করিবেন। আহা আজ বোধ হয় আমার মনোরথ সফল হইবে।" প্রকৃতই এই দিবস মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইল। প্রতাপরুদ্র প্রভুর নৃত্য দেখিতে দেখিতে একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার জীবন-মরণের জ্ঞান রহিল না। অনেক পূর্ব্বেই তিনি রাজবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি যেন অতর্কিত ভাবে ক্রমেই প্রভুর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সহসা গিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু তখন ভাবে উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানহীন। রাজার এই কার্য্য দেখিয়া ভক্তগণের মনে বড় আশঙ্কার উদয় হইল। তাঁহারা মনে করিলেন আজ না-জানি কি অনর্থপাত হয়। প্রভু সন্ন্যাসী। রাজস্পর্শ তিনি অপরাধজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আনন্দ-বিহ্বল শ্রীভগবান চক্ষু মুদিয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

কোন্নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দ চরণাম্বুজং
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যু রূপাস্য মমোরুত্তমৈঃ।

অর্থাৎ "ভজনযোগ্য ইন্দ্রাদি থাকিতে নশ্বর কোন্ মনুষ্য সেই অমর বৃন্দবন্দ্য শ্রীভগবানের চরণ বন্দনা করে।" প্রভু পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গোপীনাথ বলিলেন—

সাহসং ক্বচ গুণায় কল্প্যতে
ক্বাপি দূষণতয়া চ সিধ্যতি

সাহসেন যদকারি ভূভুজা
তত্তপোভি রখিলৈশ্চ নাপ্যতে।

অর্থাৎ "মানবগণের অতি সাহসে যেমন অপকার হয়, আবার কখন কখন অতীব উপকারজনকও হইয়া থাকে। আজ বিষম সাহসে মহারাজের যে উপকার হইল, মানুষ প্রচুর তপস্যা দ্বারাও তাহা লাভ করিতে পারে না।"

প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিয়া প্রভু আবার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই নৃত্যের এইরূপ বর্ণন আছে—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্বিক ভাবোদ্গাম হয় সমকাল॥
মাংসবৃন্দসহ রোম বৃন্দ পুলকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্ব অঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গাম।
জজ গগ জজ গগ গদ্‌গদ বচন॥
জল-যন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ-কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম॥
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু শ্বাস হয় হীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ।

পাঠক ইহা হইতেই রথাগ্রে নর্ত্তনের কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লউন। প্রভু "জয় জগন্নাথ" "জয় জগন্নাথ" বলিতে চাহেন, কিন্তু ভাবাবেশে তাহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি জজ গগ জজ গগ বলিয়া নীরব

হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর চক্ষু হইতে পিচকারীর ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে এই অশ্রু সম্বন্ধে একটী পদ্যে অতি পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহা এই—

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লাবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃক্ষণাৎ
শ্রীমদ্গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ
প্রাপ্যোরো পদবীং ত্রিধা প্রসারতা ভূমৌত্রুটন্মৌক্তিক
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃ প্রভোরশ্রুণা।

অর্থাৎ "মহাপ্রভুর হৃদয় মহাপ্রেমের উৎস। এই উৎস হইতে প্রেমধারা অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া, প্রথমতঃ তাঁহার নয়ননদী পূর্ণ করিয়া নেত্র লোমরাশিকে পরিপ্লুত করিয়া তুলিতেছে। তার পরে ক্ষণকালের মধ্যেই সেই নয়ন-পরিপ্লাবিনী অশ্রুধারা গণ্ডতট পরিপ্লাবিত করিয়া বক্ষদেশে প্রবাহমান হইতেছে। বক্ষ হইতে আবার অশ্রুপ্রবাহ তিন ধারায় ভূতলে পড়িতেছে। পরিচ্ছিন্ন মুক্তামালার ন্যায় প্রভুর এই অশ্রুজল জগতের আনন্দবর্দ্ধন করুন।"

প্রভুর অশ্রুযুগল হইতে বর্ষাসলিল পরিপীড়িত দ্বিকুল-সংপ্লাবিনী তটিনী-প্রবাহের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, তিনি চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছেন, আর সেই ধারা পিচকারীর জলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তগণের দেহ আর্দ্র করিতেছেন এবং প্রেমে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। যাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত, প্রভুর শ্রীদেহ রক্ষার নিমিত্ত সততই তাঁহারা ব্যাকুল। তাঁহারা দেখিলেন ভক্তগণের আর বাহ্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর শ্রীদেহের উপরে আসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। তখন তিনটী মণ্ডলী করা হইল। প্রথম মণ্ডলে রহিলেন, গায়ক ও বাদকগণ সহ শ্রীস্বরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। ইঁহাদের মধ্যে উজ্জ্বল তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীগৌরচন্দ্রমা আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর গোবিন্দ প্রভৃতি বলশালী প্রভুর নিজগণ। তৃতীয় মণ্ডলীতে পাত্রমিত্র ও বীর পুরুষগণ সহ মহারাজ প্রতাপরুদ্র নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে অসংখ্য লোকের

ভীড়। কিন্তু এই উপায়ে প্রভুর শ্রীদেহের উপর লোক-পতনের আর সম্ভাবনা রহিল না। লক্ষ লক্ষ চক্ষু কেবল এক প্রভুর দিকে আকৃষ্ট! কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন :—

গায়দ্ভির্গায়নৈ স্তৈঃ প্রথমবলয়িতে মণ্ডলে তদ্বহিশ্চ
শ্রীকাশীমিশ্রমুখ্যৈঃ পরমসুমতিভি স্তৎপদাব্জপ্রপন্নৈঃ।
হস্তগ্রাহং প্রমোদাৎ সতত বলয়িতে তদ্বিহশ্চ প্রতাপ-
প্রাক্‌শ্রীশ্রীরুদ্রদেবেনিভৃতমিতইতো বেষ্টিতো ভাতি নাথঃ॥

সাধারণ ভক্তগণোপযোগী উদ্দণ্ড নৃত্যের পর প্রভু প্রেমিক ভক্তগণ-সেব্য মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীস্বরূপের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একত্র মধুর নৃত্যের একটী ভুবনমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র ভক্তের প্রাণায়াম, ভক্তের ধ্যেয়, ভক্তের উপসনার বস্তু।

এই স্থানে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল শিশির বাবুর শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি এই চিত্রখানি সাধারণ পাঠকগণের নিকট অতীব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত বলিতেছেন :—"মহাপ্রভু মধুর নৃত্য করিতে করিতে দেখেন পার্শ্বে স্বরূপ দামোদর, দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, স্বরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে লইলেন, গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। তখন বোধ হইল যেন স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহে প্রবেশ করিলেন। কারণ প্রভু স্বরূপকে যে আলিঙ্গন করিলেন অমনি তিনি যেন লোকের অদর্শন হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে :—

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরিতীহ দামোদরঃ
স্বরূপইব তস্য কিং যতিবরোঽয় মুদ্‌ঘুষ্যতে।
য এষ নটনোৎসবে হৃদয়-কায়বাগ্‌ বৃত্তিভিঃ
শচীসুত কলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী ইহার অনুবাদ করি[illegible]য়াছেন—

স্বরূপ গোসাঞীর ভাগ্য না [illegible]
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায়[illegible]

স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজে ইন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥

এই দেখিলেন দুইজনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথক হইলেন। তখন দুইজনে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন দুইজনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, করধরাধরি, মুখোমুখি নৃত্য করিতেছেন। কখন ঐরূপ মুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের বাহু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপের মুখে নয়নপদ্ম অর্পণ করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা দুইজনে মুখ ঘুরাইয়া পৃষ্ঠে-পৃষ্ঠে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা উভয়ের পলক হারাইয়া নয়নে নয়নে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্য দেখিয়াই বুঝি মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল যথা :—

হেরাহেরি ফেরাফেরি ধরাধরি বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদ হেন গরাসিল রাহু॥

আবার স্বরূপ, সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং প্রভু স্বরূপের কটি ধরিয়াছেন; আর স্বরূপ বক্র হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে—

উন্মীলন্মকরন্দ সুন্দর পদদ্বন্দ্বারবিন্দোল্লস
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিমু প্রকাম মমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমূর্দ্ধ্নঃ করকুট্মলৈরিতইতোহর্ধাদধোধো গুরু
স্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাম্॥

আবার কখন বা প্রভু, দক্ষিণদিকে স্বরূপের,—বাম দিকে বক্রেশ্বরের হস্ত ধরিয়া দ্রুতপদে নৃত্য করিয়া হাসিতে হাসিতে একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, আবার ঐরূপ নৃত্য করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে [illegible]তে হটিয়া আসিতেছেন। আবার প্রভু কখন বক্রেশ্বর ও স্বরূ[illegible]রিয়া যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, অমনি কাঁপিতে কাঁ[illegible] হৃদয়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন!

ভাবিতেছেন ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। আর প্রভু যত বৃন্দাবনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝায় বায় তৎক্ষণে উঠিল॥ চরিতামৃত॥

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেমভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জ্জরিত হইয়া স্বরূপ ও বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে ইহা কিরূপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে না, বরং লোকে উহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন, গোপীপ্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ বা কামরোগ থাকিতে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ বা কামরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ লোপ হয়, (৪) অতএব স্ত্রী ও পুরুষে মধুর প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়। এক

---

(৪) এস্থলে শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের পদ্যটী উল্লেখযোগ্য তদ্‌যথা:—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি, বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খুঁজলুঁ আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অবসোই বিরাগ, তুহুঁ ভেল দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান॥

প্রকৃত প্রেমে পুরুষ-রমণীর ভেদ বিচার নাই। স্ত্রী: পুরুষ। বিচারে যে ভালবাসা জন্মে

শ্রীভগবানই পুরুষ, আর সমুদায় প্রকৃতি, ও পরিণামে জীবমাত্র গোপ-গোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত যে কত গাঢ় সম্বন্ধ তাহা কতক অনুভব করা যাইতে

উহা প্রেম নহে—কাম। কামজ আকর্ষণে পুরুষের প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষের এক প্রকার আসক্তি জন্মে। কিন্তু উহা প্রেম নহে। তাই প্রেমিকবর্গবিচূড়ামণি রায় রায় লিখিয়াছেন :—

না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ইহারই সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে
প্রেমরসে নোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ।

অথবা—

অহংকান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
ভবান্ ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্।

প্রেম, ইতরজ্ঞানব্যাবর্ত্তক (Transcendental)। প্রেমের পূর্ণ প্রভাবে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তিরোহিত হয়, ব্যবসায়াত্মক ও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান নিরস্ত হইয়া যায়। সবিকল্পক জ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না। সুতরাং স্ত্রীপুরুষের ভেদবিচার এই নির্ব্বিকল্পক অবস্থায় অসম্ভব। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয়ে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহার উপরে ভগবৎ প্রেমের গূঢ়গম্ভীর আবেগে চিত্তে যে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়, তাহাতে সমগ্র অন্তর্জগৎকে প্রেমের কি-জানি-কেমন-এক প্রভাবে প্রফুল্ল-মধুর করিয়া তুলে। সেই প্রেমে কামজ বা রূপজ প্রভাবের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না। ইহাই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

* * * * *

পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাঁহারা দেখিবেন যে এই প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞান নাই।"

একাদশ অধ্যায়।

রথাগ্রে নৃত্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের অগ্রে প্রভুর নৃত্য প্রকৃতই শ্রীগোলক-মাধুরীর অভিনয়,—প্রেমসিন্ধুর বিশালতরঙ্গ। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

আনন্দ-হুঙ্কার-গভীর-ঘোষো
হর্ষানিলোচ্ছ্বাসিত তাণ্ডবোর্ম্মিঃ
লাবণ্যবাহী হরিভক্তি-সিন্ধু
শ্চলঃস্থিরং সিন্ধুমধঃ করোতি।

অর্থাৎ অহো, শ্রীগৌরাঙ্গ যেন লাবণ্যবাহী সাক্ষাৎ হরিভক্তিসিন্ধু। আহ্লাদ-অনিল-প্রবাহে এই মহাসিন্ধুতে তাণ্ডবনৃত্যরূপ উর্ম্মিমালা উচ্ছ-সিত হইয়াছে। আর প্রভুর আনন্দজনিত হুঙ্কারই যেন এই সিন্ধুতরঙ্গের কল্লোলধ্বনি। এই হরিভক্তি-সিন্ধুর-তরঙ্গ-কল্লোলের তুলনায় ঐ স্থির সিন্ধু যেন পরাজিত হইয়া পড়িয়াছে।" আমাদের মনে হয়, নৃত্য বুঝি

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গা-জল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবারে যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥

প্রেমেরই অভিব্যক্তি; নৃত্য বুঝি প্রেমসাগরের তরল তরঙ্গ। জ্ঞানের সহিত ঐ অনন্ত আকাশের তুলনা হইতে পারে, জ্ঞানের সাধক ধ্যান-মজ্জিতচিত্তে অনন্ত আকাশের সহিত তাঁহার ধ্যেয় বস্তুর তুলনা করিয়া গম্ভীর ভাব অবলম্বন করেন কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের প্রভাবে অথবা তাঁহার সৌভাগ্যফলে যে মুহূর্ত্তে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ধ্যেয়পদার্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠে, গাম্ভীর্য্য দূরে যায়, মহাসাগর-তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় প্রেম-সিন্ধুর তরঙ্গাভিঘাতে তাঁহার আনন্দময় হৃদয় নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠে, তিনি আর তখন স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, লজ্জা মান সকলই তিরোহিত হয়। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাই বলিয়াছেন :—

পরিবদতু জনো যথাতথায়ং
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম।

অর্থাৎ ওহে, মুখর লোক যেখানে-সেখানে নিন্দা করে ক, আমরা সে বিচার করিব না। আমরা হরিরস-মদিরায় প্রমত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইব, নৃত্য করিব আর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিব।

শ্রীবৃন্দাবনের মহারাস,—মহাপ্রেমের অভিনয়। এই মহারাসে প্রেমের হানৃত্য প্রকাশ পান। যেখানে প্রেম, সেইখানেই নৃত্য। হৃদয়ে যাহা প্রেম, বাহিরে তাহার কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তির নামই নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ বড় চঞ্চল, কেন না, তিনি প্রেমস্বরূপ। প্রেম স্থৈর্য্য জানে না, ধৈর্য্য মানে না। বায়ুবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় অনন্ত প্রেমসিন্ধু সততই চঞ্চল, সততই নৃত্যশীল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝি প্রেমের নৃত্য হইতে প্রকাশিত হয়, তাই ভক্ত কবি লিখিয়াছেন :—

চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মহানৃত্যের মহাশক্তি প্রতিষ্ঠিত।

তাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চঞ্চল ভাবে অনুক্ষণ তালে তালে নাচিয়া বেড়াইতেছে। মানুষের হৃৎপিণ্ড তালে তালে নাচিতেছে, নাড়ী তালে তালে চলিতেছে। বায়ু তালে তালে বহিতেছে, নদীর জল কুলুকুলু-কলরবে তালে তালে ছুটিতেছে, দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর একই নিয়মে তালে তালে চলিতেছে। পৃথিবী চন্দ্রসূর্য্য তারকা ও অনন্তগ্রহ উপগ্রহ সকলই মহাকালের মহানিয়মে তালে তালে ভ্রমণ করিতেছে। এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক ছন্দোময় মহাব্যাপার। তাই বেদ বলেন :—

ছন্দাংশি বৈ বিশ্বরূপাণি—শতপথ ব্রাহ্মণ।

জ্ঞানী ও যোগী ধ্যানগম্ভীর। তাঁহারা শান্তির সুস্থির সাধক। কিন্তু প্রেমিক ভক্ত মুক্তি চাহেন না শান্তি খোঁজেন না। প্রেমিকের জীবনে স্থৈর্য্য নাই—চিরদিনই সে জীবন আকাঙ্ক্ষাময়। চঞ্চল প্রাণবল্লভের প্রেম চিরদিনই হৃদয়কে কোথা হইতে যেন কোথায় লইয়া যাইতে প্রয়াসী। চিরচঞ্চল প্রেমের জীবনে শান্তি আসিতে পারে না।

তবে শান্তি শান্তি বলিয়া লোকে আকুল হয় কেন? বিজ্ঞানবিদ্ জানেন শান্তিই মৃত্যু। চাঞ্চল্যই জীবন। এই জগৎ চঞ্চল, এই জগৎ নৃত্যময়। চাঞ্চল্যই জাগতিক নিয়ম। এই জগৎ সেই মহাশক্তির শক্তি তরঙ্গের আভাসমাত্র। যেখানে শক্তি, সেইখানেই ক্রিয়া। প্রেম মহা শক্তি। শ্রীভগবৎস্বরূপলক্ষণা হ্লাদিনী শক্তির তরঙ্গে জগতের নৃত্য অনিবার্য্য। মানুষের হৃদয়ে যখন যে পরিমাণে এই শক্তির আভাস প্রকাশ পায়, মানুষের প্রাণ তখনই নাচিয়া উঠে। সুতরাং এই নৃত্যের সহিত মানুষের ইচ্ছার কোন সম্বন্ধ নাই। গোলকের শক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মানুষকে প্রমত্ত করিয়া তুলেন, আর সেই হর্ষের বেগে দেহযন্ত্র নাচিয়া উঠে।

শ্রীনামকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনভেদে শ্রীকীর্ত্তন যেমন দুই প্রকার, উদ্দণ্ড ও মধুর ভেদে শ্রীনৃত্যও তেমনি দুই প্রকার। বহিরঙ্গ ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেন, আবার প্রিয় পার্ষদ একান্ত অন্ত-রঙ্গ শ্রীস্বরূপ রামানন্দ সহ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রসাস্বাদ করিতেন, তখন

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ বর্ণিত ব্রজরস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনৃত্য সম্বন্ধেও এইরূপ।

প্রভু বহিরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে রথাগ্রে তুমুল উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন, সে বিশাল তুমুল নৃত্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। প্রভুর সেই বিশ্ব-বিস্ময়জনক উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে ধরণী কম্পিত হইতেছিল, আর প্রভুর "জজ গগ" ও ভক্তগণের "জয় জয়" শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছিল, কল্লোলকোলাহলবৎ কাহল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ নিরস্ত করিয়া দিয়া জয় জয় শব্দ ও ভক্তগণের উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য দর্শকমাত্রকেই বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। অহো, সেই উর্দ্ধনয়ন, উর্দ্ধবাহু ও তাণ্ডব নৃত্য,—আর সেই ব্রহ্মাণ্ডভেদি হরিধ্বনিনাদ ও—জজ গগ জজ গগ "জয় জয়" শব্দের কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, তখন নীচযোনিতে জন্ম লইয়াও যদি সেই নৃত্য দেখিতে পাইতাম ও সেই ধ্বনি শুনিতে পাইতাম তবেও বুঝি ভক্তগণের চরণরেণু প্রাপ্তির অধিকার হইত। প্রভু রথাগ্রে কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করার সময়ে রথের উপর শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দেখিয়া হাত জুড়িয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহা এই ঃ—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণি বংশ-প্রদীপঃ
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বী-ভারনাশো মুকুন্দঃ।

প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সাত সম্প্রদায়ের নৃত্য হইতে লাগিল। প্রভু যুগপৎ সাত স্থলে বিলাস করিতে লাগিলেন। রাস নৃত্যেতে সকল গোপীই যেমন কৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রত্যেক দুই জনের মধ্যে নৃত্য করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়স্থ ভক্তগণও শ্রীগৌরাঙ্গকে সেইরূপ নিরন্তর আপনাদের মধ্যস্থ দেখিতে পাইলেন।

সাতঠাই বলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥

আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥
কেহ লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যাঁর শুদ্ধ ভক্তি"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রভু এই যে জয় জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন এবং ঘন ঘন জয়ধ্বনিসূচক স্তব পাঠ করিলেন, এই জয়-জয় ধ্বনি শাস্ত্রসম্মত। রথারোহণের পূর্ব্বে "জয় জয় ধ্বনি" উচ্চারণ করা শাস্ত্রের আদেশ। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করাই প্রভুর কার্য্য। প্রভু নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন ঃ—

মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কারণে কৈল বেদ আর পুরাণ॥

সুতরাং শাস্ত্রবাক্য প্রতিপাল্য। শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে—

রথযাত্রাস্থিতে কৃষ্ণে জয়েতি প্রবদন্তি যে।
জয়েতি চ পুনর্ব্বারং শৃণু পুণ্যং বদাম্যহং॥
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
বারাণস্যাদি তীর্থেষু দেবানাঞ্চৈব দর্শনে॥
যৎফলং কবিভিঃ প্রোক্তা কাৎস্নের্ন চ নরেশ্বর।
জয় শব্দে কৃতে বিষ্ণো রথস্থে তৎফলং স্মৃতং॥

ভবিষ্যপুরাণে।

গীত নৃত্য বাদ্যাদির সম্বন্ধেও শাস্ত্রে এইরূপ বিধি দেখা যায় যথা ঃ—

নৃত্যমানৈর্ভাগবতৈর্গীতবাদিত্র নিস্বনৈঃ
ভ্রাময়েৎ স্যন্দনং বিষ্ণোঃ পুরমধ্যে সমন্ততঃ॥

রথাগ্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ও জয় জয় ধ্বনিতে শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম-আচরণ করিয়া জীবদিগের হৃদয়ে সেই সকল উপদেশ কিরূপ প্রতিফলিত

করিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রত্যেক লীলাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক প্রভু রথাগ্রে অনেকক্ষণ তুমুল উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

এই মত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপের আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥
"সেই তো পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ॥"
এই ধুয়া উচ্চৈস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রভুর মন "ভাববিশেষে" প্রবেশ করিল, তিনি তাণ্ডব নৃত্য ছাড়িলেন। তিনি সহসা নৃত্য ভঙ্গ করিলেন কেন, অপরে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ-দামোদর তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া তিনি "সেই ত পরাণ নাথ পাইনু" পদ ধরিলেন। আর প্রভু মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই মধুর নৃত্য সেই মহারাসের নৃত্য—সেই ব্রজ-বালাদের নৃত্য। প্রভু পূর্ব্বে ভক্তভাবে উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিলেন, কিন্তু ভাবময় গোরাচাঁদের হৃদয়ে সহসা গোপীভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল তিনি শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ যেন কুরুক্ষেত্রে আছেন। আর তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন, আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার রাখালিয়া বন্ধু এখানে আসিয়া রাজা হইয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের আর সীমা নাই, সে ধড়া চূড়া নাই, সে মুরলী নাই, মাধুর্য্যমাখা ব্রজের সে বেশের কিছুই নাই, সেই কৃষ্ণই বটেন, সেই তিনিই বটেন, কিন্তু এ রাজবেশ। এই জন-প্রবাহে হস্তি-অশ্ব-পরিপূর্ণ, নিরন্তর ঘর্ঘরনাদ-মুখরিত রাজপথে তাঁহার মনে শ্রীবৃন্দাবনের সুখস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তাই প্রভু শ্রীরাধাভাবে

বিভাবিত হইয়া কাব্যপ্রকাশের স্ফুটালঙ্কার-বিহীন রসপ্রাধান্ত-সূচক একটী শ্লোক বারবার পাঠ করিতে লাগিলেন :—

যঃ কৌমারহরঃ সএবহি বরঃ স্তাএব চৈত্রক্ষপাঃ
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্রসুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা রোধসিবেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥

এক স্বরূপ ভিন্ন আর কেহই এই পদ্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেন না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনে অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥
ইহা লোকারণ্য ঘোড়া হাতী রথ ধ্বনি।
তাহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি ॥
ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী বদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ সমুদ্রের ইহা নাহি এককণ ॥
আমা লয়ে পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় তো পূরণে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি গ্রন্থ শ্রীমুরারিগুপ্ত-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-চতরিামৃত। এই শ্রীগ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমে বিংশতি সর্গে এই লীলার

মূল সূত্র লিখিত আছে, তদ্‌যথা ঃ—

পশ্যন্ জগন্নাথমুখারবিন্দং
স্মরন্ কুরুক্ষেত্র বিশাল বৈভবম্
সঙ্কীর্ত্তনানন্দ সমুদ্রমগ্নৈঃ
স্বভক্তবর্গৈঃ কিল বেষ্টিতো হরিঃ॥ ১৩
শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তো
হসন্ রুদন্ প্রাহ "ত্বমেব নাথ
আগচ্ছ যামি ব্রজমণ্ডলং বিভো
বৃন্দাবনং যত্র সুবংশিকাধ্বনিম্॥" ১৪॥

প্রভু শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহার মনে স্ফুর্ত্তি হইতেছে না, তাই তিনি রাধাভাবে বলিতেছেন "যদি কেহ এই বৈভববিলাস ভালবাসে বাসুক, আমার মন বৃন্দাবন ছাড়া আর কিছুই চাহে না। নাথ, প্রকৃত কথা বলিতে কি, বৃন্দাবন ও আমার মন এক হইয়া গিয়াছে, বৃন্দাবন ছাড়া আমার মনে আর কিছুই আপন বলিয়া বোধ হয় না। যদি আমার মনের দিকে চাও, যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকে, তবে এস, বৃন্দাবনে চল। এখানে মিলনে সুখ নাই। তুমি যোগের উপদেশ করিতেছ, যোগের উপদেশ আমি বুঝিতে পারি না। আমার মন তো তুমি জান, আমাকে ভাঁড়াইও না। তোমার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, আর তোমার কথা ভাবিব না, আর তোমার কথা মনে করিব না, অন্য চিন্তা করিব, অন্য বিষয় ভাবিব, কিন্তু পারি না, তোমায় ছাড়িয়া চিত্ত কোন দিকেই যাইতে চাহে না। আমরা অবলা আহিরী গোপবালা, আমরা ধ্যানের কি জানি, যোগের কি জানি, আমাদিগকে ওরূপ উপদেশ দিও না। উহাতে আমাদের সন্তোষ হয় না। আমরা চাই তোমার শ্রীচরণ। অন্য কুটীনাটী কথা শুনিলে আমাদের দুঃখ হয়। যোগীরা তোমার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া সংসার কূপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। আমাদের দেহের স্মৃতিই নাই; সংসার কূপের আর কথা কি? আমরা তোমার বিরহ সমুদ্রে ভাসিযা যাইতেছি, আমাদিগকে এই বিরহ হইতে পরিত্রাণ কর।

বন্ধু, বৃন্দাবনের কথা কি তোমার মনে নাই? সেই যমুনা-পুলিন, সেই গিরিগোবর্দ্ধন, সেই কুঞ্জকানন, সেই রাসলীলা,—বন্ধু, কিছুই কি তোমার মনে নাই! ব্রজজনের কথা, তোমার স্নেহময় জনক জননীর কথা কেমন করিয়া ভুলিলে?

তুমি পণ্ডিত, তুমি সুশীল, তুমি স্নিগ্ধ ও করুণ। তোমায় দোষ থাকা তো দূরের কথা, তোমাতে দোষাভাসও থাকিতে পারে না। তবে যে তুমি ব্রজবাসীদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ ইহা কেবল আমাদেরই দুর্দ্দৈব। আমি আমার নিজের দুঃখের কথা মনে করি না, কিন্তু ব্রজেশ্বরী তোমার মা যশোদার দুঃখের কথা মনে করিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হয়। নাথ তুমি ব্রজে চল, নচেৎ ব্রজজনের আর জীবনের আশা নাই। তুমি যে রাজবেশে অপরের সহিত অপর দেশে থাক, ইহা আমরা সহিতে পারি না। ব্রজবাসীরা ব্রজছাড়া আর কোথা থাকিতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখিলেও তাহাদের প্রাণ রাখা দায়। বল দেখি এখন উপায় কি? ব্রজবল্লভ, ব্রজনাথ, ব্রজজীবন এস, চল ব্রজে যাই।"

প্রভু স্বরূপের সহিত কত দিন-রজনী এই সকল ভাবাত্মক শ্লোকের রসাস্বাদন করিতেন, কত দিন-রজনী তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া এই সকল কথা তুলিয়া বিরহিণী ব্রজবালার ন্যায় অধীর হইয়া কাঁদিতেন। সেই রোদনের সময় মর্ম্মসখী ললিতার ন্যায় স্বরূপ আমার প্রভুকে কত আশ্বাস ও সান্ত্বনা বাক্য শুনাইতেন, প্রভুর বিরহ-অশ্রুধারা কতবার স্বীয় করে মুছাইয়া দিতেন, আবার কতবার নয়নধারায় প্রভুর সুপরিসর বক্ষ প্লাবিত হইয়া বসুন্ধরা পরিসিক্ত হইত। রথযাত্রার দিবসে প্রভুর মনে সহসা ঐ ভাবের উদয় হইল, প্রভু ব্রজগোপীদের রাসনৃত্যের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মধুর নৃত্য করিলেন, ঘন ঘন শ্রীজগন্নাথের মুখপদ্ম দেখিতে লাগিলেন, আর তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে বলেন "নাথ, এখানে থাকিয়া কাজ নাই, এ ঐশ্বর্য্য-পুরীতে সুখ হইবে না, চল একবার আমাদের শ্রীবৃন্দাবনে যাই, সেখানে শ্রীযমুনাপুলিনে ও কুঞ্জকাননে বনলতিকায় কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ডালে বসিয়া পাপিয়া কোকিল শারী শুক মিষ্ট স্বরে প্রাণ-মাতান গানে কুঞ্জবন আমোদিত করিতেছে, চল, সেখানে যাই।"

কিন্তু এ কথা তাঁহাকে শুনাইবেন কিরূপে। শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর। তিনি এখন রাজ্যেশ্বর। আর প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি ব্রজের আহিরিণী দুঃখিন ও কাঙ্গালিনী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই প্রাণবল্লভ। কিন্তু সেখানে তাঁহার যাওয়ায় অধিকার কি? ভাবিতে ভাবিতে প্রভু অবশ হইলেন, নৃত্য থামিয়া গেল, তিনি অমনি মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। যথা শ্রীরূপ গোস্বামীর স্তব মালায়ঃ—

রথারূঢ়স্যারাদধি পদবী নীলাচল গতে
রদভ্র প্রেমোর্ম্মি স্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ
সহর্ষং গায়ন্ডিঃ পরিবৃততনু বৈষ্ণব জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতিপদং।

প্রভু ভাবাবেশে স্বীয় নখদ্বারা মৃত্তিকায় শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লিখিতে লাগিলেন, স্বরূপ দেখিলেন প্রভু নখাগ্রে ভূমিতে কি লিখিতে-ছেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর একান্ত সুহৃদ, মহাপ্রভুই স্বরূপের জীবন। স্বরূপের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ধীরে ধীরে প্রভুর পাশে বসিয়া গেলেন, আর প্রভুর নখের নীচে স্বরূপ অমনি স্বীয় হাত পাতিয়া দিলেন। প্রভু হাত উঠাইয়া আবার ভূমিতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন, স্বরূপ ইহা সহিতে না পারিয়া আবার তাঁহার নখের নীচে আপনার হাতখানি পাতিয়া দিলেন। মহাপ্রভুকে স্বরূপ নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় মনে করিতেন। স্বরূপের এই প্রেমমাধুর্য্য প্রকৃতই অতি চমৎকার। কবি কর্ণপুর তাঁহার নাটকে নিম্নলিখিত পদে মহাপ্রভুর উক্ত ভাব কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত করিয়াছেনঃ—

উত্থায় মন্দমুপবিশ্য সুখোর্ম্মিবেগ
নিম্নাস্যতর্জনীকয়া লিখতো ধরিত্রীং
আশঙ্কিতঃ ক্ষিতিক্ষতে সদয়ং স্বরূপো
দেবস্য পাণিমরুণ নিজ পাণিনেষঃ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছেঃ—

ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈঞা॥

অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর॥

এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গবন্দনায় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে—

"জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন।"

প্রভু প্রকৃতই স্বরূপের "প্রাণধন" ছিলেন। প্রভুর কিঞ্চিৎমাত্র কষ্ট দেখিলেও স্বরূপ অতিমাত্রায় ব্যথিত হইতেন। মৃত্তিকায় লিখনে প্রভুর অঙ্গুলীর নীচে আপন হাত পাতিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার সহিত স্বরূপ পারিয়া উঠিলেন না, প্রভু ভাবাবেশে অধীর। যাহা হউক, স্বরূপের আর অধিকক্ষণ এরূপ যত্ন পাইতে হইল না। প্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাঁহার মনে হইল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন। তিনি উঠিলেন, আনন্দে তাঁহার শ্রীদেহে আবার মধুর নৃত্য উপজাত হইল। স্বরূপ তখন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে প্রভুর যে বিচিত্র ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থ পাঠে আস্বাদন করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসব।

শ্রীশ্রীঅচলদারুব্রহ্মের রথোৎসবে শ্রীশ্রীসচল ব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ যে মহামহোৎসবে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, ভক্তগণ আপন হৃদয়ে তাহার কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন,—সে প্রেম-প্রবাহের ভরপুর আনন্দ আমাদের এই ক্ষীণ ভাষায় প্রস্ফুট করা অসাধ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার সেই উৎসবের যে বিপুল আনন্দময় বর্ণনা করিয়াছেন, ভক্তমাত্রেরই তাহা আস্বাদ্য।

নর্ত্তন ও কীর্ত্তনানন্দের এই বিপুল বিলাস,—এই বিশাল সুধাস্রোত প্রবাহিত হইতে না হইতেই হোরাপঞ্চমীর দিন সমাগত হইল। এই হোরা পঞ্চমীর দিনেই লক্ষ্মীবিজয়োৎসবের বিপুল ঘটা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেমাননর্ত্ত সঃ॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দেখিতে দেখিতে শ্রীদামোদরস্বরূপের মুখে প্রেমমাধুর্য্য শুনিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রেমভরে নৃত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীল মুরারিগুপ্ত মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

হোরাপঞ্চমী-যাত্রাঞ্চ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্
কৃত্বা যযৌ নীলশৈলং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।

কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই হোরাপঞ্চমী মহোৎসবের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই মহোৎসবের আরও দুইটী নাম দেখা যায়। একটী নাম "লক্ষ্মীপ্রয়াণ-যাত্রা," অপর নাম "লক্ষ্মী-কোপ-প্রয়াণ-মহোৎস।" এই শেষোক্ত নামেই এই

উৎসবের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ রথারোহণ করার সময় লক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া গেলেন "আমি রথারোহণে অতি নিকটেই যাইতেছি, সত্বরেই ফিরিয়া আসিব, তুমি এখানে থাক।" কিন্তু একদিন দুইদিন করিয়া কতদিন চলিয়া গেল, তথাপি শঠ ঘরে ফিরিল না, লক্ষ্মীর কোপ হইল। লক্ষ্মী অগণ্য দাস দাসী লইয়া জগন্নাথের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার ভৃত্যগণের প্রতি ও অচেতন রথের প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন। এই উৎসবের নাম "লক্ষ্মীবিজয়োৎসব।"

শ্রীগৌরাঙ্গের চরণরেণুস্পর্শে শ্রীক্ষেত্র যখন আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন এই মহাতীর্থের প্রত্যেক পর্ব্বেই ভক্তগণের দেহে নব জীবন সঞ্চারিত হইত। হোরাপঞ্চমীতে লক্ষ্মীবিজয়োৎসব প্রকৃতই এক মহৈশ্বর্য্যময় ব্যাপার। শঠরাজ-শিরোমণি শ্রীশ্রীজগন্নাথের অনুসন্ধানে শ্রীলক্ষ্মীর প্রয়াণ বিশালসমর-অভিযানের ন্যায় অভিনীত হইত।

কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে আমরা ইহার একটু অভাস নিম্নে প্রকটন করিতেছি। রাজা প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে বলিতেছেন ঃ—

"কাশীমিশ্র, হোরাপঞ্চম্যাং ভগবত্যাঃ শ্রিয়ো দেব্যাঃ প্রয়াণ-যাত্রা সর্ব্বতশ্চমৎকারিণী যথা ভবতি তথা কার্য্যা। ছত্রচামরাদীনি ভগবদ্ভাণ্ডারাগারে যাবন্তি সন্তি বা মম কোষাগারেষু সন্তি বা তাবন্ত্যেব সমানেয়ানি, যথা রথোৎসবাদপি লোচন-চমৎকারত্বেন মূর্ত্তএবাদ্ভুত রসো ভবতি।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত ছত্র-নিচয়েই ইহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ পাইতেছে, তদ্‌যথা ঃ—

হোরাপঞ্চমীর দিন নিকটে জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া॥
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার॥

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র বস্ত্র কিঙ্কিনী আর ছত্র চামরে॥
ধ্বজ বৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডলী।
নানাবাদ্য নৃত্যে দোলায় করহ সাজনী॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥

রাজা প্রতাপরুদ্রের এই আজ্ঞায় হোরাপঞ্চমীতে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসরে অদ্ভুত রসটী প্রকৃতই যেমন মূর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইলেন। ফলতঃ সে সজ্জা দেখিয়া দর্শকমাত্রেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু প্রত্যূষে স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করার জন্য সুন্দরাচলে গমন করিলেন, দর্শন করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যহারে হোরাপঞ্চমীর মহোৎসব দেখিবার জন্য নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীমিশ্র সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভাল স্থানে বসাইলেন। কেন না, মহামহোৎসব দেখিবার জন্য লোকের মহা ভীড় হইবে। শ্রীল অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভু উত্তম স্থানে উপবেশন করিলেন, তখনও প্রয়াণযাত্রা আরম্ভ হয় নাই। মহাপ্রভুর পার্শ্বেই তাঁহার প্রিয়সহচর প্রাণের স্বরূপ। লক্ষ্মী-বিজয়লীলার যে কি গূঢ় রহস্য, এবং লক্ষ্মীর মানের সহিত ব্রজবালাদের মানের যে কি পার্থক্য, ভক্তগণের শিক্ষার জন্য দয়াময় মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা-চ্ছলে রসশাস্ত্রের মূর্ত্তিমান অবতার শ্রীস্বরূপের দ্বারা এই স্থলে তাহা প্রকটিত করিলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ঃ—

"স্বরূপ, যদ্যপি জগন্নাথো দ্বারকালীলা মনুকরোতি, তথাপি গুণ্ডিচা-ব্যাজেন বৃন্দাবনস্মারকেষ্বেতেষুপবনেষু বর্হিতুং প্রত্যব্দমেব নীলাচলং পরিত্যজ্য সুন্দরাচলমাগচ্ছতি। কথং দেবীং শ্রিয়ং পরিত্যজতি?"

অর্থাৎ "স্বরূপ, যদিও শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দ্বারকা-লীলারই অনুকরণ করিতেছেন, কিন্তু এই যে প্রতি বৎসরই তিনি নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া একবার সুন্দরাচলে আগমন করেন, আর শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণে গুণ্ডিচাচ্ছলে উপবনে বিহার করেন, ইহা তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন

লীলারই স্মারক। ভাল, স্বরূপ বল দেখি, তিনি লক্ষ্মীদেবীকে ছাড়িয়া যান কেন?

স্বরূপ বলিলেন, "স্বামিন্ বৃন্দাবন স্মারকেষ্বিতি স্বয়মেব যদুক্তং তদেব সিদ্ধান্তঃ। নহি বৃন্দাবনে প্রিয়াসহ বিহারং অপিচ গোপাঙ্গনাভিরেব।" অর্থাৎ প্রভো, আপনি স্বয়ং-শ্রীমুখেই তো বলিলেন উপবন বিহারে শ্রীবৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি হয়। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শ্রীবৃন্দাবনে মাধুরী-ময়ী গোপঙ্গনাভিন্ন ঐশ্বর্য্যশালিনী লক্ষ্মীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার তো হয় না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া যান।"

মহাপ্রভু। তথাপ্যেষা কোপিনী ভবতি।

অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ যখন গুণ্ডিচা যাত্রাচ্ছলে গমন করেন, বিশেষতঃ তাঁহার সঙ্গে যখন সুভদ্রা ও বলরাম বর্ত্তমান থাকেন অপিচ শ্রীবৃন্দাবন-লীলাও অতি নিগূঢ় তাহা লক্ষ্মীর দুরধিগম্য, তবে লক্ষ্মীদেবী এত রাগ করেন কেন?

স্বরূপ। প্রণয়িনীনাং প্রকৃতিরেবেয়ং যৎ স্বাযোগ্যতাং নেক্ষতে।

অর্থাৎ প্রণয়িনীদিগের এমনই প্রকৃতি যে, ইঁহারা নিজের অযোগ্যতা দেখেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনাও এইরূপ, তদযথা ঃ—

রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে হইল মন।
ঈদৎ হাসিয়া স্বরূপে পুছে বিবরণ॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।
সহজে প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যান তথা খেলে রাত্রিদিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে॥

স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥
প্রভু কহে "যাত্রা স্থলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন॥
গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এই তো স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যাভাসে হয় ক্রোধভাব॥

এইরূপ কথোপকথন হইতে না হইতেই শ্রীলক্ষ্মীবিজয়ের মহাবাদিত্র-নিচয় বাজিয়া উঠিল, সেই বিশালধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইল, গগন স্পর্শী ধ্বজপতকা সকল আকাশে স্বীয় সৌন্দর্য্য গৌরব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃই গগনপটে পত-পত করিয়া উড্ডীন হইল, দেখিয়া বোধ হইল নাগরাজ যেন দ্বি-সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া দশ দিক লেহন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। ধ্বজপতকার সম্মুখস্থ চঞ্চল চামরগুলি গগনরূপসরসী-সঞ্চারি হংসাবলীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। শত শত শ্বেত ছত্র বিজয়গৌরবের পরিচয় দিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। ধূপের ধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল, চারিদিকে গভীর নিস্বনে মেঘমন্দ্রণে মুরজাদি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। অবোধ ময়ূরগুলি ধূপের ধূম দেখিয়া মনে করিল আকাশে বুঝি মেঘ উঠিয়াছে, মুরজের বাদ্য মেঘমন্দ্রণ বলিয়া স্থির করিল, আর শুভ্র তোরণাবলী দেখিয়া উহাদের মনে হইল ঐ বুঝি বক শ্রেণী। ময়ূরগুলি সহসা মেঘসমাগম বোধে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঘন ঘন জয়ধ্বনির সহিত নানা রত্ন খচিত স্বর্ণ চতুর্দ্দোলায় অগণ্য দাসদাসী সমভিব্যহারে লক্ষ্মীদেবী অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দোলা সিংহদ্বারসম্মুখে উপস্থিত হইল। অতঃপরে প্রকৃতই এক

মহাবিজয় ব্যাপার দেখা গেল। লক্ষ্মীর দাসদাসীগণ শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান ভৃত্যদিগকে চোরের ন্যায় বাঁধিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর চরণতলে সমর্পণ করিতে লাগিলেন, আর নানা প্রকার অশ্রাব্য গালি দিতে লাগিলেন ; এমন কি অচেতন রথখানিও সেই অদ্ভুতঃক্রোধের বেগ হইতে নিস্তার পাইল না। লক্ষ্মীর দাসীগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রথখানিকেও যষ্টি দ্বারায় সন্তাড়ন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মান।

দাসীগণের এই প্রগল্‌ভ ব্যাপার দেখিয়া মহাপ্রভুর হাস্যের উদ্রেক হইল। প্রভুর হাসি দেখিয়া স্বরূপ বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

মানস্য ক্রম এষনৈব যদিয়ং স্বৈশ্বর্য্যবিখ্যাপকৈ,
নানাদিব্যপরিচ্ছদৈঃ স্বয়মহো দেবং প্রতিক্রামতি।
ব্যক্তং রৌদ্ররসোঽয়মম্বুধিভুবঃ ক্রোধস্য যৎস্থায়িনো
ভূয়ানেব বিকার এব বিদিতং বৈদগ্ধমস্যাং পরঃ।

অর্থাৎ ভগবন্‌ এটী তো মানের রীতি নয়। কেননা লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্য-বিখ্যাপক নানাবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া দেবপ্রতিক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তরিস্থিত ক্রোধ বিকারজনিত প্রচণ্ড রৌদ্ররসই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে এতো মান নয়। দেবীর কি চাতুরী! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার এই :—

দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন বসন॥

পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজগোপীগণের মান রসের নিধান॥
ইহোঁ সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া॥

স্বরূপ বলিলেন "ভগবন্, এমন অদ্ভুত মানের কথা তো আর কোথাও শুনা যায় নাই। মানিনী এরূপ সাজসজ্জা করিবেন কেন মান হইলে মানিনীরা ভূষণাদি ত্যাগ করেন, ভাল বস্ত্র ত্যাগ করিয়া মলিন বসন পরিধান করেন, মনের দুঃখে নখ দিয়া ভূমি অঙ্কিত করেন, এই তো মানের নিয়ম। কিন্তু ইনি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াও সৈন্য সজ্জিত করিয়া প্রিয়তমের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। এ আবার কেমন মান ?"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রসশাস্ত্রের মূর্ত্তিমান্ অবতার শ্রীদামোদর-স্বরূপ দ্বারা ভক্তগণের অবগতির জন্য মানতত্ত্ব প্রকটিত করেন। শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্বরূপ বলিলেন প্রভো এটী মানের রীতি নয়, ইহা দেবীর রস-চাতুরীবিশেষ। সত্যভামারও এইরূপ মানের কথা শুনা গিয়াছে কিন্তু ব্রজগোপীদিগের মানই প্রকৃত মান এবং সেই মানই রসের নিধান।"

সত্যভামার এই মানের প্রসঙ্গ হরিবংশে উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণীদেবীকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করেন, তখন সত্যভামার প্রণয়কোপ উপস্থিত হয়, সে কোপ প্রকৃত কোপ নহে, কিন্তু কোপের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তদ্‌যথা হরিবংশে ঃ—

রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব।
ভীতভীতোঽতি শনকৈ র্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা।
অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষা বশংগতা॥

সত্যভামাকে রুষিতার ন্যায় দেখিয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সত্যভামা রূপযৌবনসম্পন্না, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সৌভাগ্যগর্ব্বিতা। সখীমুখে তিনি যখন শুনিতে

পাইলেন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছেন অমনি তিনি অভিমানে ঈর্ষার বশীভূত হইলেন, তাঁহার প্রণয়-কোপ উপস্থিত হইল।

উক্ত শ্লোকটী শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ধৃত করা হইয়াছে। টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন "রুষিতামিব"—"বস্তুতঃ প্রণয়বতাত্বাদ্রোষা-ভাসবতীমিত্যর্থ"। অর্থাৎ সত্যভামা প্রণয়বতী। এ স্থলে তিনি রুষ্টার ন্যায় প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত পক্ষে রুষ্টা নহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার টীকায় লিখিলেন "চরণয়োঃ পতিষ্যামি" তাঁহার চরণে পতিত হইব এই-রূপ সঙ্কল্প করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কেননা, চরণে প্রণত হওয়া মান-প্রশমনের এক উপায়। রসশাস্ত্রে উহাকে নতি বলে। এই মানকে ঈর্ষা-মান বলা যায়। এই মান সহেতুক। ঈর্ষা সহযোগে যে মানের উৎপত্তি হয়, তাহাই সহেতু মান। ইহার লক্ষণ এই ঃ—

হেতুরীর্ষা বিপক্ষাদে বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সাকৃতে।
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽমীর্ষামানত্বমৃচ্ছতি ॥

সহেতুক মানের কারণ ঈর্ষা। ঈর্ষা হইলেই মান হয়। প্রিয় ব্যক্তির মুখে বিপক্ষদের গুণকীর্ত্তন হইলে প্রণয়মুখ্য ভাবটীই ঈর্ষামানে পরিণত হয়। সুতরাং যেখানে প্রণয় সেইখানেই মান। তদ্‌যথা ঃ—

অস্য প্রণয় এবাস্যাম্মানস্য পদমুত্তমম্।
সোঽয়ং সহেতু র্নিহেতু ভেদেন দ্বিবিধো মতঃ।

অর্থাৎ প্রণয়ই মানের উত্তম পদ। টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলেন "যত্র প্রণয়, স্তত্রৈবমানঃ। অর্থাৎ যেখানে প্রণয় সেইখানেই মান। সার-স্বত অলঙ্কারে মানের নিরুক্তি লিখিত আছে, তদ্‌যথা—

মান্যতে প্রেয়সা যেন যৎপ্রিয়ত্বেন মন্যতে।
মনুতেবা মীমিতেবা প্রেমমানঃ স কথ্যতে ॥
মহাভাষ্যকৃতঃ কোঽসোবনুমান ইতিস্মৃতে
লুড়্‌ন্তোঽপি ন পুংলিঙ্গো মানশব্দপ্রভুষ্যতি।

যে প্রিয়ত্ব দ্বারা অপর অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয়, যাহা প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, যাহা হইতে "প্রণয় আছে" বলিয়া জানা যায় অথবা যাহা দ্বারা প্রণয়ের পরিমাণ হয় তাহাই "প্রেমের মান।" ল্যুড়ন্ত অর্থাৎ অনট প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধারণতঃ নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও মান শব্দ পুংলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাতে কোন দোষ হয় না। এই নিরুক্তি দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধূম যেমন বহ্নির অনুমিতি-বিনিশ্চায়ক, মানও তেমনি প্রণয়ের নিত্য সহচর। ন্যায়সূত্রের এই সাহচর্য্যের নিয়ম ধরিয়াই শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন "যত্রযত্র মান স্তত্রতত্র প্রণয়ঃ। ফলতঃ প্রণয়ের অভাবে মান ঘটে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উজ্জ্বল নীলমণির টীকায় মান-রসটীর অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে কৃতাপরাধ নায়কের নায়িকার প্রতি ভয় হয়। এই ভয়ের কারণ স্নেহ। নায়িকা যখন নায়ককে কৃতাপরাধ বলিয়া মনে করেন, তখন নায়িকার হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয়। এই ঈর্ষার কারণ প্রণয়। ইহা হইতেই মান নামে একটী রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণকার মানকে কোপ নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা ঃ—

মানঃ কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়ের্ষাসমুদ্ভবঃ
দ্বয়োঃ প্রণয়মানঃ স্যাৎ প্রমোদে সুমহত্যপি
প্রেম্নঃ কুটিলগামিত্বাৎ কোপোহয়ং কারণং বিনা।

কিন্তু মান এক স্বতন্ত্র রস। কোপের সহিত মানের পার্থক্য আছে। প্রণয়ীর ঔদাস্য অবহেলায় অথবা অপরার প্রতি আসক্তিতে সম্ভোগাদিতে যে বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইতেই মান-রসের উৎপত্তি হয়। মানে যে কোপ দৃষ্ট হয় তাহা কোপ নহে,—কোপাভাস মাত্র। তাহা জ্বালাময় হইয়াও মধুর, প্রতপ্ত হইয়াও স্নিগ্ধ। উহা মাধুর্য্য ও উগ্রতার এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ। সুতরাং প্রণয়ের্ষা সমুদ্ভব মান নামে যে কোপের কথা বলা হইতেছে ইহা কোপাভাসই বুঝিতে হইবে। যেখানে প্রণয় সেখানে প্রকৃত কোপের উৎপত্তি আদৌ অসম্ভব। তবে মান নামে যে কোপাভাসের উদ্ভব হয়, উহা প্রণয়েরই ধর্ম্ম। এইজন্য অকারণেও অনেক

সময়ে কথায় কথায় মান-অভিমান আসিয়া পড়ে। প্রেম স্বভাবতঃই কুটিল যথা। সারস্বতালঙ্কারে ঃ—

অহেরিব গতিঃপ্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনো র্মান উদঞ্চতি॥

অর্থাৎ সর্পের ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল। এই সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ এই যে—

নদীনাঞ্চ বধূনাঞ্চ ভূজগানাঞ্চ সর্ব্বদা।
প্রেম্নামপি গতির্বক্রা কারণং তত্র নেষ্যতে॥

এই জন্য হেতু থাকুক, আর নাই থাকুক, প্রেমের গতি অনুসারেই মানোদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। সারস্বতালঙ্কার আরও বলেন প্রেম স্বভাবতঃই কুটিল, ইহার উপরে যদি আবার মানের সহিত সংমিশ্রিত হয়, তবে আরও কুটিল হইয়া উঠে।

স্বতোঽতি কুটিলং প্রেম কিমু মানান্বয়ে সতি।

প্রেমের কুটিল গতি হইতেই নির্হেতু মানের উদ্ভব হইয়া থাকে।

ফলতঃ প্রণয়ে মান এক মহা ব্যাপার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রশ্নে শ্রবণেচ্ছু ভক্তগণের সমক্ষে রসতত্ত্বের এই রসময় মান-বিচারে শ্রীস্বরূপ যে-সকল কথার অবতারণা করিয়াছিলেন আমাদের এই নীরস জগতে এখন ভক্ত-পরম্পরাতেও তাঁহার সকল কথা প্রচররূপ নাই। তবে কৃপাময় শ্রীগোস্বামিপাদগণ তদীয় প্রেরণায় ভক্তগণের জন্য ভক্তিশাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন আমরা যদি তাঁহার বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি, তাহা হইলেও মানবজন্মের সফলতা হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রজের মানরস।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু লক্ষ্মীবিজয়ের মানের কথায় শ্রীস্বরূপকে ব্রজের মানরসের নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতে আজ্ঞা করিলেন। তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে কহ ব্রজ মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার॥

তটিনী অদম্য বেগে প্রবাহিত হয়, এই প্রবাহের সম্মুখে যদি পর্ব্বত-পরিমিত বাধা উপস্থিত হয়, জলরাশি তখন স্ফীত হইয়া উঠিবে, সোজা পথে চলিতে না পারিয়া শত পথে কুটিল গতিতে চলিবে। প্রেমের গতি স্বভাবতই কুটিল, মানের বাধা পাইলে তাহার গতি আরও কুটিল হইয়া উঠে, সারস্বতালঙ্কারের এই উক্তি অতি যুক্তিময়ী। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন :—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে।

নায়কনায়িকার একত্রই অবস্থান হইতেছে, একের প্রতি অপরের বিশেষ অনুরক্তিও আছে, একে অপরকে দেখিতে এবং আলিঙ্গন করিতেও একান্ত ইচ্ছুক, অথচ যে ভাববিশেষ এই অভিষ্টসিদ্ধির বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহারই নাম মান। এই বিরোধ আপাততঃ দৃষ্টিতে নায়কনায়িকার ক্লেশকর বলিয়া অনুমতি হইলেও ইহার ফলে প্রেম বৃদ্ধি পায়, প্রেম নব-নবায়মান হইয়া উঠে। প্রেমের প্রবাহ সরস সবেগ ও অভিনব রাখার জন্যই মানের উদ্ভব। মান পুরাতনকে অভিনব করিয়া প্রকাশ করে, নিয়ত আস্বাদ্য পদার্থকে অভিনব মাধুর্য্যে সুমধুর ও প্রলোভনীয় করিয়া তুলে। প্রেমরাজ্যে মান এক সঞ্জীবনী সুধা,—এক অদ্ভুত

ইন্দ্রজাল। ইহার সঞ্চারে জীর্ণ হৃদয়বল্লরী মুকুলায়মান হইয়া উঠে, শীর্ণ মলিমস বদনমণ্ডল মুকুরায়মান হয়, প্রাচীন প্রেম পলকে পলকে অভিনব হইয়া থাকে। মকরন্দ-পরিমল-মুগ্ধ ভ্রমরের ন্যায় নায়ক মানিনীর মুখকমলের মধুপানের জন্য ব্যাকুল হয়েন, হৃদয়ের ঘোরতর তিমির দূরীকরণের জন্য শতবার নায়িকার "দন্তরুচি-কৌমুদীর" প্রার্থনায় আকুলিত হয়েন, অবশেষে "দেহিপদ পল্লবমুদারং" বলিয়া মানিনীর মান ভঙ্গ করিতে তাঁহার চরণতলে নিজমস্তক লুণ্ঠিত করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মানের এই মহিমা অতি অদ্ভুত,—এই মাধুর্য্য-বৃদ্ধিকারিণী শক্তি প্রকৃতই অতি গরিয়সী। এইজন্য শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি মানের আর একটী স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন :—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যমানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

অর্থাৎ যে স্নেহ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অভিনব মাধুর্য্য আনয়ন করে কিন্তু স্বয়ং কুটিলভাবে ধারণ করে তাহাই মান।

এই মান ব্রজদেবীগণেই সম্ভবে। এইজন্যই ইতঃপূর্ব্বে স্বরূপ বলিয়াছেন :—

"ব্রজগোপীগণের মান রসের নিদান।"

যে মান ক্রোধোন্মত্তা রণরঙ্গিণী চামুণ্ডার ন্যায় সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়-জনের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, ব্রজে সে মানের স্থান নাই; সে মান দ্বারকায় শোভা পাইতে পারে, সত্যভামা সেই মানের উদাহরণ স্বরূপিণী হইতে পারেন, শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্মীবিজয়ে সেই মানের প্রকৃষ্ট অভিনয় দেখা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত রসের নিদান যে মান,—শ্রীব্রজধামেই সে মানের স্থিতি ও স্ফূর্ত্তি। ব্রজের মানে পূর্ণমাত্রায় আবেগ উচ্ছাস আছে, তরঙ্গ আছে, কিন্তু সে তরঙ্গ প্রলয়াঙ্কর নহে, ব্রজের মান বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইলেও পলকেই আবার কুসুম অপেক্ষাও সুকোমল হইয়া পড়ে। সেইজন্য স্বরূপ বলিতেছেন :—

নায়িকার স্বভাবে প্রেম-বৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ॥

সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক দুই ভেদে করি দিগ দরশন॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়েও এই কথারই উল্লেখ আছে তদ্‌যথা :—

শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ, কীদৃশং প্রণয়কোপ বৈদগ্ধ্যম্ ?

স্বরূপ। যা যাদৃশী, তস্যাঃ খলু তথাবিধ বৈদগ্ধ্যম্।

শ্রীচৈতন্য। তথাপি শৃণুমঃ।

শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ প্রণয়কোপ চাতুরী কেমন ?

স্বরূপ। ভগবন্, যে রমণী যেমন, তাহার প্রণয়কোপও তেমন।

শ্রীচৈতন্য। তথাপি শুনিতে ইচ্ছা করি।

স্বরূপ তখন নায়িকার স্বভাবানুগত মানরসতত্ত্বের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

মানে কেহ হয় "ধীরা" কেহ তো "অধীরা"।
এই তিন ভেদ কেহ হয় "ধীরাধীরা"।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলিতেছেন :—

ত্রিধাসৌমানবৃত্তেঃস্যাদ্ধীরাধীরোভয়াত্মিকা।

অর্থাৎ মানপ্রাপ্তানায়িকা তিন প্রকার, ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা। ধীরার লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যথা :—

ধীরাতু ব্যক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং।

অর্থাৎ যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে তাহাকে ধীরা কহা যায়। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্তটী প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

স্বামিন্ যুক্তংমিদং তবাঞ্জনা-লবানক্তদ্রবৈঃ সর্ব্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃতনীল লোহিততনো যচ্চন্দ্রলেখাধৃতিঃ।
একং কিন্তব লোচয়াম্যনুচিতং হংহোপশুনাংপতে
দেহার্দ্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ।

ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এক রজনীতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বিহার-বিলাসে মগ্ন ছিলেন। প্রাতে শ্রীমতীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী দেখিতে পাইলেন শঠের অঙ্গে কজ্জল চিহ্ন, স্থানে স্থানে তাম্বুল রাগ

কোথাও বা সিন্দুর, কোথাও বা নখক্ষত সকল প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীরাধা শঠের ব্যবহার বিলক্ষণরূপেই বুঝিলেন, বুঝিয়া উপহাস পূর্ব্বক বক্রোক্তি করিয়া বলিলেন "ওহে এযে নীললোহিত রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতেছি। তা বেশ উৎকৃষ্ট সাজ হয়েছে। বল দেখি, পশুপতি, রুদ্রাণীকে সঙ্গে আন নাই কেন? তা হইলেই তো ঠিক হইত। এ ত্রুটী রাখিলে কেন?"

ধীরা শ্রীমতীর এই উক্তিটি অতি সুন্দর। চন্দ্রাবলীর সম্ভোগ-বিলসিত শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি খানিকে নীললোহিত রুদ্রমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করায় কাব্যসৌন্দর্য্য অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রাবলীর লোচন-যুগলের গলিত কজ্জলে শ্যামদেহ রঞ্জিত হইয়াছে, উহার পার্শ্বে পার্শ্বে চুম্বন হেতু তাম্বুলরাগ ও নখাঘাতের লোহিত রেখা-রঞ্জনে পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণের বেশ দেখিয়াই শ্রীরাধার মনে মানের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি এ স্থলে ধীরা। সুতরাং লক্ষ্মীর ন্যায় বা সত্যভামার ন্যায় অতি কোপিনী হইলেন না। মিষ্ট-মিষ্ট ভাষায় বক্রোক্তি প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন, "পশুপতে" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহা শ্রীমতীর প্রগল্ভ বাক্য। পশুপতি শব্দটী এখানে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পশুপতির এক অর্থে মহাদেব। অপর অর্থে রসনাভিজ্ঞ। রসনাভিজ্ঞ ব্যক্তিও পশুতুল্য। শ্রীমতী বলিলেন রুদ্রাণীকে সঙ্গে আন নাই কেন? তাহা হইলেই তো আমার সাক্ষাৎ অর্দ্ধ নারীশ্বর নীললোহিত মূর্ত্তি সন্দর্শনের ফল লাভ হইত?

কিন্তু শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুকে যে দুইটী উদাহরণ শুনাইয়াছিলেন, কবি-কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তাহা এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

কদাচিৎ কৃতাপরাধে প্রণয়িনি শ্রীব্রজরাজ কিশোরে সবিধমাগত্য সমুচিতং ব্যহরতি সতি :—

কিং পাদান্তমুপৈষি নাস্মি কুপিতা নৈরাপরাদ্ধোভবা
ন্নির্হতুর্নহিজায়তে কৃতধিয়াং কোপোঽপরাধোঽথবা
যোগ্যাএবহি ভোগ্যতাং দধতি তে তৎকিংময়াযোগ্যয়া
তেনাদ্যাবধি গোকুলেন্দ্রতনয় স্বাচ্ছন্দ্যমেবাস্তু তে॥

অর্থাৎ শ্রীব্রজরাজকিশোর কোন সময়ে শ্রীরাধার নিকট স্বীয় অপরাধ বিমোচনের প্রার্থনা করায় শ্রীমতী কহিলেন, শ্যাম, তুমি আমার পদতলে পড়িতেছ কেন? আমি তো ক্রোধ করি নাই! তোমারও কোন অপরাধ নাই। অকারণে কাহারও কোপ বা অপরাধের উদয় হয় না। তুমি আমার এখানে আসিলে কেন? আমি তো তোমার যোগ্যা নই! যে তোমার উপযুক্ত তাহার কাছে যাও। আজ হইতে আমার কাছে আসিবার তোমার প্রয়োজন নাই, যেখানে মনের মত লোক আছে সেখানে যাও।"

স্বরূপ বলিলেন "ভগবন্, আর এক প্রকার মানময়ী ধীরার লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে শ্রবণ করুন :—

দূরাদুত্থিতমন্তিকং ময়িগতে পীঠং করেণার্পিতং
স্মিত্বাভাষিণি ভাষিতং মৃদুসুধানিঃসন্দিমন্দংবচঃ
আরূঢ়োর্দ্ধ মথাসনং প্রকটিতো হর্ষস্তয়া শ্লিষ্যতি
প্রত্যাশ্লিষ্ট মবাময়েব মনসো বামাং তয়াবিস্কৃতং ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমি যখন মানময়ী শ্রীমতীর নিকটে যাই তিনি দূর হইতে আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান ও ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক আমার উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিয়া একটু সরিয়া যান, আমি কথা বলিলে মৃদু মধুরস্বরে মন্দ মন্দ রূপে কথা বলেন, আমি অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিলে তিনি একটু হাসিয়া অমনি একটু ফিরিয়া দাঁড়ান, আমি আলিঙ্গন করিতে গেলে তিনি তাহাতে বাম্যভাব প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই লক্ষণটীরই উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ যথা :—

ধীরাকান্তা দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান ॥
হৃদে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গেতে তারে করে আলিঙ্গন ॥
সকল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিবা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয়নিরসন ॥

ফলতঃ এই আলিঙ্গন কেবল ভদ্রতাসূচক বা ধীরতারই পরিচায়ক, এ

আলিঙ্গন আসক্তি বা হর্ষপূর্ব্বক আলিঙ্গন নহে। প্রকৃত মান আলিঙ্গনের বিরোধী। মহাপ্রভু শুনিয়া বলিলেন "স্বরূপ, এ লক্ষণটী পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ অপেক্ষা অধিকতর সরস।"

স্বরূপ বলিলেন, "প্রভো এখন অধীরার কথা শুনুন। অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে প্রিয়জনের প্রতি রোষ প্রকাশ করে। অধীরা প্রকৃতই অধীরা। অধীরা ক্রোধভরে প্রিয়জনের র্ভৎসনা করেন, নিজের ভূষণ দূরে নিক্ষেপ করেন, অধীরার মানতরঙ্গে প্রিয়জনের অপরাধের কথা স্পষ্টতঃই অভিব্যক্ত হয়।" আমরা শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ হইতে অধীরার উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন :—

"অধীরা পরুষৈ র্বাক্যৈ র্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা।"

অর্থাৎ অধীরা রাগ করিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে নিজ প্রিয়জনকে নিরস্ত করিয়া থাকেন, তদ্‌যথা :—

উত্তুঙ্গস্তনমণ্ডলী সহচরঃ কণ্ঠে স্ফুরন্নেষ তে
হারঃ কংসরিপো ক্ষপাবিলসিতং নিঃসংশয়ং শংসতি
ধূর্ত্তাভীরবধূপ্রতারিতমতে মিথ্যাকথাঝর্ঝরী-
ঝঙ্কারোন্মুখরা প্রযাহি তরসা যুক্তাত্র নাবস্থিতিঃ।

অর্থাৎ কংসারি, যাও যাও, আর মিথ্যা কথা বলো না। উত্তুঙ্গ স্তনমণ্ডলের সহচর তোমার ঐ গলার হারেই রজনী বিলাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মিথ্যার ক্ষুদ্র ঘণ্টা-রবে কি আর সত্যের বজ্রনাদ নিরস্ত হয়? ধূর্ত্ত ব্রজবধূরা তোমার বুদ্ধি পর্য্যন্ত ভ্রষ্ট করিয়াছে। যাও যাও এখানে তোমার কি প্রয়োজন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

অধীরা নিষ্ঠুরা বাক্যে করয়ে র্ভৎসন।
কর্ণোৎপল তাড়ে করে মালায় বন্ধন॥

অতঃপর শ্রীস্বরূপ ধীরাধীরার লক্ষণ বলিতেছেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ধীরাধীরা বক্র বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভুবা উদাস॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন :—

"ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং।

অর্থাৎ যে নায়িকা মানের রোষভরে অশ্রুবিমোচন করেন, ও বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন তিনি ধীরাধীরা। অশ্রুবিমোচন করা মুগ্ধার ধর্ম্ম। কিন্তু কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করাই অধীরার স্বভাব! প্রগল্‌ভা নায়িকায় পূর্ণ রোষের উদয় পরিলক্ষিত হয়। শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়ে লক্ষ্মীর রোষ ও দ্বারকায় সত্যভামার রোষ উহার দৃষ্টান্ত স্থল। সুতরাং উহাতে তাড়নাদি কার্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে পূর্ণ রোষের কিঞ্চিৎ অল্পতা ঘটে, সেখানে কঠোর বাক্যেই মানিনী নিজ প্রিয়জনের শাসন করেন। মুগ্ধাতে রোষ অতি অল্প। কাজেই রোদনই মুগ্ধার একমাত্র সম্বল। ধীরার রোষ ধৈর্য্য-আচ্ছাদিত। সুতরাং তাঁহার কোপ বক্রোক্তি ও উপহাসে পরিণত হয়। অধীরা ধৈর্য্যহীন, সুতরাং তাঁহার রোষময় বাক্য একবারেই আবরণহীন। ধীরা-ধীরার কার্য্য উভয়াত্মক। ধীরাতে বক্রোক্তি স্বাভাবিকী অথচ কঠোর বাক্যই অধীরার স্বভাব। কিন্তু ধৈর্য্যের আবরণে অধীরার কঠোর বাক্য নিরুদ্ধ হয়, এবং কঠোর বাক্যের পরিবর্ত্তে অশ্রুজলের সঞ্চার হয়। ধীরাধীরা নায়িকায় মুগ্ধার সমগ্র লক্ষণ প্রকাশ পায় না। মুগ্ধার উপহাস বা বক্রোক্তি নাই, মুগ্ধার আছে কেবল,—কোমলগণ্ডপরিপ্লাবিনী মণিমুক্তার মোহনমালাবিনিন্দী অশ্রুমালা।

এই ধীরা-ধীরার দুইটি উদাহরণ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্‌যথা ঃ—

গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি
সা তে বিধাস্যতি রুষং হৃদয়াধিদেবী
ত্বন্মৌলিমাল্যহৃত যাবক পঙ্কমস্যাঃ
পাদস্বয়ং পুনরনেন বিভূষয়াদ্যা।

মানময়ী শ্রীরাধা বলিলেন, "মহারাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আমার ন্যায় তোমার শতকোটি কামিনী বিরাজিতা। আমি যদি তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যাই, তাহাতে তোমার ত কোন ক্ষতি হইবে না। এখানে দাঁড়াইয়া আর আমায় এখন কাঁদাতে হবে না, এখন যাও যাও। তোমাকে না দেখিলেই তোমাকে শীঘ্র ভুলিতে পারিব। কাছে থাকিলে ভুলিতে পারিব না। আর এক কথা তোমার হিতের জন্যই বলিতেছি,—

তুমি এখানে আছ তোমার প্রেয়সী যদি ইহা কাণে শুনেন, তখন তুমি অত্যন্ত বিপদে পড়িবে। সুতরাং যাও যাও আর বিলম্ব করিও না, পাছে তোমার হৃদয়েশ্বরী তোমার প্রতি রুষ্টা হইবেন। তোমার মাথার চূড়ায় যাহার পায়ের অলক্তরাগ মুছাইয়া দিয়াছ যাও, তাহার চরণ-তলেই মাথা লুটাও গিয়ে। এখানে আর কেন?" (৫)

আরও একটী উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

তামেব প্রতিপাদ্য কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা
যস্যাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদ মধুনা দামোদরামোদসে
পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখং তাম্বুলশেষোজ্জ্বলাং
কণ্ঠস্থায়মুরোজ কুটমল সুহৃন্নির্ম্মাল্য মাল্যাঙ্কিতঃ॥

শ্রীমতী বলিতেছেন, দামোদর তোমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী পূজনীয়া দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে কেন? যাহার চরণের অলক্তরাগে তোমার মাথার চূড়া শোভিত হয়, যাহার মুখের উচ্ছিষ্ট তাম্বুলে তোমার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হয়, যাহার গলার প্রসাদী মালায় তোমার কণ্ঠের শোভা বর্দ্ধিত হয়, যাও সেখানে যাও, সেই কামবরদায়িনী হৃদয়ের অধীশ্বরীর শরণাপন্ন হও, সেখানে গিয়া তাহার সেবা কর, তাহার মহাপ্রসাদলাভে সুখী হও গিয়ে। সেইখানেই তোমার সকল অভিষ্টসিদ্ধ হইবে, এখানে কি প্রয়োজন?"

শ্রীস্বরূপকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বল দেখি স্বরূপ, মান চাতুরী কেমন" তদুত্তরে স্বরূপ বলেন "প্রভো, যে রমণী যেমন, তাহার মান-চাতুরীও তেমন" সুতরাং স্বরূপ নায়িকাভেদেই মানের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই যে ধীরা, অধীরা ও উভয়াত্মিকা এই ত্রিবিধ নায়িকার কথা এখানে উল্লেখ করা হইল, নায়িকার ধৈর্য্যগুণই এই

---

(৫) এখানে একটী গানের উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে
পরের পরাণ তুমি কেন এলে এখানে
সে যদি তা শুনে কাণে সে মরিবে সেখানে।

ভেদসূচক। সারস্বতালঙ্কার বলেন ঃ—

গুণতো নায়িকাপিস্যাদুত্তমা মধ্যমাধমা।
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভাচ বয়সাকৌশলেন চ।
ধীরাধীরৈব ধৈর্য্যেন স্বান্যদীয়া পরিগ্রহাৎ ॥

সুতরাং ধৈর্য্যভেদে নায়িকার মানের প্রকারভেদ কি প্রকার হয়, স্বরূপ প্রথমতঃ তাহাই প্রকাশ করেন। অতঃপর বয়স ও কৌশলভেদে মুগ্ধা মধ্যা ও প্রগল্‌ভার মানের চাতুরী ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীস্বরূপের মুখে ধীরা নায়িকার মানের যে ভঙ্গীটী শুনিয়া মহাপ্রভু আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ মানচাতুরীর একটী পদ পদকল্পতরুতে দৃষ্ট হইল, তদ্‌যথা ঃ—

দূরে সঞে নয়নে নয়নে না হেরবি
নিরবে রহবি শির নামই।
পরশিতে শিহরি করহি কর বারবি
যতনে রোখ নিরমাই ॥
সুন্দরি অতয়ে শিখাঅব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো বহু বল্লভ
কবহু" আপন বশ হোয় ॥
পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জিনি তুহু" হাস।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি
কহবি আনহি আন ভাষ ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি পঙ্কজে
পূজবি সো মুখচন্দ।
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তাহে কি এত পরবন্ধ ॥ ২১৭ ॥

শ্রীগোবিন্দদাসের মানশিক্ষার এই পদটী অতি মধুর। এই মান ধীরা নায়িকার পক্ষেই শোভা পায়। বহুবল্লভকে বশীভূত করিতে হইলে মানের প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ মানে প্রেমমাধুর্য্যের বৃদ্ধি ভিন্ন

বিন্দু মাত্রও রৌদ্ররসের ভাব নাই। এ মান অতি সুন্দর ও অতি সরস।

স্বরূপ বলিলেন, "প্রভো, বয়োভেদে তিন প্রকার নায়িকার ত্রিবিধ ভাবের কথাও শুনুন। মুগ্ধা মধ্যা ও প্রগল্‌ভা বয়োভেদে নায়িকার এই ত্রিবিধ অবস্থা রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মুগ্ধার মানচাতুর্য্য নাই, মান-পাণ্ডিত্য নাই। মুগ্ধা অতি সরলা। তিনি কেবল মানের সময়ে মনের দুঃখে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করেন, আবার বিনয় বাক্য শুনামাত্রই তাঁহার সকল দুঃখ-ক্লেশ ঘুচিয়া যায়। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি মুগ্ধার লক্ষণে বলেন :—

মুগ্ধা নববয়ঃ কামারতৌ বামা সখীবশা।
রতিচেষ্টাস্বতিব্রীড় চারুগূঢ় প্রযত্নভাক্॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়া প্রিয়োক্তৌ চাসক্তা মানেচ বিমুখীসদা॥

যে নায়িকা নবযুবতী, ঈষৎ কামবতী, রতি বিষয়ে বামা সখীজনের অধীনা, রতিচেষ্টায় অতি লজ্জাশীলা অথচ তাহাতে গুপ্ত ভাবে যত্নশীলা, অপরাধী প্রিয়তমের প্রতি সজলনয়নে দৃষ্টিসঞ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্তা এবং মান বিষয়ে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখী, তিনি মুগ্ধা নায়িকা। মুগ্ধার এই নয়টী লক্ষণের প্রত্যেকটীর দৃষ্টান্ত শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা, তিনি এ স্থলে কেবল মান-বিমুখতার দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিতেছি :—

মানবিমুখী দুই প্রকার—মৃদ্বী ও অক্ষমা। মৃদ্বী কোমলমনা এবং অক্ষমা একবারেই মানে অসমর্থা। সুতরাং অক্ষমা অতি মুগ্ধা। মৃদ্বীর একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা রসসুধাকরে :—

ব্যবৃত্তিক্রমনোদ্যমেন পদয়ো প্রত্যুদ্গতৌবর্ত্তনং।
ভ্রূভেদোঽপি তদীক্ষণ ব্যসনিনা ব্যাস্মারিমেচক্ষুষা॥
চাটূক্তানি করোতি দগ্ধরসনা রুক্ষাক্ষরেঽপ্যুদ্যতা।
সখ্যঃ কিং করবাণি মান-সময়ে সংঘাতভেদো মম॥

সখীরা ধন্যাকে উপদেশ করিলেন "সখি তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট মান প্রকাশ করিও।" ধন্যাও তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিবস সখীরা আসিয়

জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি তোমার মানের কুশল বল।" ধন্যা বলিলেন, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। মনে করিয়াছিলাম তাহাকে দেখিয়া দূরে যাইব, কিন্তু পাদুখানি তাহার দিকেই চলিতে লাগিল, মনে করিয়াছিলাম, একটী ভ্রূকুটী করিব কিন্তু চক্ষু সতৃষ্ণ ভাবে তাহার মুখপানেই আকৃষ্ট হইয়া রহিল, রুক্ষ কথা বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু জিহ্বা এমনই হতভাগ্য যে, সে কিসে সন্তুষ্ট হইবে জিহ্বা সেইরূপ মিষ্ট বাক্য খুঁজিতে লাগিল। দেখ ভাই আমার কোন দোষ নাই, আমার নয়ন চরণাদিই বিপরীতাচরণ করিয়াছে।"

অক্ষমার একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্‌যথা :—

আভীর পঙ্কজ দৃশাংবতো সাহসিক্যং
যাঃ কেশবে ক্ষণমপি প্রণয়ন্তি মানম্।
মানেতি বর্ণযুগলেহপি মম প্রযাতে
কর্ণাঙ্গনং বহতি বেপথু অন্তরাত্মা॥

সখি, পদ্মলোচনা আভীর ললনাগণের কি সাহস! ইহারা ক্ষণকালের নিমিত্তও কেশবের প্রতি মান প্রকাশ করিতে পারে! কি আশ্চর্য্য। কেশবের মুখখানি দর্শন করিলে আর কি মান থাকে? যাহাকে দেখা মাত্রই দেহ মন প্রাণ ও বাক্য আনন্দে অধীর হয়, তাহার নিকট কি মান করা সাজে? মান এই দুইটী অক্ষর শুনা মাত্রই আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন॥

মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ বর্ণনার পর এক্ষণে মধ্যমার লক্ষণ বলা যাইতেছে তদ্‌যথা শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে :—

সমান লজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী
কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ বচনা মোহান্তসুরতক্ষমা
মধ্যাস্যাৎ কোমলা ক্বাপিমানে কুত্রাপি কর্কশা॥

যে নায়িকার লজ্জা ও মদন দুই সমতুল্য, যিনি নবযুবতী, যাঁহার বাক্য ঈষৎ প্রগল্‌ভ, মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত যিনি সুরত বিষয়ে ক্ষমতাবতী, এবং যিনি মানে কখন বা মৃদ্বী, কখন বা কর্কশা, তিনিই মধ্যা নায়িকা। মধ্য নায়িকার যে পাঁচটী লক্ষণ উক্ত হইল শ্রীগ্রন্থে ইহার প্রত্যেকটীর উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। মানের অবস্থাই আমাদের আলোচ্য। মধ্যমার মানে কোমলতার উদাহরণ এই ঃ—

প্রাণাস্ত্বমেব কিমিব ত্বয়ি গোপনীয়ং
মানায় কেশিমথনে সখি নাস্মি শক্তা।
এহি প্রযাব রবিজাতট নিস্কুটায়
কল্যাণি ফুল্ল কুসুমাবচয়চ্ছলেন॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীললিতা বলিলেন "রাই, তুমি শঠের সহিত আলাপ করিও না, মান প্রকাশ করিও। শ্রীমতী বলিলেন, ললিতে, তুমি আমার প্রাণতুল্য, তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, আমার অবস্থা তোমার জানাই আছে। কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের নিকট মান প্রকাশ করিতে পারি না। আর এক বুদ্ধি আছে। চল আমরা এখন এখান হইতে কালিন্দী তটে ফুলবাগানে ফুল তুলিতে যাই।"

মানে কর্কশার একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

মুধা মানোন্নাহাদৃগ্লপয়সি কিমঙ্গানি কঠিনে
রুষং ধৎস্তে কিম্বা প্রিয়পরিজনাভ্যর্থনবিধৌ
প্রকামংতে কুঞ্জালয় গৃহপতি স্তাম্যতি পুরঃ
কৃপালক্ষ্মী বন্তং চটুলয় দৃগন্তং ক্ষণমিহ।

অর্থাৎ বিশাখা শ্রীমতীকে কহিলেন "কঠিনে, তুমি বৃথা মান করিয়া শরীর শুষ্ক করিতেছ কেন? কেনই বা প্রিয় পরিজনগণের অভ্যর্থনায় রোষ প্রকাশ করিতেছ? দেখ না, তোমার সম্মুখে নিকুঞ্জবিহারী হরি কতই কষ্ট পাইতেছেন, তোমার পায়ে ধরিয়া কতবার তোমায় সাধিতেছেন উহাঁর প্রতি ক্ষণকালের তরে তোমার কৃপা-সম্পত্তিপূর্ণ কটাক্ষপাত কর।"

অতঃপর প্রগল্‌ভার লক্ষণ বলা যাইতেছে ঃ—

প্রগলভা পূর্ণ তারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসকা

ভূরি ভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্ত বল্লভা
অতি প্রৌঢ়োক্তি চেষ্টাদৌ মানে চাত্যন্ত কর্কশা।

অর্থাৎ যে নায়িকা পূর্ণ যুবতী, মদান্ধা, বিপরীত সম্ভোগেচ্ছাশীলা, ভূরি ভূরি ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞা, রস দ্বারা বল্লভকে আক্রমণকারিণী, অতিশয় প্রৌঢ় চেষ্টাশীলা এবং মানে অতি কর্কশা তাহাকে প্রগল্‌ভা কহে। আমরা এখানে কেবল প্রগল্‌ভার মানরসের উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। তদ্‌যথা—

মেদিন্যাং তে লুঠতি দয়িতা মালতীম্লান পুষ্পা।
তিষ্ঠন্ দ্বারে রমণী বিমলাঃ খিদ্যতে পদ্মনাভঃ
ত্বঞ্চেন্নিদ্রা ক্ষপয়সি নিশাং রোদয়ন্তী বয়স্যা
মানে কস্তে নব মধুরিমা তত্ত্ব নালোচয়ামি।

অর্থাৎ বকুলমালা শ্যামলাকে কহিলেন "সুন্দরী তোমার এ দুর্জ্জয় মান কি প্রকারে ঘটিল, মালতী লতার অপরাধ কি? উহার মূলে জলসেচন বা উহার পুষ্পচয়ন না করিতেছ কেন? তোমার অনাদরে উহার পুষ্পগুলি পরিম্লান হইয়া পড়িতেছে, আর লতিকাটীও ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। আর ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম পদ্মনাভও তোমার দ্বারে বিমনা ভাবে দাঁড়াইয়া কত খেদ করিতেছেন। অপরন্তু তোমারও তো রাত্রিতে ঘুম নাই, হাহুতাশেই তোমার রাত্রি কাটিয়া যায়, তোমার সখীজনদেরও দুঃখের সীমা নাই, তাহারাও তোমার দুঃখে কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়। তুমি মানের এমন নতন মাধুরী কোথায় শিখিয়াছ জানি না।"

ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে এই প্রগল্‌ভার মান তিন প্রকার। ধীরা প্রগল্‌ভার মান দুই প্রকার, যথা সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীনা, অপর আকার-সঙ্গোপনশীলা বা আদরান্বিতা। অধীরা প্রগল্‌ভার লক্ষণ এই ঃ—

সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোধাদধীরা তাড়য়েৎপ্রিয়ং।

অর্থাৎ অধীরা ক্রোধবশতঃ অতি নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করিয়া থাকে। উত্তমা স্ত্রীগণ হস্ত দ্বারা প্রাণবল্লভের তাড়না করিতে কখনও সমর্থা হয়েন না। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভার রীতি ধীরাধীরা নায়িকার তুল্য সে লক্ষণ পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। প্রগল্‌ভার জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদও রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

মুগ্ধা মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকা সম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার আছে। কেহ কেহ বলেন এই ত্রিবিধ-ভেদ কেবল স্বকীয়াতেই দৃষ্ট হয়, পরকীয়ায় দৃষ্ট হয় না। পরকীয়া দুই প্রকার তদ্‌যথা ঃ—

পরকীয়া দ্বিধা প্রোক্তা পরোঢ়াকন্যকা তথা।
যাত্রাদি নিরতাহন্যোঢ়া কুলটা গলিত ত্রপা॥
কন্যা ত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা।

এই পরকীয়াতে উক্ত ত্রিবিধ ভাব সৎ কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন সৎকবি শ্রীজয়দেবের বর্ণনাতে কুমারী শ্রীমতী রাধিকাতেও এই ভাবের প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীন উক্তিতে এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে তদ্‌যথা ঃ—

উদাহৃতিভিদাং কেচিৎ সর্ব্বাসামেব তন্বতে।
তাস্তু প্রায়েণ দৃশ্যন্তে সর্ব্বত্র ব্যবহারতঃ।

অর্থাৎ কোন কোন কবি স্বকীয়া বা পরকীয়া সকল নায়িকারই প্রায় সর্ব্ব স্থানে এরূপ ব্যবহার দেখিয়া উল্লিখিত ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করেন।

নায়িকার প্রেম ও রূপগুণাদির তারতম্যে অধিকা সমা ও মৃদ্বী এই ত্রিবিধ এবং পুনশ্চ প্রখরা মধ্যা ও মৃদ্বী এই তিন প্রকার ভেদও পরিলক্ষিত হয়। তদ্‌যথা ঃ—

সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যাদধিকা সাম্যতঃ সমা
লঘুত্বাল্লঘুরিত্যুক্তা স্ত্রিধা গোকুল সুভ্রুবঃ
প্রত্যেকং প্রখরা মধ্যা মৃদ্বীচেতি পুনস্ত্রিধা।
প্রগল্‌ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুল্লর্ঙ্ঘ্যভাষিতা।
তদন্যত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যাতৎসাম্যমাগতা॥

যিনি সদম্ভ বাক্য প্রয়োগ করেন, যাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না তিনি প্রখরা, ইহার ন্যূন হইলে মৃদ্বী ও সমান হইলে সমা নামে কথিতা হয়েন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপের উক্তিতে লিখিতআছে ঃ—

মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ॥

কেহ মুখরা কেহ মৃদু কেহ হয় সমা।
স্ব স্বভাবে কৃষ্ণের বাঢ়য়ে রস সীমা॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥

যে রমণীর যেরূপ স্বভাব তাঁহার মানচাতুর্য্যও তদ্রূপ। ইঁহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ জন্মিয়া থাকে। স্বরূপের মুখে মানরস-তত্ত্ব শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং স্বরূপকে এই সকল কথা আরও বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

এই কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর কহে বার বার॥

শ্রীস্বরূপের মুখে মানিনী ব্রজবালাদের মানরসের কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। ফলতঃ প্রেমসিন্ধুতে মানের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গি প্রকৃতই এক অনির্ব্বচনীয় রসের লীলাবিলাস। বিশেষতঃ ব্রজবালাদের মানের তরঙ্গ অসীম ও অনন্ত। তাই প্রভু ও স্বরূপের এই সম্বন্ধে কথোপকথনের মর্ম্ম শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিপিবদ্ধ করার সময়ে লিখিয়াছেন ঃ—

প্রভু কহে কহ ব্রজ-মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার॥

শতমুখী গঙ্গা স্রোতের ন্যায় গোপীমানের শত সহস্র ধারা প্রকৃতই বিমল আনন্দ প্রবাহ। এই সম্বন্ধে যতই আন্দোলন আলোচনা করা যায়, ততই উহার অনন্ত পরিসরের বিশালভাবে হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠে।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে মানের অপর বিবিধ ভেদ বিচারেরও উল্লেখ আছে, তদ্‌যথা ঃ—

উদাত্তো ললিতশ্চেতি মানোঽয়ং দ্বিবিধোমতঃ।

অর্থাৎ উদাত্ত ও ললিতভেদে মান দ্বিবিধ। এই মান স্থায়িভাবের অন্তর্গত। ইহা প্রেমের উচ্চতম অবস্থায় প্রকটিত হইয়া থাকে। রসশাস্ত্র নির্ণীত স্নেহই এই মানের প্রাণ।

সুতরাং সংক্ষেপতঃ প্রেমরাজ্যে "স্নেহ" কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

স্নেহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে যাহাতে কিছু কোমলীভূত হয় তাহাই স্নেহ। এস্থলে প্রেম জগতের উচ্চতম ভাব বিশেষের প্রকটন করার জন্যই স্নেহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শাস্ত্রকার বলেন ঃ—

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনম্।
হৃদয়ং দ্রাবয়েন্নেষা স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥

যে প্রেম পরম উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চিদ্দীপের দীপন হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহার নাম স্নেহ। চিৎশব্দের অর্থ এখানে প্রেমোপলব্ধি। শ্রীজীব গোস্বামী এই কথাই লিখিয়াছেন যথা ঃ—

চিদপ্যত্র প্রেমবিষয়োপলব্ধিঃ।

সুতরাং যাহা প্রেমোলব্ধি রূপ দীপের দীপন অর্থাৎ প্রেমদীপ প্রজ্জ্বলনের সহায় তাহাই স্নেহ। এই স্নেহে প্রেমদীপ উজ্জ্বল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ইহাতে হৃদয় নিরন্তর দ্রবীভূত থাকে। রসশাস্ত্রবিদ্গণ দ্বিবিধ স্নেহের উল্লেখ করিয়াছেন—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। তদ্‌যথা ঃ—

স ঘৃতং মধু চেত্যুক্তঃ স্নেহ দ্বেধা স্বরূপভঃ।

যে স্নেহ অতিশয় আদরময় তাহার নাম ঘৃত স্নেহ। ঘৃত স্নেহের সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে ভাবান্তরের সহিত মিলিত হইলেই এই ঘৃতস্নেহ অধিকতর স্বাদু হয়। ইহা একক স্বাদু হইতে পারে না। ঘৃত যেমন শর্করা সংযোগে সুস্বাদ হয় কিন্তু স্বয়ং সুস্বাদ হয় না, ঘৃতস্নেহও তেমনি নায়কের গাঢ় আদরেই স্বাদুতা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য শাস্ত্রকার বলেন ঃ—

ভাবান্তরান্বিতো গচ্ছন্ স্বাদোদ্রেকং নতুস্বয়ং
ঘনীভবেন্নিসর্গাতিশীতলান্মিথ আদরাৎ
গাঢ়াদরময় স্তেন স্নেহস্যাদ্‌ঘৃতবদ্‌ঘৃতং।

নায়িকার প্রতি নায়কের আদর স্বভাবতঃই অতি শীতল। ইহার উপরে পরস্পরের আদরে এই স্নেহ আরও ঘনীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং যে স্নেহ গাঢ়াদরময় ও ঘৃত স্বরূপ, তাহা ঘৃতস্নেহ বলিয়া অভিহিত হইয়া

থাকে। * এখন মধুস্নেহের কথা বলা যাইতেছে ঃ—

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু*।

"সে আমারই" ইত্যাদিরূপে যে স্নেহ, তাহাই মধুস্নেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রতির উদ্ভবে দুইটী ভাবের উদয় হয়। একটী ভাব এই যে "আমি তাহারই"। আর একটী ভাব এই যে "সে আমারই"। ইহার প্রথম ভাবটী গাঢ় আদরময় বলিয়া ঘৃতস্নেহ, আর দ্বিতীয়টী মাধুর্য্যাধিক্য বশতঃ মধুস্নেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "আমি তার" আর "সে আমার" এই দুইটী ভাবেই ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ প্রতিষ্ঠিত।

নাথ, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

এই সুবিখ্যাত পদ ঘৃতস্নেহ ভাবের উদাহরণ। আর মধুস্নেহের ভাবের একটী শ্লোক আমার প্রেমময় শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখস্ফুরিত শ্রীমতীর উক্তিসূচক পদ্যে শ্রবণ করুন।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার এই ঃ—

আমি কৃষ্ণ পদদাসী তেঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কিবা দেয় দরশন না জানে আমার তনুমন
তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ।
সখি হে শুন মোর বচন নিচয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর,—অন্য কভু নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনু মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।

তা সবারে দেন পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণ দেখাইয়া॥
কিবা তেঁহ লম্পট শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ॥

ইহাই মধু-স্নেহের ভাবময় পদ। মধু স্নেহের মাধুর্য্য স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকে এবং ইহাতে নানা রসের সমাবেশ থাকে। মধু স্নেহের মাদকতা শক্তি আছে। এই মত্ততায় জগৎবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

রাধা স্নেহময়েন হন্তরচিতা মাধুর্য্যসারেন সা।
সৌধীব প্রতিমা ঘনাপ্যুরুগুণৈ ভাবোষ্মণা বিদ্রুতা॥
যন্নামন্যপি ধামনি শ্রবণয়ো র্যাতি প্রসঙ্গেন মে।
সান্দ্রানানন্দময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যোজগদ্বিস্মৃতি॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন :—"সখে, শ্রীরাধা স্নেহরূপ মাধুর্য্যসার রচিত সুধাপ্রতিমা। তিনি প্রেমমাধুর্য্যের ঘনীভূত প্রতিমা হইলেও ভাবরূপ উষ্মা দ্বারা বিগলিত হইয়া পড়েন। প্রসঙ্গক্রমেও তাঁহার নাম আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, আমার চিত্ত আনন্দে অধীর হইয়া উঠে এবং সমস্ত জগৎ সেই ভাবনার সময় আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।" সুতরাং স্নেহ যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত মানের আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উদাত্ত ও ললিত,—মানের এই দুই প্রকার বিভেদ আছে। ঘৃত স্নেহই উদাত্ত মানে পরিণত হয়। ঘৃতস্নেহ কি প্রকারে উদাত্ত মানে পরিণত হয় তৎসম্বন্ধে রসশাস্ত্রে লিখিত আছে :—

উদাত্তঃ স্যাদ্‌ঘৃত স্নেহো ধারয়ন্ গহনক্রমং
দাক্ষিণ্যভাগদাক্ষিণ্যং বাম্যগন্ধঞ্চ কুত্রচিৎ।

অর্থাৎ ঘৃত স্নেহবতী দুর্ব্বোধ্য রীতির অনুসরণপূর্ব্বক কোথাওবা বাহ্যে সরলতার ভাব প্রদর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে কুটিলাচরণ করেন, আবার

কোথাওবা বাহ্যে কিঞ্চিৎ কোপ প্রকাশ করিয়া অন্তরে প্রকৃতই অসরলা হইয়া রহেন। উদাত্ত মানের উক্ত দুইটী প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয় যথা—দাক্ষিণ্য-উদাত্তমান ও বাম্যগন্ধ উদাত্তমান।

ললিত মানের লক্ষণ এই যে, মধু স্নেহ যদি স্বাতন্ত্র্যরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় এবং উহা যদি কৌটিল্য ও নর্ম্মতা ধারণ করে তবে উহাকে ললিতমান বলা যায়। ললিতমানের দাক্ষিণ্যাংশ কুটিল হইয়াও মধুর হয়। উহাতে ঘৃত স্নেহের ভাব প্রকাশ পায় না। ললিতমানের মধ্যে নর্ম্ম ললিতমান অতীব সরস। একটী উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

মিথ্যাজল্পতু তে কথংন্নুরসনা সাধ্বী সহস্রস্য সা
বিম্বোষ্ঠামৃত সেবনাদঘরিপো পুণ্যা প্রযত্নাদভূৎ
কস্মাদেষবলাৎ করোতু চ করঃ সোঢংক্ষমঃ সুভ্রুবাং
রক্তুসুষ্ঠ ন নীবিবন্ধমপি যঃ কাবান্য বন্ধে কথা।

এই শ্লোকটী দানকেলী কৌমুদী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন এই সকল গোপীরা রাজশুল্ক লইয়া দারুণ গোলযোগ উপস্থিত করিতেছেন। আমি এখন কি করিব ? জন্মাবধি কখনও আমার জিহ্বা মিথ্যা কথা বলিতে জানে না, হস্ত হঠকার্য্যে অক্ষম। সুতরাং আমার সত্যবাদিত্ব ও দয়ালুত্ব উভয়ই অনর্থক হইয়া উঠিল।" এই কথা শুনিয়া ললিতা উক্ত শ্লোক বলেন। উহার অর্থ এই যে "তা বটেই তো! তোমার রসনা মিথ্যা কথা বলিতে পারে কি ? যে কত যত্ন করিয়া সহস্র সহস্র কুলবধুর অধরামৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়াছে, সে কি আর মিথ্যা বলিতে পারে ? আর তোমার হস্তই বা কি প্রকারে বল প্রকাশ করিবে ? তোমার হস্ত যে অতি দয়ালু! সুন্দরীবৃন্দের নীবিবন্ধ দেখিলেই যে হাত অধীর হইয়া সেই নীবিবন্ধ খুলিয়া দেয়, তেমন দয়ালু হাত কি নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারে ?" এই উদাহরণে বিপরীত লক্ষণায় শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাবাদিত্ব ও নির্দ্দয়ত্ব নর্ম্ম ললিত মানে প্রকটিত হইয়াছে।

মান বিশ্বাসে পরিণত হইলে উহাতে তখন আর গৌরব থাকে না। তখন উহা প্রণয় নামে অভিহিত হয়। অর্থৎ সম্ভ্রম রহিত মান প্রণয়েরই

অপর পর্য্যায়। তদ্‌যথা ঃ—

"মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

এ স্থলে বিস্রম্ভ শব্দের অর্থ বিশ্বাস, বা সম্ভ্রমরাহিত্ব। বিস্রম্ভ শব্দের অর্থে টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন "প্রিয়জনেন সহ স্বস্যাভেদ-মননং" অর্থাৎ প্রিয়জনের সহিত নিজের যে অভেদ মনন তাহাকেই বিস্রম্ভ বলে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় ইহার পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন "স্বীয় মন প্রাণ বুদ্ধি দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ মন বুদ্ধি ও দেহের সহিত ঐক্য ভাবনই বিস্রম্ভ। "রস-প্রাধান্য জন্য মানের কোপ এই স্থলে একবারেই উপপন্ন হয় না। সুতরাং মানে বিস্রম্ভ ভাব উপস্থিত হইলেই প্রণয়ের উৎপত্তি হয়। আবার কোন কোন স্থলে ইহার বিপরীত ভাবও দৃষ্ট হয। স্নেহজ প্রণয় কখন কখন মানে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন ঃ—

জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রাচিন্মানতাং ব্রজেৎ।
স্নেহান্মানঃ কচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে॥

অর্থাৎ স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে উহা মানে পরিণত হয়। আবার কোন স্থানে স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া উহা প্রণয় রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ঃ—

কার্য্যকারণতান্যোন্য মতঃ প্রণয়মানয়োঃ।

অর্থাৎ প্রণয় ও মান এই উভয়ের পরস্পর কার্য্যকারণতা আছে। ফলতঃ প্রেমের গতি স্বভাবতঃই অতি কুটিল। সুতরাং মান হইতেই প্রণয়, আবার প্রণয় হইতেই মান। এই উভয়ের পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ।

সহেতুক ও নির্হেতুক এই দুই প্রকার মানের ভেদ ব্রজগোপীদের প্রেমে পরিদৃষ্ট হয়। ঈর্ষাই সহেতুক মানের প্রতি কারণ, তদ্‌যথা ঃ—

হেতুরীর্ষা বিপক্ষাদের্বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সাকৃতে।
ভাবঃ প্রণয় মুখ্যোয়মীর্ষা মানত্বমৃচ্ছতি॥

প্রিয় ব্যক্তির মুখে প্রতিপক্ষের গুনানুবাদ পবিকীর্ত্তিত হইলে প্রণয

ঈর্ষাজনিত মানে পরিণত হইয়া থাকে। বাগ্‌ভট অলঙ্কারে লিখিত আছে ঃ—

মানোঽন্য বনিতা সঙ্গাদীর্ষাবিকৃতিরুচ্যতে।

এ লক্ষণ অপেক্ষা প্রাগুক্ত লক্ষণই অধিকতর প্রশস্ত। অন্যবণিতাসঙ্গ, তৎগুণোৎকীর্ত্তন, অথবা অপর বনিতাবিলাস চিহ্ন দর্শন প্রভৃতি কারণে মানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রাচীন রসশাস্ত্রে আরও একটী প্রমাণ আছে, তদ্‌যথা ঃ—

স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্ষাচ প্রণয়ং বিনা।
তস্মান্মান প্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ॥

স্নেহ ব্যতিরেকে ভয় হয় না, প্রণয় ব্যতিরেকে ঈর্ষা হয় না। সুতরাং মান উভয়েরই প্রেম-প্রকাশক। নায়িকার প্রতি নায়কের আর্দ্রীভাবের নাম স্নেহ। অপরাধী নায়ক নায়িকাকে স্বভাবতঃই ভয় করেন। প্রণয়িণী নায়িকা প্রণয়ী নায়কের অন্য রমণী সঙ্গ সহিতে পারেন না। ইহাই ঈর্ষার কারণ। এই ঈর্ষা হইতেই মানের উৎপত্তি। সুতরাং স্নেহ-প্রণয়-নিবন্ধন মান উভয়েরই প্রেম প্রকাশক।

সহেতুক মানের প্রসঙ্গে মানোৎপত্তির ত্রিবিধ কারণ রসশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণবল্লভ অপরার প্রেমে আসক্ত হইয়াছেন এই কথা শ্রবণে অথবা এইরূপ অনুমানে কিম্বা সাক্ষাৎ দর্শনে নায়িকার মানোদ্রেক হয়। ইহাই সহেতু মানের কারণ। তদ্‌যথা ঃ—

শ্রুতং চানুমিতং দৃষ্টংতদ্বৈশিষ্ট্যাং ত্রিধামতং

ইহাদের মধ্যে শ্রুত অর্থাৎ সখী বা শুকমুখে শ্রবণ। অনুমান তিন প্রকার, —ভোগাঙ্ক দর্শন, গোত্র স্খলন (এক ব্যক্তিকে অপর নামে আহ্বান করা) এবং স্বপ্নদর্শন। এ স্থলে গোত্র স্খলনের লক্ষণ লিখিত হইতেছে ঃ—

বিপক্ষ সংজ্ঞায়াহ্বানমীর্ষাতিশয় কারণং।
আসাং তু গোত্রস্খলনং দুঃখদং মরণাদপি॥

অর্থাৎ নায়িকার সমক্ষে বিপক্ষের নাম ধরিয়া যে আহ্বান, তাহাই গোত্র-স্খলন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গোত্রস্খলন নায়িকার পক্ষে অতিশয় ঈর্ষার কারণ এবং মরণ অপেক্ষাও দুঃখপ্রদ। স্বপ্নের একটী

দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শয়ন করিয়া স্বপ্নে বলিতেছেন ঃ—

শপেতুভ্যং রাধে ত্বমসি হৃদয়ে ত্বং মমবহি
স্ত্বমগ্রে ত্বং পৃষ্ঠে ত্বমিহভবনে ত্বং গিরিবনে
ইতি স্বপ্নে জল্পং নিশি নিশময়ন্তী মধুরিপো
রভূত্তল্পে চন্দ্রাবলী রথাপরাবর্ত্তিতমুখী।

অর্থাৎ— "রাধে শপথ করিয়া কই।
তুমি গো অন্তরে তুমি গো বাহিরে
জানি না তোমারে বই॥
তুমি গো ভবনে তুমি গিরিবনে
সমুখে পশ্চাতে তুমি।
যে দিকেতে যাই যে দিকেতে চাই
সুধু, তোমাকে নেহারি আমি॥"
স্বপনের ঘোরে চন্দ্রাবলী ঘরে
এতেক বলিয়া হরি।
শুনিয়া এ বাণী হইলা মানিনী
চন্দ্রাবলী সহচরী॥

সাক্ষাৎ দর্শনে কি প্রকারে মান হয়, তদ্বিষয়েও একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটী মালা গাঁথিয়া মালাটী তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন মালাটী ললিতার গলায় শোভা পাইতেছে। ইহা দেখিয়া চন্দ্রাবলীর মানের উদয় হইল। রোষ ও দুঃখভরে চন্দ্রাবলী বলিলেন ঃ—

সহচরি পরিগুম্ফ্য প্রাতরেবার্পিতাসীদ্
ব্রজপতি সুতকণ্ঠে যা ময়োৎকণ্ঠয়াদ্য
অপি হৃদি ললিতায়া স্ত সুস্বী হন্ত হৃন্মে
দহতি দহনদীপ্তিঃ পশ্যগুঞ্জাবলী সা।

দেখ সহচরি শঠের আচার
আর বা কাহারে বলি।

কত সযতনে গাঁথিনু ও মালা
কানন-কুসুম তুলি ॥
আদরে সোহাগে কতনা যতনে
দিয়েছিনু গলে তার।
ওই দেখ হায় ললিতার গলে
শোভিছে সে ফুলহার ॥
শঠের আচার শঠের ব্যাভার
সোঙরি জ্বলিয়া মনু।
কেন তার গলে যতন করিয়া
ও মালা গাঁথিয়া দিনু ॥

অতঃপর নির্হেতু মানের কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রেমের গতি অতি কুটিল। সুতরাং প্রণয়িনীদের মধ্যে কথায় কথায় মানোৎপত্তি হইয়া থাকে। সকারণেও মান ঘটে, আবার অকারণেও ঘটে।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে নির্হেতু মানের লক্ষণে লিখিত আছে ঃ—

অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা।
প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেনির্হেতুমানতাং ॥

অর্থাৎ কারণের অভাব অথবা কারণের আভাস হইতেই নির্হেতু মানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা এই যে—

আদ্যং মানং পরিণামং প্রণয়স্যজগুবুর্ধাঃ
দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভর বৈভবং।
বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্য এষ এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

অর্থাৎ প্রণয়ের পরিণামই আদ্যমান বা সহেতুক মান বলিয়া অভিহিত হয়। আর যাহা প্রণয়ের বিলাসজনিত বৈভব তাহাই নির্হেতু মান। প্রণয় হইতে কি প্রকারে মানোপত্তি হয় পূর্ব্বে তাহা সবিস্তারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। নির্হেতু মানে ঈর্ষার কোনও কারণ থাকে না অথচ অকারণে মানের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই মান প্রেমের বিলাস-বৈভব-তরঙ্গ ভঙ্গী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখন মান-প্রশমনের উপায় বলা যাইতেছে। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন ঃ—

নির্হেতুকঃ স্বয়ং শাম্যেৎ স্বয়ংগ্রাহস্মিতাদিভিঃ।

অর্থাৎ নির্হেতুমান স্বয়ং শাম্য হইয়া থাকে। ইহাতে কোন প্রকার প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। নায়ক নায়িকার স্বীয় স্বীয় হাস্যাদির দ্বারাই নির্হেতুমান প্রশমিত হইয়া থাকে। সহেতুমান ভঙ্গের প্রক্রিয়া সবিশেষ রূপে বর্ণনা করা যাইতেছে ঃ—

হেতুর্যস্ত সমং যাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ
সামভেদ ক্রিয়াদান নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ
মানোপশমনস্যাঙ্কা বাষ্প মোক্ষস্মিতাদিভিঃ।

অর্থাৎ সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি এবং উপেক্ষা প্রভৃতি রসান্তর যথা-যোগ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে হেতুজনিত মান উপশমিত হয়। অশ্রুপাত ও হাস্যাদিই মানভঞ্জনের লক্ষণ।

প্রিয়বাক্য বলার নাম সাম। ভেদ দুই প্রকার, বাক্যভঙ্গি দ্বারা স্বমাহাত্ম্য-প্রকাশ এবং সখীগণ কর্ত্তৃক উপলম্ভ বাক্য প্রয়োগ। ছল-পূর্ব্বক ভূষণাদি দান করার নামই দান। কেবল দৈন্যাবলম্বন পূর্ব্বক চরণতলে পতনের নামই নতি। শ্রীজয়দেবের "মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্" পদটী সাম ও নতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সামাদি ভাব সকল বিফল হইলে যে অবজ্ঞা জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা বলা যায়। নীরব থাকাকেও কেহ কেহ উপেক্ষা বলিয়া অভিহিত করেন। উপেক্ষার আরও একটী সংজ্ঞা আছে তদ্‌যথা ঃ—

প্রসাধন-বিধিং মুক্ত্বা বাক্যৈরন্যার্থসূচকৈঃ
প্রসাদনং মৃগাক্ষীণামুপেক্ষেতি স্মৃতা বুধৈঃ।

অর্থাৎ উপাসনাবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যার্থসূচক বাক্য দ্বারা রমণীদিগের প্রসন্নতাকরণকেও কেহ কেহ উপেক্ষা বলেন।

আকস্মিক ভয়াদির প্রস্তাবকেই রসান্তর বলে। এই রসান্তর দুই প্রকার,—বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং যাদৃচ্ছিক। কোন বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা অপর রসের কোন প্রস্তাব করাই যাদৃচ্ছিক, আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

বলে বুদ্ধি সহকারে যে রসান্তরের অবতারণা করা হয় তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক। তদ্‌যথা ঃ—

উপস্থিতমকস্মাদ্‌ যত্তদ্‌যাদৃচ্ছিকমুচ্যতে।
বুদ্ধিপূর্ব্বস্তু কান্তেন প্রত্যুৎপন্ন ধিয়াকৃতম্‌॥

এতদ্ব্যতীত দেশবল, কালবল, মুরলীশব্দবল দ্বারাও মানোপশমন হয়। হেতুর তারতম্যানুসারে নির্হেতুমান লঘু মধ্য ও জ্যেষ্ঠভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। যে মান অল্পায়াসে সুসাধ্য হয়, তাহার নাম লঘুমান, আর যাহা যত্নে সাধ্য হয়, তাহার নাম মধ্যমান, মঙ্গলজনক উপায় দ্বারাও যাহা দুঃসাধ্য তাহার নাম মহিষ্ঠ বা দুর্জ্জয়মান। মানের সময়ে ব্রজ-গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে নিম্নলিখিত বিশেষণে অভিহিত করিয়া থাকেন ঃ—

বাম, দুর্ল্লীলশেখর (কপটশিরোমণি), কিতবেন্দ্র, মহাধূর্ত্ত, কঠোর, নির্লজ্জ, অতি দুর্ললিত, গোপীকামুক, স্ত্রীচৌর, গোপিকাধর্ম্মধ্বংসী, গোপী-সাধ্বী বিড়ম্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ় তিমির, বস্ত্রচৌর এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্ব-তের তীরবর্ত্তী বনপথের তস্কর।" শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ইহার নিম্ন-লিখিত প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় ঃ—

কৃষ্ণে রোষোস্তয়াস্তাসাং বামোদুর্ল্লীলশেখরঃ
কিতবেন্দ্রো মহাধূর্ত্তঃ কঠরো নিরপত্রপঃ।
অতিদুর্ল্লিতো গোপীভুজঙ্গো রতহিংণ্ডকঃ
গোপিকা ধর্ম্মবিধ্বংসী গোপসাধ্বীবিড়ম্বকঃ॥
কামুকেশ স্তমিশ্রৌষঃ শ্যামাত্মাম্বর তস্করঃ।
গোবর্দ্ধন তটারণ্যবাটপাটচ্চরাদয়ঃ॥

ঐরূপ মানের অভ্যর্থনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রকৃতই অতি মধুর। প্রেমময় প্রেমমাধুর্য্যের সরস উক্তিতে যেমন সন্তুষ্ট, আর কিছুতেই তিনি তেমন পরিতুষ্ট নহেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমবশে আমি না হই অধীন॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম, হীন
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করেন লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।"
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

অতঃপর স্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট বামা ও দক্ষিণা নায়িকার কথা বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

বামা এক গোপীগণ, দক্ষিণা একগণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥

বামা ও দক্ষিণা কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে, যথা ঃ—

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যেচ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্যতে॥

যে নায়িকার কথায় কথায় মান, এবং মানের পরেই অমনি ক্রোধ, সহসা যাহার মান ভাঙ্গা কঠিন, এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়ঃই কঠোরার ন্যায় প্রতীয়মানা হয়েন, তাঁহাকেই রসশাস্ত্রে বামা বলে। শ্রীরাধাদিই দৃষ্টান্ত স্থল। দক্ষিণার লক্ষণ এই যে—

অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভি স্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥

যে নায়িকা মান রক্ষায় অসমর্থ, যিনি মানের কারণ প্রকাশ করিয়া বলেন এবং নায়কের যুক্তি বচনে যাহার মানভঞ্জন হয়, তিনি দক্ষিণা

নায়িকা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

শ্রীস্বরূপের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গোপী-প্রেম-সুধালাপ প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে প্রকৃত মধুবর্ষী। রসগ্রাহী ভক্তগণ এই মাধুর্য্যে নিরন্তর নিমগ্ন রহেন, আমাদের ক্ষীণ ও নীরস ভাষায় সেই রসালাপ ব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা জানিয়াও চিত্তের আবেগে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছি। আকাশ অনন্ত; ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্রপাখী আপন সাধে যথাসাধ্য উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। সেইরূপ এই রসালাপও অনন্ত, আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটের ন্যায় এই অনন্ত লীলাকাশে মুহূর্ত্তকাল যে বিচরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি তাহা কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। প্রেমসাগরে মানের ভাবতরঙ্গ প্রকৃতই অতি অপূর্ব্ব বস্তু। আমরা এই জন্যই মান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্বকীয়া ও পরকীয়া।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীদামোদর স্বরূপের মুখে বিশুদ্ধ প্রেমরসময়ী ব্রজবধূদিগের মানতরঙ্গের লহরী-বৈচিত্র্যের বিবিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ব্রজগোপীদের প্রেমের কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

এই কথা শুনি প্রভু আনন্দ অপার।
"কহ কহ দামোদর" কহে বার বার॥
দামোদর কহে "কৃষ্ণ রসিকশেখর
রস আস্বাদক রসময় কলেবর॥
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ, ভক্তপ্রেমাধান।
শুদ্ধ প্রেমরসে গুণে গোপিকা প্রবীণ॥

গোপিকার গুণে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥"

শ্রুতি বলেন "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। "আনন্দং ব্রহ্ম" ইহাও শ্রুতির উক্তি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। তিনি রস আস্বাদক। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেন "কৃষ্ণ এব পরোদেব স্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঃ—

গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্
দৃগভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রীয়ঃ ঐশ্বরস্য।

অর্থাৎ মথুরাবাসিনীরা বলিলেন, অহো গোপবধূরা কি অনির্ব্বনীয় তপস্যাই করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা লোচনযুগল দ্বারা শ্রী, যশ ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আস্পদ, দুষ্প্রাপ্য, অনন্যসিদ্ধ, সমানাধিকবিবর্জ্জিত, লাবণ্যসারস্বরূপ শ্রীহরির রসসুধাপান করিয়া থাকেন।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর প্রথম শ্লোকেই এই শ্রীকৃষ্ণকে "অখিলরসামৃত মূর্ত্তি" বলিয়া তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রকটিত করা হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী টীকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

"রসবিশেষবিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যাৎ দৃশ্যতে।

সুতরাং ইনি রসাস্বাদক এবং রসময় বিগ্রহ। এই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন ঃ—

অয়ং সুরম্যো মধুরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
বল্লীয়ান্নবতারুণ্যো বাবদুকঃ প্রিয়ম্বদঃ॥
সুধী সপ্রতিভো ধীরো বিদগ্ধ শ্চতুরঃ সুখী।
কৃতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবশ্যো গম্ভীরতাম্বুধিঃ
বলীয়ান্ কীর্ত্তিমান্ নারীমোহনো নিত্য নূতনঃ
অতুল্যকেলী সৌন্দর্য্যপ্রেষ্ঠবংশী স্বনাঙ্কিতঃ
ইত্যাদয়শ্চ মধুরাঃ গুণাঃকৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতাঃ।

শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রূপ রসিকভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বহুবহু গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু "রসময় কলেবর রসিকশেখর" শ্রীকৃষ্ণের প্রাগুক্ত গুণাবলীই ব্রজবধূদিগের চিত্তাকর্ষক। ইনি সর্ব্বরসের বিষয়ীভূত হইলেও একমাত্র মাধুর্য্যরসই ভক্তগণের চরম লক্ষ্য। সুতরাং এই শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তির স্বরূপ-লক্ষণ শ্রীদামোদর-স্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন। আহ্লাদকত্ব ও মাধুর্য্যই শৃঙ্গার রসের উদ্রেকের কারণ, তদ্‌যথা :—

আহ্লাদকত্বং মাধুর্য্যং শৃঙ্গারে ক্রুতিকারণম্

কাব্য-প্রকাশের এই লক্ষণ অনুসারে ও প্রাগুক্ত শ্রীউজ্জ্বলের লক্ষণ অনুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপের বর্ণিত "রসময় কলেবর" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পাঠকগণ শ্রীরসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপের ধ্যান করুন, কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ এই রসরাজ-রূপের বর্ণনায় পরিপূর্ণ, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে এই শ্রীরসের আনন্দঘন মূর্ত্তি প্রকটিত, তদ্‌যথা, শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈরূপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গ মালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।

ইহার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসস্বরূপ বিহার করিতেছেন। সুতরাং ইনি রসিকশেখর, রস আস্বাদক, ও রসময় কলেবর।

শ্রীস্বরূপ আরও বলেন :—

প্রেমময়বপু কৃষ্ণ, ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোপিকা প্রবীণ॥

গোপিকাদিগের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। আমরা এখানে ব্রহ্মসংহিতা হইতে একটী মাত্র শ্লোকের উল্লেখ করিব। পাঠকগণ ইহার ধ্বনিতেই শ্রীগোপিকা-স্বরূপের কিঞ্চিৎ অনুভব করিবেন। ভক্ত পাঠকগণের

নিকট এ সকল তত্ত্ব সুবিদিত। ব্রহ্মসংহিতা বলেন ঃ—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি

এ স্থলে গোপিকাদিগকে "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা" গোপিকাগণের হৃদয় কামগন্ধবিহীন। সুতরাং গোপিকাদিগের প্রেম অতি বিশুদ্ধ। শ্রীগোপিকাগণ বিশুদ্ধ হ্লাদিনী শক্তির শ্রীমূর্ত্তি বিশেষ। তাই স্বরূপ বলিতেছেন ঃ—

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

এ স্থলে রসাভাস কাহাকে বলে, তাহার একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আভাস কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে।

অনৌচিত্য প্রবৃত্তত্ত্বে আভাসঃ রসভাবয়োঃ।

অনৌচিত্য প্রবৃত্তির নামই আভাস। সুতরাং রস বা ভাবের অনৌচিত্যে প্রবৃত্তি হইলেই তাহাকে রসাভাস বা ভাবাভাস বলে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ঃ—

পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে রসের যে সকল লক্ষণ বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণে রস অঙ্গহীন হইলেই উহাকে রসাভাস কহে। ঔপপত্যে শৃঙ্গার রসের রসাভাস দোষ ঘটে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গোপিকাগণের প্রেমে রসাভাস দোষ নাই। গোপিকাগণ শুদ্ধ প্রেমরসবতী। উপপতি ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাসক্তা হইলেও ইহাতে রসাভাস নাই। কেন না

শুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোপিকা প্রবীণ।

"আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা" গোপীগণের প্রেমরস ঔপপত্যজনিত রসাভাসের পরিচায়ক নহে, ইহা রসপুষ্টির একমাত্র হেতু। এই

ঔপপত্যভাব শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য প্রেমসম্পৎ। শ্রীগোপিকাগণ রসিক চুড়ামণিরই স্বরূপ-শক্তি অথচ উহাঁরা উপপতি জ্ঞানেই উহাঁর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ঃ—

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

সুতরাং ব্রজের ঔপপত্য একটী অসাধারণ ভাব। ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তি হইয়াও নিত্য পরকীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা। ইহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য অলৌকিক মাধুর্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

এই লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যটি পাঠকগণের অনুক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এই ঔপপত্যের মধ্যে তর্কের অস্পর্শ্য, যুক্তির অদৃশ্য এবং মনের অচিন্ত্য অসাধারণ ভাব বিদ্যমান। শ্রীভগবানের মধুর লীলার নিয়ামক নাই, উহা কর্ম্মপরতন্ত্র নহে। মানব সমাজের আচরণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উহা নিয়ন্ত্রিত নহে। রসোৎকর্ষ-বর্দ্ধনের জন্য উহা চিন্ময় জগতের এক মহাশক্তিশীল ভাববিশেষ। শ্রীভগবানের এই লীলা স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র নহে। আমাদের এই জগতের নরকজনক ঔপপত্য যেমন অসংখ্য পাপের আকর ও রসাভাসদোষদুষ্ট, ব্রজগোপীদের প্রেম কামগন্ধহীন ও উহা একবারেই বিশুদ্ধ চিন্ময়রসপূর্ণ হওয়ায়, উহাতে তেমনি ঐ সকল দোষের লেশমাত্রেরও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কেবল প্রেমোল্লাস-বর্দ্ধনের বিশুদ্ধ ভাব ভিন্ন আদৌ উহাতে জাগতিক ভাবের কোন নাম গন্ধ নাই। ব্রজের ঔপপত্যে কি প্রকারে রসাভাস দোষ ঘটে না, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পরকীয়াত্বে রসাভাস দোষ ঘটে। ব্রজরমণীরা পরকীয়া। সুতরাং সেস্থলেও রসাভাস দোষের আশঙ্কা হইতে পারে। এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য স্বরূপ বলিলেন "গোপিকার প্রেমে রসাভাস দোষ নাই।" উপপতি কাহাকে বলে এবং ঔপপত্যনিবন্ধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে রসাভাস দোষের আশঙ্কা আছে কিনা, এস্থলে তাহাই আলোচ্য। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি বলেন ঃ—

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্ম পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেম সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি আসক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাহার প্রেমই যাঁহার নিকট সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাকেই পণ্ডিতগণ উপপতি নামে অভিহিত করেন।

এই শ্লোকের পরেই শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য সম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ একটী কবিতার উল্লেখ আছে। তৎপরে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে

অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।

অতঃপরে ভরতমুনির নিম্নলিখিত বচনের উল্লেখ আছে ঃ—

বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্রপ্রচ্ছন্ন কামুকত্বঞ্চ।
যাচ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥

অর্থাৎ যে রতি নিমিত্ত লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বহুনিবারণ বিহিত আছে, যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের প্রচ্ছন্ন কামুকতা থাকে এবং যাহা উভয়ের দুর্ল্লভতাময়ী তাহাই মন্মথের পরমা রতি নামে প্রসিদ্ধা। ইহার পরের শ্লোক এই ঃ—

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থাববতারিণি॥

অর্থাৎ ঔপপত্য সম্বন্ধে যে লঘুত্বের বর্ণনা আছে তাঁহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু মধুররস আস্বাদনের জন্যই যাঁহার অবতার, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে আদৌ ঔপপত্যের হেয়ত্ব মনেই করা যাইতে পারে না।

এই কয়েকটী পদ্যের টীকায় টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী

ও পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় যেরূপ বিচার ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব তত্ত্বপূর্ণ। যাঁহারা এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীল উজ্জ্বল নীল-মণির টীকা অবশ্যই আলোচ্য। সংস্কৃতভাষাঅনভিজ্ঞ পাঠকদিগের নিমিত্ত আমরা এস্থলে দিগ্‌দর্শনের ন্যায় ঐ টীকাদ্বয়ের দুই একটী কথামাত্র উল্লেখ করিতেছি। গোপীগণের পরকীয়াত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য সম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির টীকাতে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ যে বিচার করিয়াছেন প্রথমতঃ সেই সকল কথার মর্ম্মই প্রকাশ করা যাইতেছে। তিনি বলেন ঃ—

১। সাধারণ উপপতির যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে আদৌ সে লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। নিত্যলীলায় পরকীয়-ভাব নাই। তবে মায়া দ্বারা রস-বিশেষের পরিপোষণের জন্য প্রকট লীলায় ঔপপত্যের প্রতীতি হয় মাত্র। ব্রহ্মমোহনেও মায়িক লীলা পরিলক্ষিত হয়।

২। শৃঙ্গার রসে ঔপপত্য রসাভাসজনক। শৃঙ্গার রস অতি পবিত্র। তদ্‌যথা ঃ—

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদ স্তদাগমন হেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥

এ স্থলে "উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়" এই শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ বলেন "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ" অমরকোষের এই পর্য্যায় নিরূপণে "শৃঙ্গার" শুচি পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শুচি ও উজ্জ্বল রসে অধর্ম্মময় ঔপপত্য একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ ত্রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধানে "জার" শব্দটী "পাপপতি" বলিয়াই উক্ত হইয়াছে।

৩। নাট্যালঙ্কার শাস্ত্রেও ঔপপত্যের নিন্দাগর্ভ বাক্য দৃষ্ট হয়, তদ্‌যথা সাহিত্য দর্পণে ঃ—

উপনায়ক সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌচ তথানুভব নিষ্ঠায়াং, প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্য্যাগাদিগতে শৃঙ্গারেঽনৌচিত্য মিতি।

৪। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ঔপপত্যের দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্‌যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ঃ—

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥

৫। পরীক্ষিতও বলেন ঃ—

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুপ্সিতং।

৬। এই সকল বচন দ্বারা ঔপপত্যের যে দোষ কীর্ত্তিত হইল, অপর নায়ক সম্বন্ধেই এই দোষ ধর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই সকল দোষস্পর্শের আশঙ্কা নাই। কেননা মধুররসবিশেষের আস্বাদনার্থই তাঁহার অবতার।

৭। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের নিত্য দাম্পত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মসংহিতা বলেন ঃ—

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভিশ্চ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

এই শ্লোকের "নিজরূপতয়া" অর্থ "স্বদারত্বেনৈব" "নতু প্রকটলীলা বং পরদারত্ব ব্যবহারেণেত্যর্থ"। অর্থাৎ প্রকট লীলায় যেমন আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাগণ পরদারত্মরূপে লীলার পোষণ করেন, নিত্য লীলায় সেরূপ নহে। নিত্যলীলায় দাম্পত্য ভিন্ন আর অপর ভাব নাই। কেননা পরম লক্ষ্মীদের পরদারত্ব অসম্ভব। প্রাপঞ্চিক প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণবল্লভাদের পরদারাত্ব মায়া-বিজৃম্ভিত মাত্র।

৮। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের "পতি" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তদ্‌যথা ঃ

অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা
নন্দনন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রৈলোক্যানন্দ বর্দ্ধনম্‌॥ গোতমীয় তন্ত্র।
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং
যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্‌
শ্রীভাগবত।

ইহাতে ও স্বভাবসিদ্ধ দাম্পত্যের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৯। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতেও শ্রীকৃষ্ণকে ইহাদের স্বামী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগোবিন্দবল্লভাগণে পরকীয়াত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না।

১০। লক্ষ্মীগণের পরকীয়াত্ব সম্ভবে না। শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ লক্ষ্মী। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে :—

লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানম্

গোপী বলিলেই "লক্ষ্মী" বুঝাইবে। পাণ্ডব শব্দের প্রচুর প্রয়োগ-হেতু যেমন পাণ্ডব বলিলেই কুরু বুঝায়, তদ্রূপ গোপী শব্দের প্রয়োগেই লক্ষ্মী বুঝিতে হইবে। সুতরাং গোপীদের পরকীয়াত্ব অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী কে "অখিললোকলক্ষ্মী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। প্রকট লীলায় উপপতিবৎ প্রতীয়মান হওয়াতেই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১১। বহুবারণতা, উভয়ের গোপনে সঙ্গমের দুর্ল্লভতা ও প্রচ্ছন্ন-কামুকত্ব যে রতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া রসশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক রসশাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রযুজ্য।

১২। সমর্থা রতিতে নিবারণাদি না থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্গার রসের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। তাহাতেও মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঔপপত্যের সর্ব্বতোভাবেই অপ্রয়োজন। তবে যে প্রাপ-ঞ্চিক প্রকট লীলায় ঔপপত্যবৎ ভাব প্রতীয়মান হয়, উহা মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র। শ্রীকৃষ্ণে বস্তুতঃ ঔপপত্য নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এইরূপ বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া শ্লোকটীর সুদীর্ঘ টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥

অর্থাৎ এই স্থলে নিজের ইচ্ছাতে কিছু লিখিত হইল, পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিত হইল। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে যেমন আছে তেমনি রহিল। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এই বাক্য বিচার্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় বলেন "ঐরূপ ব্যাখ্যা করা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের স্বীয় অভিপ্রেত আদৌ হইতে পারে না। উহা পরেচ্ছায় লিখিত হইয়াছে এবং ব্যাখ্যা-শেষে তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্ন রুচির লোকদের নিকট যাহাতে এই দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য লীলা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাঁহারাও এই লীলার অনুধ্যান করিতে প্রস্তুত হয়েন এই মনে করিয়াই তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ ক্ষমতাবলম্বিগণের পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।" কেন গ্রাহ্য হইতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় বহুল হেতুর অবতারণা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

১। ঔপপত্য অধর্ম্মস্পর্শি ও নরকজনক। ইহা প্রাকৃত নায়কের পক্ষে। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মনিয়ন্তৃ-চূড়ামণীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে সে আশঙ্কার স্থান কোথায়? প্রাকৃত নায়কে অধর্ম্ম স্পর্শ হয়, প্রাকৃতা নায়িকাতেও হয়; কিন্তু যিনি ভ্রূজৃম্ভনমাত্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিসংহার করিতে সমর্থ, এমন শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে অথবা তাঁহার মহাশক্তিসমূহের মুখ্যতমা হ্লাদিনী-শক্তি-রূপিণী শ্রীগোপিকাগণে আদৌ এ দোষের আশঙ্কা হইতে পারে না। সেইজন্য শ্রীপাদ গ্রন্থকার তাঁহার নাটক চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন।

যৎপরোঢোপপত্যন্তু গৌণত্বং কথ্যতে বুধৈঃ
তত্তু কৃষ্ণঞ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপাদ্যতাম্

অলঙ্কারকৌস্তুভকারেরও এই অভিপ্রায়। অলৌকিকসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ঔপপত্য ও শ্রীগোপিকাগণের পরকীয়াত্ব,—দূষণ না হইয়া ভূষণ স্বরূপই হইয়া থাকে।

২। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা মায়িক নহে। বস্তুতঃ প্রকটলীলা ও অপ্রকট লীলায় স্বরূপতঃ কিছুমাত্র ভেদ বা বৈলক্ষণ্য নাই। তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য তিনি যখন কৃপা করিয়া প্রপঞ্চ জগতের গোচরীভূত করান, তখনই উহা প্রকট লীলা নামে অভিহিত হয়েন, অপর পক্ষে সেই লীলা প্রপঞ্চ জগচ্চক্ষুর অন্তর্হিতা হইলেই উহা অপ্রকট আখ্যায় অভিহিতা হইয়া

থাকেন। ভাগবতামৃত বলেন ঃ—

অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥

৩। অপ্রকট লীলা নিত্য দাম্পত্যময়ী এবং প্রকট লীলা মায়িক ও পরোঢ়া-উপপতি ভাবময়ী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কেননা সর্ব্বলীলা-মুকুটামণি রাসলীলার আদি-অন্তমধ্যে পরোঢ়া-উপপতি ভাব বিরাজমান। রাসলীলার মায়িকত্ব মনে করাও নিষিদ্ধ। রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়েই পরকীয়াত্ব-উপপতিত্ব-প্রতিপাদক বচন প্রমাণ আছে। তদ্‌যথা—

ক। তাঃ বার্য্যমানা পতিভিরিত্যাদি।
ভ্রাতরশ্চ পতয়শ্চ ব ইত্যাদি।
যৎপত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তি রঙ্গ। ইতি প্রথমে।

খ। তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারানি সস্মরু।
ইতি দ্বিতীয়ে।

গ। পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবানতি বিলঙ্ঘ্যতে
ইতি তৃতীয়ে।

ঘ। এবং মদর্থোজ্‌ঝিত লোক বেদ স্বানাং
ইতি চতুর্থে।

ঙ। কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীংগোপযোষিতাং
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥
ইতি পঞ্চমে।

শ্রীশুকদেবের, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপিকাগণের শ্রীমুখনিঃসৃত এই সকল বাক্যলহরীতেই পরোঢ়াত্ব ও উপপাতিত্ব ভাব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। এই সকল বাক্যে কোন ক্রমেই দাম্পত্যের প্রতিপাদন হয় না।

৪। রাসলীলা মায়িকত্ব-বিজৃম্ভিত হইলে লক্ষ্মীগণের তুলনায় শ্রীগোপিকাগণের উৎকর্ষই বা কিসে সপ্রমাণ হয়? অপিচ শ্রীভাগবত বলিতেছেন ঃ—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত রতে প্রসাদ

ইত্যাদি বচন দ্বারা লক্ষ্মীগণের অপেক্ষা শ্রীব্রজ গোপীদের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। রাসলীলা মায়িক হইলে এই উৎকর্ষ সংস্থাপন অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

৫। কেহ কুত্রাপি দাম্পত্যময়ী রাসলীলা বর্ণন করেন নাই।

৬। ঔপপত্য-প্রতিপাদক অংশগুলি ভ্রমক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিলে রাসলীলার আদৌ কোন উপাদেয়ত্ব থাকে না। এই রাসলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য এই যে ঃ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষা পিচ

রাসলীলা মায়িক হইলে এই পদ্যাংশের পরম প্রেমোৎকর্ষপ্রমাপকত্ব অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

৭০। উদ্ধৃত পদ্যাংশের অপরাংশ পরোঢ়াত্বও উপপতিত্বপ্রতিপাদক উহা এই ঃ—

যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

গোপীকাগণ দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া একনিষ্ঠভাবে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ ভজনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-ভজনে "শ্রীকৃষ্ণ অশক্ত।" "গোপীপ্রেমে শ্রীভগবান্ বশীভূত" এই যে নিত্য সত্য, রাসলীলা মায়িক হইলে ইহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

৮। ধরিয়া লইলাম শ্রীভগবান্ পরম মায়াবী, শ্রীগোপীগণের মনো-রঞ্জনের জন্যই না হয় তিনি এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু পরম সাধুবর্গ-মুকুটমণি মহাবিজ্ঞ শ্রীউদ্ধব অবাস্তব ও অনিত্য মায়িক বিষয়ে ভজনার পরাকাষ্ঠাত্ব সংস্থাপিত করিবেন কেন? তিনি বলেন ঃ—

আসামহো চরণরেণুযুষামহস্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্

পট্ট মহিষী প্রভৃতি হইতেও যে শ্রীব্রজগোপীদের প্রেমোৎকর্ষ সর্ব্বত্রই স্বীকৃত, তাহা এই পদ্যাংশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই অতুলনীয় প্রেমোৎকর্ষের কারণ কি? কারণ এই যে, ইঁহারা স্বজন এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিণী। স্বজন আর্য্যপথ প্রভৃতি

পরিত্যাগ যদি মায়িক ব্যাপার হয়, তবে প্রেমোৎকর্ষের হেতুটীও অবাস্তব হয়, সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে তাদৃশ প্রেমোৎকর্ষও অবাস্তব হইয়া পড়ে। তাহা হইলে একান্ত ভক্ত শ্রীউদ্ধবের বাক্যও ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত হয়। ইহাতে সকল প্রমাণের সার,—আপ্ত বাক্যেও অনাস্থা দোষের কারণ ঘটে।

৯। দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রের অর্থও পরোঢ়াত্ব-উপপতিত্ব ভাবময়। শব্দ-শক্তির অদ্ভুত অর্থ সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহাদের নিকট ইহা অবিদিত নহে।

১০। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ধ্যান ও মন্ত্রেও প্রাগুক্ত ভাব প্রকটিত হইতেছে।

১১। সাধকগণ ধ্যান-পাকদশাতেও প্রকট লীলার ভাবসমূহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং লীলা অনিত্য বা মায়িক নহেন। শ্রীভগবদ্গীতোক্ত :—

জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যামেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্য্য জন্মকর্ম্ম পরিকরাদির নিত্যত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও ঐ স্থলে "দিব্যং" "অপ্রাকৃতং" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং প্রকটলীলা মায়িক নহেন। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। তদ্‌যথা :—

ক। একোদেবো নিত্যলীলানুরক্তো
ভক্ত ব্যাপী ভক্তহৃদ্যান্তরাত্মা
পিপ্পলাদ শাখায়াং পুরুষবোধিনীশ্রুতিঃ।

খ। শ্রীমদ্বিট্ঠলনাথ গোস্বামী স্বপ্রণীত বিদ্বন্মণ্ডন নাম গ্রন্থে জন্মকর্ম্মের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

গ। বৃহদ্বামনপুরাণেও এই প্রকট লীলার নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রুতিগণের প্রার্থনায় ভগবদুক্তিতে আরও লিখিত আছে :—

জার-ধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকং
ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথঃ।

১২। শ্রীভগবানের "নাম" নিত্য। এক এক লীলায় তাঁহার এক এক নাম নির্দ্দিষ্ট আছেন। লীলা অনিত্য হইলে শ্রীনামও অনিত্য হইয়া যান। সুতরাং ভজনের যাহা সার, তাহাও মায়িক হইয়া পড়েন। নাম অনিত্য বলিয়া মনে করিলেও নামাপরাধ ঘটে।

১৩। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্বয়ংই শ্রীভগবৎসন্দর্ভে নাম জন্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতির নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার আকার অনন্ত, প্রকাশ অনন্ত, জন্মকর্ম্মলক্ষণলীলা অনন্ত, তাঁহার লীলাপরিকর অনন্ত। এই সকলই তদীয় স্বরূপ শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এই সকলই নিত্য। ইহা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদেরই যুক্তি। তবে পরোঢ়া-উপপতিত্ব-ভাবময়ী রাসলীলা মায়া-বিজৃম্ভিত হইবেন কেন?

১৪। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ যে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, কোনও আর্য্যশাস্ত্রে কেহ এরূপ দেখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। যদি এখন কেহ সেরূপ বলেন, তাহা শুকদেব-সম্মত হইবে কি? পরীক্ষিত ধর্ম্মসংস্থাপক ও আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যে সন্দিহান হইয়া যখন শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করেন, তখন শ্রীশুকদেব স্পষ্টতঃই তো বলিতে পারিতেন যে, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা ভার্য্যা, পরদারা নহেন। তবে তিনি কষ্টপ্রায়সিদ্ধান্ত-সমূহ দ্বারা পরীক্ষিতকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইলেন কেন?

১৫। ক্বচিৎ কচিৎ "পতি" শব্দের যে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ "গতি" বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কেবল বিবাহিত ব্যক্তিই যে নায়িকার পতি বলিয়া উক্ত হয়েন, তাহাও নহে। নায়িকা-প্রকরণে পরকীয়াতে "স্বাধীনপতিকা" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আবার এমনও হইতে পারে যে, তিনি কোন কোন নায়িকার "পতি" রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু অপরাপর নায়িকাগণের সহিত তাঁহার "দাম্পত্য" সম্বন্ধ নাই। তিনি যদি সকলেরই পতি, তবে শ্রীভাগবতে "পরদারাভিমর্ষণস্যের" কথা উঠিত না। নায়িকাদের স্ব স্ব গৃহপতির কথারও উল্লেখ আছে। ইহাও লিখিত আছে যে—

ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহসঙ্গমঃ।

১৬। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে "স বোহি স্বামী ভবতি" এইস্থলে "স্বামী" শব্দের যে উল্লেখ আছে, উহা পরিণেতৃমাত্রবাচী নহে। অর্থাৎ উহাতে কেবল "বিবাহকর্ত্তা" বুঝায় না। স্বামী ঐশ্বর্য্যবোধক। পাণিনি বলেন "স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে।" অপিচ এরূপ প্রয়োগও দেখা যায়ঃ—

"লোকে হি যস্য হি যঃ স্বামী ভবতি, সঃ তস্য ভোক্তা ভবতি।" সুতরাং স্বামী বলিলেই "বিবাহকর্ত্তা" পতি বুঝায় না।

১৭। ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধই চিন্ময়। যে যে স্থলে মায়া শব্দের উল্লেখ আছে উহা "যোগমায়া" বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার যে পতিভাব বর্ণিত আছে, উহা চিন্ময় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের লীলাতত্ত্বমধ্যবর্ত্তিত্ব হওয়া প্রযুক্ত ঐ সম্বন্ধও মায়িক নহে, শ্রীযোগমায়াই ঐ সম্বন্ধের হেতু।

১৮। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা আহ্লাদিনী শক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে লীলাবিশিষ্ট শ্রীরাধা-কৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়। লীলা-বিরহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমাদের ধারণা ও ভজনের অতীত।

১৯। আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে গোপীদের দুর্যশ, মনো-দুঃখ, শ্বশ্রূননন্দাদির নিবারণ-যাতনাদি রুক্মিণী প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং মনে হইতে পারে, রুক্মিণী প্রভৃতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ গোপীদের অপকর্ষ আছে। কিন্তু রাগানুগা মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের যে সকল লৌকিক দুঃখ দৃষ্ট হয়, আবার সেইরূপ তাঁহাদের সুখের আতিশয্যও অপর অপেক্ষা অনেক অধিক।

২০। অনুরাগিণী মহাভাবময়ী শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ,—অচিন্ত্য অনুরাগের ফল। এই সম্বন্ধ-সংস্থাপনে তাঁহাদিগকে স্বজন ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আর্য্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এত ক্লেশ, এত দুঃখও তাঁহাদের পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হই-য়াছে। ইহা ব্যতীত অনুরাগের চরমোৎকর্ষের আর দৃষ্টান্ত কোথায়? মহাভাববতীগণের এই অনন্যসাধারণ অলৌকিক অনুরাগ পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীরও যে একান্ত অভিপ্রেত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাই পরম কৃপালু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন :- -

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্ব্ব পরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥

সুতরাং ঔপপত্য-সম্বন্ধ পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদেরও অভিপ্রেত। যদি গুরুঅগ্নিবিপ্রসাক্ষিপূর্ব্বক ব্রজবালাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহঘটনা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সকল কথার অর্থই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ দাম্পত্য সম্বন্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পরেচ্ছা-প্রণোদিত।"

এস্থলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহানুভবের সূক্তিময়ী উক্তির যথাসাধ্য সার সঙ্কলন করিলাম। কৃপাময় পাঠকগণ লেখকের ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া, এই বিষয়ের আলোচনা করিলে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের একটী অতি গুহ্য রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, মূলকথা এই যে, যে ভাবেই যিনি এই ব্রজভাব গ্রহণ করুন, গোপিকার প্রেমে রসাভাস নাই ইহাই আমাদের শ্রীস্বরূপের দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

এই ঔপপত্যের সরস অন্তর্নিগূঢ় ভাব আমাদের মনের অনধিগম্য। অথচ এই ভাবের অপব্যবহারে বৈষ্ণব-সমাজে অনেকগুলি দুষ্ট মতের প্রচার হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধর্ম্মের নামে জঘন্য নরকজনক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের আজ্ঞা এই যে—

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভি র্ভক্তবৎ, নতু কৃষ্ণবৎ।

অর্থাৎ যাঁহারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন ভক্তের শ্রীচরণযুগলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে সাত্ত্বিক ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথের পথিক হয়েন। তাঁহারা কখনও যেন এই সকল বিষয়ে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণে প্রবৃত্ত না হয়েন। পরদারাভিমর্ষণ ও তৎসম্বন্ধে স্মরণ কীর্ত্তনকেলী ও গুহ্য ভাষণ প্রভৃতির ন্যায় এমন জঘন্যতম পাপ মানুষের পক্ষে আর কিছুই নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব।

শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কেবল তাহারই দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

> গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী।
> নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন খান॥
> বয়সে মধ্যমা তেঁহো স্বভাবেতে সমা।
> গাঢ় প্রেম ভাবে তেঁহ নিরন্তর বামা॥
> বামা স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
> তার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তদ্‌যথা :—

> তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
> যূথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যা মৃগীদৃশঃ॥
> তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
> মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। তদ্‌যথা :—

> রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
> স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
> হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ স্বাদন।
> হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

এই হ্লাদিনী শক্তিটী কি, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ এতদপেক্ষা স্থূল বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সে আলোচনার প্রক্রিয়া দার্শনিক ভিত্তিমূলক। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই স্বরূপ শক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়। তাঁহাতে তিনটী নিত্যশক্তি অধিষ্ঠিত,—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥

এইখানে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের শুষ্ক জ্ঞানরাজ্যের আরম্ভ ও শেষ। সমগ্র সংবিৎরাজ্যসন্দর্শনও শাঙ্করিক জ্ঞানের আয়ত্ত নহে। কেননা ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরেই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশাধিকার জন্মে। ভগবত্তত্ত্বও সংবিতের অন্তর্গত। ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীভগবত্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপরে হ্লাদিনী শক্তির কথা। তাহার অনেক পরে শ্রীরাধাতত্ত্ব। তদ্যথা ঃ—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব গুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস-আস্বাদন।
ক্রীড়ার স্বভাব যৈছে শুন বিবরণ ॥

আমরা পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সেই উক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বলিতেছি। কৃষ্ণবল্লভা ত্রিবিধা,—লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজাঙ্গনা। শ্রীরাধিকা হইতেই এই

সকল কৃষ্ণবল্লভাগণের বিস্তার হইয়া থাকে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অবতারের অবতারী, শ্রীরাধিকাও তেমনি অনন্ত কৃষ্ণকান্তাগণের বীজ-রূপিণী। লক্ষ্মীগণ ইঁহার অংশ বিভূতি, মহিষীগণ বৈভব-বিলাস-স্বরূপিণী, আর ব্রজদেবীগণ কায়ব্যূহরূপা।

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র বলেন :—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরা॥

শ্রীভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার আভাস আছে। যথা :—

অনয়া রাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়ামনয়দ্রহঃ॥

ঋক্ পরিশিষ্টেও শ্রীমতী রাধিকার নামোল্লেখ আছে :—

রাধয়া মাধবোদেব মাধবেনৈব রাধিকা।

পদ্মপুরাণ বলেন :—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডংপ্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবেকাবিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তুতে ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছ সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

শ্রীরাধাতত্ত্ব প্রকটন করাই,—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকতার বহু বিশেষত্বের মধ্যে এক প্রধানতম বিশেষত্ব। শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই বিষয়ে সুদীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য-লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহার আভাস লিখিত

হইয়াছে। ব্রজলীলার নিগূঢ় মর্ম্ম ব্রহ্মাদির জ্ঞানেরও দুর্ল্লভ, মানুষে আর কি বুঝিবে। তথাপি এই মর্ত্ত্যবাসী পাপ-তাপ-দগ্ধ মানুষের উপকারের জন্য শ্রীভগবানের পার্ষদগণ সেই অদ্ভুত লীলার যে কিঞ্চিৎ আভাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেও আমাদের এই জড়ীয় হৃদয়ে চিন্ময় তত্ত্বের আভাস কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হয়। বৈষ্ণব দর্শনের একটী প্রধান বিষয়,—শ্রীমতী রাধিকাতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ-আহ্লাদিনীর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জানিলে সাধ্যসাধন তত্ত্বের কোন কথাই বুঝা যায় না। এই জন্য ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভু কোন কোন সময়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও শ্রীরাধাতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। যথা শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়েঃ—

কৃষ্ণসার্দ্ধাঙ্গ সম্ভূতা নাথস্য সাদৃশী সতী।
গোলোকবাসিনীসেয়মত্র কৃষ্ণাজ্ঞেয়াধুনা॥
শ্রীকৃষ্ণতেজসোঽর্দ্ধেন সাচ মূর্ত্তিমতী সতী।
একা মূর্ত্তি দ্বিধাভূতা ভেদো বেদে নিরূপিতঃ॥
ইয়ং স্ত্রী, স পুমান্, কিম্বা সা বা কান্তা, পুমানয়ং।
দ্বেরূপে তেজসা তুল্যে রূপেনচ গুণেনচ।
পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যা বা জ্ঞানেন সম্পদাপিচ॥

অর্থাৎ এই সতী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ-সম্ভূতা। সুতরাং তিনি তৎস্বরূপা। রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিভেদে দ্বিবিধ নতুবা উভয়েই এক। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতী প্রকৃতি,—বেদে কেবল এই ভেদ নিরূপিত হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ মূল তত্ত্বে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই। তেজ, রূপ, বুদ্ধি, গুণ জ্ঞান ও পরাক্রমে উভয়ই তুল্য। এই স্থলে শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্লোকের কথা স্মরণ করুন ঃ—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা।
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহ ভেদংগতৌ তৌ॥
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং।
রাধাভাব দ্যুতিঃ সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

এই স্থলে আমরা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে একই মূল মহাতত্ত্বের সংবাদ পাইতেছি।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়া-শক্তি, জীব শক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥
শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে।

এই বাক্য সপ্রমাণ করার জন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্‌যথা ঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তাথপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে॥

তাব পরেই লিখিতেছেন ঃ—

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তার পরেই শ্রীবিষ্ণুপুরাণেব আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা ঃ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

ইহার অনুবাদ করিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণ সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সাব অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস যাহার আখ্যান॥
প্রেমের পরম রস, মহা-ভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম অধ্যায়।

এই পরম তত্ত্ব, শ্রীল রামানন্দ রায় দ্বারাও মহাপ্রভু জগতে প্রকটিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধা নামের যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাও ভক্তজনের একান্ত আস্বাদ্য. তদ্‌যথা :—

রেফোহি কোটী জন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভং।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
ধকার আয়ুর্ব্বৃদ্ধিঞ্চ আকারো ভববন্ধনং।
শ্রবণ স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ রাধা নামের আদ্য অকার রকার উচ্চারণে জীবের কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয়। আকার উচ্চারণে জীব গর্ভযাতনা মৃত্যু এবং রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর ধকার উচ্চারণে জীব আয়ুষ্মান্ হয় এবং আকার উচ্চারণে লোক ভববন্ধন হইতে মুক্তি পায়। এই রাধা নাম কীর্ত্তনে শ্রবণে ও স্মরণে জীবের পাপতাপাদি সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যায সন্দেহ নাই।

আরও একটী ব্যুৎপত্তি এই স্থলে লিখিত হইয়াছে, সেটী ইহা অপেক্ষাও উচ্চতম, তদ্‌যথা :--

রেফোহি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৈকমীশ্বরং॥
ধকার সহবাসঞ্চ তত্তুল্য কালমেব চ।
দদাতি সাষ্টি সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমং।
আকার স্তেজসা রাশিং দান শক্তিং হরৌ যথা।
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকালহরিস্মৃতিং॥

অর্থাৎ জীব রাধা নামের রকার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নিশ্চলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্ববাঞ্ছিত সদানন্দময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমপুরুষের প্রীতি প্রাপ্ত হয় এবং ধকার উচ্চারণে তত্তুল্য কাল তৎসহ সেই হরির সহবাস ও সাষ্টি প্রভৃতি লাভ করে। আর আকার উচ্চারণে

জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি পায় এবং হরিতে দানশক্তি যোগশক্তি, যোগমতি ও নিরন্তর হরিস্মৃতি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীরাধার ষোড়শ নামে "রাধা" নামের আরও একটী ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ষোড়শ নামের কথাই বলা যাইতেছে :—

রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী॥
কৃষ্ণ-বামাংশসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী।
কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন বিনোদিনী।
চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শতচন্দ্রনিভাননা।
নামান্যেতানি সারাণি তেষামত্যন্তরেপিচ॥
রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারোদানবাচকঃ।
স্বয়ং নির্ব্বাণদাত্রীচ সা রাধা পরকীর্ত্তিতা॥

রাধা নামের ব্যুৎপত্তির অর্থই এ স্থলে বলা যাইতেছে। রাকার দানবাচক আর ধা পরমানন্দ। যিনি পরমানন্দ প্রদান করেন তিনিই শ্রীরাধা। ইহার অপর নাম পরমানন্দরূপিণী। তদ্‌যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে :—

শ্রুতিভিঃ কীর্ত্তিতা তেন পরমানন্দরূপিণী।

এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

এই স্থলে ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণেও রাধা-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, তদ্‌যথা ;—

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ
স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়াকলাভিঃ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

শ্রীরাধাতত্ত্ব প্রকৃতই আনন্দের খনি। এ তত্ত্ব অসীম ও অনন্ত আনন্দ-পারাবার।

সাধ্যতত্ত্বের পরিজ্ঞানের জন্য শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনা সাধক-ভক্তের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীল রামানন্দের মুখেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই তত্ত্ব বিশেষরূপেই প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীল রায় মহাশয় বলিতেছেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়-ব্যূহরূপ॥

যদ্দ্বারা সর্ব্বাভিষ্ট সম্পূরণ হয়, তাহারই নাম চিন্তামণি। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম চিন্তামণি বিশেষ। যিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, যাঁহার ইচ্ছামাত্র কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, তাঁহার আবার সভীষ্টই বা কি, এবং অভীষ্ট-পূরণের জন্য চিন্তামণিরই বা প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। লীলারস-বিশিষ্ট রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা আছে। পার্থিব কোন ভাব ও ভাষায় সে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করা যাইতে পারে না। তথাপি কৃপাময় ভক্তগণ সেই মহাভাবের আভাস কিয়ৎ-পরিমাণে মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাহাই আমাদের সম্বল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোনজন॥
আমা হৈতে হয় যার শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥

কোটী কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সম নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশী গীতে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত ঘ্রাণে হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করয়ে শীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥

শ্রীমতী মহাভাব-স্বরূপিণী। শ্রীরাধার প্রেম-মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শত কোটী গুণে অধিক। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হ'তে রাধা সুখ শত অধিকাই॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন একরস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈলু অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার।
রাগমার্গে ভক্তভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥

শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ প্রকার রস আস্বাদন করিলেন, তথাপি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন "শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভূত মধুরিমা আস্বাদন করেন, তাহার মহিমা কি প্রকার, এবং শ্রীরাধার আস্বাদ্য আমার মাধুর্য্যই বা কি প্রকার, এবং আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহাই বা কীদৃশ, শ্রীব্রজ-লীলায় এত রস আস্বাদন করা সত্ত্বেও আমার এ ত্রিবিধ বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল।" তাই তিনি বলিতেছেন :—

এই তিন বাঞ্ছা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধা ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

সুতরাং মহাভাবস্বরূপিণী-বিবিক্ত শ্রীকৃষ্ণ, মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া শ্রীরাধাপ্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন। এই স্বরূপ-তত্ত্বই শ্রীগৌরাঙ্গ, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গলীলাই সর্ব্ববাঞ্ছা-পরিপূরণের লীলা। এই স্থানেই লীলাসুখের শেষ পরিণতি, ইহাই লীলার পরকাষ্ঠা। এই জন্যই পদ-কর্ত্তা বলেন :—

"সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতার।"

যাহা হউক, যাঁহার ভাব অবলম্বন ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রাগুক্ত ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূরণের আর উপায়ান্তর নাই, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মহাভাব চিন্তামণি-সারস্বরূপিণী।

রূপে গুণে শ্রীরাধা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অতুলনীয়া। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীকৃষ্ণস্নেহে মার্জ্জিত। তদ্‌গুণে সেই শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধাঢ্য ও সমুজ্জ্বল। আর সেই দেহ কারুণ্যামৃত ধারায়, তারুণ্যামৃত ধারায় এবং লাবণ্যামৃত ধারায় পরিস্নাত। গন্ধদ্রব্য-সমন্বিত তৈল হরিদ্রা মাখিয়া স্নান করিলে যেমন অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং অঙ্গ সদ্গন্ধযুক্ত হয়, মহাভাব মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময়ী

শ্রীমতীর শ্রীমূর্ত্তি উজ্জ্বলতা সাধনের উপকরণগুলিও অপ্রাকৃত ও ভাবময়। কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত ধারা ভাবরাজ্যের স্নানীয় জল। লাবণ্যামৃত স্নাত শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি হইতে সততই ইন্দ্রিয়াতীত আলোক-সম্ভব লাবণ্য ক্ষরিত হয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাহে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান॥

মহাভাবময়ী শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বলতা সাধন ও অলঙ্কারাদি সমস্তই অপ্রাকৃত।

অপ্রাকৃতাদেহা, চিদানন্দময়ী শ্রীমতী রাধিকার অপ্রাকৃত অঙ্গাভরণের কথা শ্রীল রামরায় মহাশয় যেরূপ বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর, তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥

প্রথম বসন—লজ্জা, আর দ্বিতীয় বসন—কৃষ্ণানুরাগ। লজ্জা,—শ্যাম-পট্টশাটীর সহিত, এবং কৃষ্ণানুরাগ—রক্তবসনের সহিত তুলিত হইয়াছে। মহাভাব স্বরূপিণীর বসনভূষণ সকলি ভাবময়। প্রাকৃত জড়বস্তুর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। আমাদের ন্যায় প্রাকৃত জ্ঞানবিশিষ্ট লোক-দের ধারণার জন্যই তাঁহার অপ্রাকৃত দেহের ও অপ্রাকৃত বসনভূষণের প্রাকৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ স্থলে তাঁহার যে দুই বসনের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, বাঙ্গালী পাঠকদের বোধসৌকর্য্যার্থে তৎসম্বন্ধে

দুই একটী কথা বলা সঙ্গত। পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাগণ দুই বসন পরিধান করেন,—ঘাঘরা ও ওড়না। গৌরাঙ্গী সুন্দরীগণ নীলবর্ণ ঘাঘরা এবং লোহিত ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীরও এ স্থলে দুই বসনের উল্লেখ করা হইয়াছে—লজ্জা ও কৃষ্ণানুরাগ। লজ্জা—ঘাঘরা, কৃষ্ণানুরাগ—ওড়না। কৃষ্ণানুরাগের বর্ণ লাল। বিজ্ঞানবিদেরা জানেন লালবর্ণের স্পন্দন (vibration) অন্যান্য বর্ণাপেক্ষা অনেক অধিক। ফলতঃ কৃষ্ণানুরাগের ন্যায় শক্তিশালী পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কৃপাময় পাঠক, এখন নিজে এ বিষয়ের অনুধ্যান করুন।

প্রণয়মানকে বক্ষাচ্ছাদনের কঞ্চুলিকারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রণয়মান কাহাকে বলে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মানে আবরণী শক্তি আছে। কোন কোন মান সহজে উন্মোচিত হয় না, কিন্তু কঞ্চুলিকার ন্যায় প্রণয়মান দৃঢ়াবরণী হইলেও সহজেই উহাকে উন্মোচিত করা যায়। সৌন্দর্য্য,—কুঙ্কুমের সহিত, সখী-প্রণয়,—চন্দনের সহিত এবং স্মিতকান্তি,—কর্পূরের সহিত তুলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসে শ্রীমতীর অঙ্গ মৃগমদে চিত্রিতের ন্যায় পরিশোভিত। অতঃপরে ঃ—

প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্য-বিলাস।
ধীরাধীরত্বগুণ অঙ্গে পট-বাস॥
রাগ ও তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥

প্রচ্ছন্নমান ও বাম্য ইহাই কবরী-বিন্যাসের দুই গুচ্ছ। এখন সাধারণতঃ এক বেণীতে কেশবন্ধন করা হয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে দুই বেণীতে কেশবন্ধনের রীতি প্রচলিত ছিল। উহারই এক বেণী প্রচ্ছন্নমান এবং অপর বেণী বাম্যরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ তুলনা কেন করা হইল, ভক্ত ভাবুক পাঠকগণই তাহার অনুধ্যান করিয়া বুঝিবেন। আমরা উহার ব্যাখ্যা করিয়া ভাব সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব না।

শ্রীরাধিকার প্রেম,—অধিরূঢ় মহাভাব। এ জগতে এই মহাভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ইহা গোলোকের ধন। মানুষের অসম্পূর্ণ ও পরিক্ষীণ ভাষায় এই মহাভাবের বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করা যাইতে পারে

না। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥
যাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্মবাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীবছার ॥

ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ও প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের উক্তি। যেখানে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা এবং সাক্ষাৎ বিশাখা সখী শ্রীমতীর গুণগণগায়িকা, সেখানেও যখন শ্রীরাধা তত্ত্ব বর্ণনের সীমা হয় না, তখন আমার ন্যায় অভাজনের পক্ষে এ দুঃসাহস কেন? ভক্তজনসমাজে ইহার একটা সামান্য কারণ নিবেদন করা যাইতেছে। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার একান্ত ভক্তগণের কৃপায় ভক্তসমাজে গোলোকের ভাবাভাসসূচক দুই একটী শব্দনাদের ব্যাখ্যা শুনিয়াই আমাদের ন্যায় জড়পরমাণুতেও যখন কখন কখন বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় ভক্তিবিন্দুর স্ফুরণাভাসবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে জীবগণের হিতের জন্য শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে শ্রীরাধাতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করা জীবের মহা-কর্ত্তব্যকর্ম্ম। বৈষ্ণব রসগ্রন্থাদিতে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় লিখিত হইয়াছে। উহাতে দার্শনিকতার সূক্ষ্মতত্ত্ব বিনিহিত আছে। সেই সকল তত্ত্ব সরল ও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর একান্ত কৃপা ব্যতীত এই সকল বিষয়ে প্রবেশ করা যায় না। কেবল সভক্তি আলোচনাই এস্থলে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভাব-বিচার।

এইরূপে শ্রীস্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরাধা-তত্ত্বের সূচনা করিলেন। শুনিয়া মহাপ্রভুর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন,—"স্বরূপ, আমার তৃপ্তি হইতেছে না, তুমি আরও বল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দসাগর।
কহ কহ কহে প্রভু, বলে দামোদর॥

দামোদর বলিতে লাগিলেন :—

অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দশবান হেম॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে॥

শ্রীরাধিকার প্রেম অতি বিশুদ্ধ। স্বর্ণকে বহুবার অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন তাহাতে মিশ্রিত ইতর ধাতু ও অপর পদার্থ দগ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ স্বর্ণ যেমন অতি বিশুদ্ধ ও অতি উজ্জ্বল হয়, শ্রীরাধিকার প্রেমও তেমনি ইতররাগ ও ইতরকামবিবর্জ্জিত, অকৈতব ও একান্ত পরিশুদ্ধ। এই প্রেমের অপর নাম অধিরূঢ় মহাভাব।

অধিরূঢ় মহাভাব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে ভাব, মহাভাব, রূঢ় ও অধিরূঢ় এই চারিটী কথা পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে হইবে। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই শ্রীগ্রন্থখানিকে আমরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অতি সূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্র নামে অভিহিত করি। ইংরেজী ভাষায় Psychology of Divine Love এইরূপ অনুবাদ করিলেও শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির প্রকৃত আলোচ্য-বিষয়বোধক অনুবাদ হয় না।

বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের পরিভাষাগুলি না বুঝিলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া উহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা অসম্ভব। শ্রীস্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে গোপীপ্রেমের যে চিদানন্দরসতত্ত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত আছে। শ্রীচৈতন্যলীলার সমস্ত রসের ভাণ্ডারী—শ্রীস্বরূপদামোদর। এই স্বরূপদামোদরের নিকট মহাপ্রভু বৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তি তরুণ যুবক ভক্তিময় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি মহাশয়কে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দয়াময় গুরু শ্রীল স্বরূপ তদীয় প্রিয়শিষ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি মহাশয়কে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রসতত্ত্বের গূঢ় গভীর অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবি-রাজ গোস্বামী এই পরমারাধ্য দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীগৌরলীলার রসতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ-শিরোমণি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঃ—

চৈতন্য লীলা রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইঁহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

সর্ব্বভাব-মহাসাগর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ে সকল ভাবের তরঙ্গই অহর্নিশ উত্থিত হইত। স্বরূপ তাহা আস্বাদন করিতেন, সুতরাং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপের হৃদয়কে সেই মহালীলার ভাণ্ডার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাপ্রভু সর্ব্বভাবের আশ্রয়। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

লীলা শুক মর্ত্ত্যজন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে, কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।

শ্রীরাধার ভাব-সার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় যদি তার দাসানুদাস সঙ্গ ॥

স্পষ্টতঃই লীলার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম এখানে পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। এই লীলায় রাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু স্বীয় পূর্ব্ব লীলা মাধুরী আস্বাদন করেন। সুতরাং শ্রীরাধার যে সকল ভাবোদ্গম হয়, শ্রীচৈতন্য-লীলায় মহাপ্রভু স্বীয় রস আস্বাদন ও ভক্তগণের শিক্ষার জন্য নিজে সেই সকল ভাব অঙ্গীকার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা পাঠ করিতে হইলে ভাবের পরিভাষা পরিজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং এস্থলে তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

রসশাস্ত্রে দুই প্রকার "ভাবের" উল্লেখ আছে,—পূর্ব্ব ভাব ও উত্তর ভাব। নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব। ইহা পূর্ব্বভাব। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য মহাভাবের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। মহাভাবের সহিত যে ভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহার লক্ষণ এই :—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥

অনুরাগ যদি যাবদশ্রয়বৃত্তি হইয়া আপনার দ্বারা সম্বেদন যোগ্যদশা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে ভাব বলে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তজ্জন্য রাগ ও অনুরাগ কাহাকে বলে তাহার উল্লেখ করা আদৌ প্রয়োজনীয়।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষ সরাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।

অর্থাৎ প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু যে স্থলে চিত্ত মধ্যে অতিশয় দুঃখও সুখত্ব-রূপে অনুভূত হয় তাহার নাম রাগ। আর—

সদানুভূতি মপি যঃ কুর্য্যান্নবনবংপ্রিয়
রাগো ভবন্নবনবং সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।

অর্থাৎ যে রাগ নূতন নূতন হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নবীন নবীন বোধ করায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুরাগ বলেন।

রাগ ও অনুরাগ কাহাকে বলে তাহা বুঝা গেল। এখন ভাবের সহিত এই অনুরাগের সম্বন্ধ কি, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ভাব অনুরাগেরই একটা উন্নত অবস্থা। অনুরাগের প্রকর্ষ-বিশেষই ভাব নামে খ্যাত। ভাবের যে লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় অনুরাগ "যাবদাশ্রয়বৃত্তি" ও স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইলেই ভাব নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে এখন বুঝিতে হইবে "যাবদশ্রয়-বৃত্তিত্ব" ও "স্বসংবেদ্যদশাপ্রাপ্তি" এই দুই কথার অর্থ কি ?

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রাগুক্ত ভাব-লক্ষণ-সূচক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন :—

"যাবতীরাগস্থেয়ত্তা সম্ভবতি তাবতীং তামাপন্না বৃত্তির্ব্বর্ত্তনং যস্তেতি গম্যতে।" অর্থাৎ রাগের শেষসীমা প্রাপ্তিই রাগের "যাবদাশ্রয়ত্ব।" সুতরাং যাবদা-শ্রয়-বৃত্তি অর্থে পরকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বসম্বেদ্য-দশা প্রাপ্ত হয়। যে দশায় রাগ আপনার প্রভাবেই স্বয়ং আস্বাদের বিষয়-স্বরূপ হইয়া থাকে, তখন তাহাকে স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত বলে। ইহাই ভাব ও অনুরাগের দার্শনিক তত্ত্ব।

বর্ষাগমে তটিনী যেমন আপন গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া দুকুল ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে "ভাবের" উদয়েও তেমনি সমগ্র জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে, সেই ভরপুর আনন্দপ্রবাহ হৃদয় পরিপ্লুত করিয়া বর্ষার বিশাল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দুকুল ভাসাইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ব্রজের কুলবধূগণের হৃদয় এই ভাবতরঙ্গে পরিপ্লুত হইল, তাঁহারা কূল

ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিলেন, এবং দুস্ত্যজ স্বজন আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। ইহাই অনুরাগের পরাকাষ্ঠা,—ইহাই ভাব। এই ভাবের সারই মহাভাব। মহাভাব কেবল ব্রজদেবীগণেরই সম্বেদ্য—অপরে ইহা জানিতে পারেন না। পট্ট-মহিষী-গণের হৃদয়েও মহাভাবের উদয় হয় না। মহাভাব কাহাকে বলে সংক্ষেপতঃ তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম লিখিত হইল।

এখন রূঢ় ও অধিরূঢ় এই দুই কথার অর্থ কি, তাহাই আলোচ্য। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি বলেন ঃ—

উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র সরূঢ় ইতিভণ্যতে।
নিমেষাসহতাসন্ন-জনতা-হৃদ্বিলোড়নম্॥
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তি শঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি সর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্রযোগবিয়োগয়োঃ॥

যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল বিদ্যমান, তাহাই রূঢ়ভাব নামে অভিহিত। প্রেমের রূঢ়াবস্থায় নিম্নলিখিত অনুভাব সকল পরিলক্ষিত হয় ঃ—রূঢ়ভাবাপন্না প্রেমবতী নিমেষকালও প্রিয়জনের বিয়োগ সহিতে পারেন না; রূঢ়ভাবাপন্না প্রেমবতীর প্রেমানুরাগের আর একটী মহিমা এই যে উহা আসন্ন জনসমূহের হৃদয় বিলোড়িত করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া-ছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রেমানুরাগ সমুদ্রলহরীর ন্যায় কুরুবংশীয়দিগকে প্লাবিত, মহারাজগণের মস্তক বিঘূর্ণিত এবং পতিব্রতা নারীগণের সতীত্ব শিথিলীকৃত এবং অপরাপর সমস্ত জনগণের চিত্ত প্রেমে পরিপ্লুত, সত্য-ভামার অন্তঃকরণ আক্রান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠশ্রীসদৃশা শ্রীরুক্মিণী দেবীকে স্তিমিত করিয়া প্রবাহিত হইযাছিল।

পাঠক, আপনি ললিতাকুঁড়ীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গঙ্গাপ্রবাহ কি প্রকারে দেশ ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, সে বিবরণ শুনিয়াছেন; দামোদরের বন্যার কথা শুনিয়াছেন, সমুদ্রপ্লাবনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলপ্রবাহ, আপন অধিকার বিস্তার করিয়া, স্বীয় উত্তাল তরঙ্গে জননিবাসগুলিকে কি প্রকার

বিলোড়িত ও পরিপ্লুত করিয়া দিয়াছিল, আপনি তাহাও শুনিয়াছেন, কিন্তু রূঢ়প্রেমবতী গোপীগণের প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে কি প্রকারে আসন্ন জনতাসমূহের হৃদয় বিলোড়ন করিয়া দেয়, সে ধারণা হৃদয়ে অনুভব করা বড় সহজ কথা নহে।

পাঠক, আপনি বৎসহারা গাভীর মহাব্যাকুল মুখচ্ছবি এবং তাহার প্রাণোন্মাদক ব্যাকুল হাম্বারব শুনিয়াছেন কি? এইরূপ একটী গাভী বৎস খুঁজিতে খুঁজিতে যে দিকে ধাবিত হইবে, সেই দিকের সমস্ত লোক-কেই সে হাম্বারবে আকুল করিয়া তুলিবে। সে ব্যাকুল রব শুনিয়া স্থির থাকা কাহার সাধ্য?

গোপীপ্রেমের অনুরাগ এইরূপ। তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে যাইয়া যখন আকুল ভাবে "হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ" বলিযা আকুলভাবে ডাকিতেছিলেন, তখন সেই মহাজনতাপূর্ণ স্থানের সকলের চিত্তই বিলোড়িত হইয়া উঠিয়া-ছিল। গোপীদের এই ভাব দেখিয়া দ্বারকাবাসিনী কোন রমণী বলিয়া-ছিলেন ঃ—

সখ্যঃ প্রেক্ষ্য কুরূন্ গুরুক্ষিতিভৃতা মাঘূর্ণয়ন্তী শিরঃ।
স্বস্থা বিশ্রথয়ন্ত্য শেষ রমণীরাপ্লাব্য সর্ব্বং জনম্।
গোপীনামনুরাগ-সিন্ধুলহরী সত্যান্তরং বিক্রমৈ
রাক্রম্য স্তিমিতাং ব্যধদপি পরাং বৈকুণ্ঠ কণ্ঠশ্রিয়ং॥

অর্থাৎ, দেখ দেখ সখীগণ অপূর্ব্ব মাধুরী।
গোপীদের অনুরাগ সমুদ্রলহরী॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব শুনিয়া ব্যাকুল সব
কুরুকুল আকুল ও-রবে,
সমুদ্র-লহর প্রায় যথা ঐ ধ্বনি যায়
ভেসে যায় প্রেমের প্রভাবে।
ছোট বড় যত জন সবার আকুল মন
নারী নারে ধৈরয ধরিতে।
সত্যভামা শ্রীরুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণের আদরিণী
পরমাদ গণিলেন চিতে॥

ইহারই নাম "আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন।" আর একটী কথা,—কল্পক্ষণত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে মহাকল্পরূপ কালসংখ্যাও নিমেষ তুল্য বোধ হয়। আবার তাঁহার বিয়োগে ক্ষণকালও ইঁহাদের কল্পসম বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সুখে থাকিলেও গোপীদের মনে তাঁহার অসুখের আশঙ্কা জন্মে, ইহাও রূঢ়ভাবের একটী লক্ষণ। আরও একটী বিষয় এই যে এই ভাবে মোহাদির অভাবেও গোপীদের বিস্মৃতির উদয় হয়। সাধুসঙ্গবিষয়ক প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন "উদ্ধব মদ্বিষয়ক প্রীতিমত্ত্বই সাধুত্ব। সাধুত্ব লক্ষ:ণের পরাকাষ্ঠা কেবল গোপীদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।" তদ্‌যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ অধ্যায়ে

তানাবিদন্ময্যনুষঙ্গ বদ্ধ
ধিয়ঃ সমাত্মা নমদ স্তথেদং।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টাইব নামরূপে॥

হে উদ্ধব যেমন সামাধিকালে মুনিগণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় নাম রূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, তদ্রূপ আমাতে আসক্তিবশতঃ গোপী-গণ স্বীয় দেহ ও দূর নিকট সম্বন্ধ কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর আমাতেই প্রবিষ্ট থাকে।

ইহাই রূঢ়প্রেম। অধিরূঢ় কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণি বলেন ঃ—

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তাবিশিষ্টতাং।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ় নিগদ্যতে।

অর্থাৎ যাহাতে রূঢ়ভাবে উক্ত অনুভাব সকলের সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অধিরূঢ় ভাব বলে। এই অধিরূঢ় হইতে মোদন ও মাদন দুই ভাবের উৎপত্তি হয়। এই অধিরূঢ় মহা-ভাবই শ্রীরাধার প্রেম। এ সম্বন্ধে শিববাক্য এই যে,

লোকাতীতমজাণ্ড কোটীগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখং।
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্‌ যদি স্ফুটমুভে তেগচ্ছতঃ কূটতাম্‌॥

নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা।
প্রেমোদ্যাৎ সুখ দুঃখ সিন্ধুভবয়ো র্বিন্দেত বিন্দোরপি॥

অর্থাৎ এক দিবস পার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেমবিশিষ্টতার প্রভাব মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন হে শিবে, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত ও বৈকুণ্ঠ-গত ত্রিকালের সুখ ও ত্রিকালের দুঃখ যদি দুই ভিন্ন স্থানে রাশীকৃত করা হয়, তাহা হইলে ঐ দুই স্থলও শ্রীরাধিকার প্রেমোদ্ভব সুখ দুঃখের বিন্দু মাত্রও ধারণা করিতে পারে না।

ইতপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই—অধিরূঢ় মহা-ভাব। অধিরূঢ় মহাভাব কাহাকে বলে ব্যাখ্যা করিয়াও তাহা পরিস্ফুট করা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ ব্রজের কোন ভাবই লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু মানুষের উপাসনার উচ্চতম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে মানুষ সাধারণতঃ জড়ীয় ভাবেই উপসনায় রত থাকে। অধিরূঢ় মহাভাব প্রগাঢ় চিন্ময় তত্ত্ব। এক মানুষ অপর মানু-ষকে এই মহাভাবের বিষয় বুঝাইয়া দিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহে। তাই পরম দয়াল রসরাজ-চূড়ামণি রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় স্বয়ং এই মহাভাবের অভিনয় করিয়া প্রিয়তম পার্ষদ ও একান্তী ভক্তগণকে এই মহাভাবের দিক্ প্রদর্শন করিয়া দিলেন। মহাভাব-স্বরূপ শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর শেষলীলায় এই অধিরূঢ় মহাভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতারের এই এক মুখ্য কারণ প্রকটন করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥

শেষ লীলায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ শ্রীল স্বরূপদামোদরকে শ্রীরাধিকা-প্রেমের যে মহালীলা দেখাইয়াছিলেন, রথযাত্রা-দর্শন সময়েই তিনি প্রথমতঃ শ্রীস্বরূপের হৃদয়ে সেই ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিলেন। অথবা সাক্ষাৎ ললিতাস্বরূপ স্বরূপদামোদরের হৃদয়ে শ্রীরাধাতত্ত্বের স্ফূর্ত্তিরই বা প্রয়োজন কি? তাঁহার সরস হৃদয়ে রাসরসিকের ও রসবতী শ্রীরাধার রাসলীলা নিত্যই সপ্রকাশ। তাই স্বরূপের মুখে মহাপ্রভু রাধা-তত্ত্ব প্রকটন করিয়া ভক্তবর্গকে শ্রীরাধার প্রেমতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। উহাতে ভক্তগণের হৃদয় সেই তত্ত্বের ধারণা করিতে প্রস্তুত হইলেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞান তখনও জন্মিল না। ভক্তগণ শেষ লীলায় মহা-প্রভুর মহাভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরাধা-প্রেমের মহিমা বুঝিতে পারি-লেন। সমুদ্র-লহরীও গণিয়া গণিয়া নির্ণয় করা যায়, কিন্তু শ্রীরাধা-প্রেম-সিন্ধুর ভাবতরঙ্গ-লহরীর গণনা অসম্ভব। তথাপি কতিপয় ভাবের নামো-ল্লেখ রসশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই প্রাপঞ্চিক জগতের উত্তম ভক্তগণের রসশাস্ত্রে লিখিত উক্ত কতিপয় মাত্র ভাব হৃদয়ে ধারণা করারই অধিকার! তাই প্রয়োজনাভিজ্ঞ শাস্ত্রবিদ্‌গণ উক্ত কতিপয় মাত্র ভাবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব।

এস্থলে উক্ত ভাবাদি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল স্বরূপের উক্তিতে লিখিত আছে :—

অষ্ট সাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যাভিচারী আর।

শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন :—

সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাবভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সাত্ত্বিক প্রকরণ নামক প্রকরণে সাত্ত্বিকাদি ভাবের সোদাহরণ আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে দক্ষিণ বিভাগের তৃতীয় লহরীতেও সাত্ত্বিক ভাবের সবিস্তার আলোচনা লিখিত আছে। উহা পাঠে জানা যায় স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই আটটী সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত।

সাত্ত্বিক ভাব কাহাকে বলে, তাহার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে তদ্‌যথা :—

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবা স্তেতু সাত্ত্বিকাঃ
স্নিগ্ধা দিগ্ধা স্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধামতাঃ॥

অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অথবা তাঁহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যবধানবিষয়ক ভাব সমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে তাহাকে পণ্ডিতগণ সত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব সমূহকেই সাত্ত্বিক ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাব ত্রিবিধ—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবসমূহ উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণে বিভক্ত।

এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ও ইহাদের উৎপত্তির যে সকল হেতু লিখিত হইবে, তৎসমস্তই মনস্তত্ত্বের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তসম্মত। যাঁহারা প্রফেসার বেন সাহেবের Mental and Moral Science অথবা Will and Emotion নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, বৈষ্ণবদিগের এই রসশাস্ত্রখানি কেমন বিশুদ্ধ: মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইয়োরোপে অধুনা Psycho-physiology নামক অধ্যাত্ম-শারীর বিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এ দেশের রসশাস্ত্রে বহুকাল পূর্ব্বে এই বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের সুসিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ভাবের সহিত দৈহিক বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদির যে কি নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যাঁহারা তাহার বিশেষ জ্ঞান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রফেসার বেইনের প্রাগুক্ত গ্রন্থের The instinctiv play of feelings শীর্ষক প্রবন্ধের সাহায্যে এই সকল তত্ত্ব পাঠ করিতে পারেন। সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাবে দৈহিকযন্ত্রের ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারাই সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ ও সঞ্চারাদি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল ভাবের প্রত্যেকটীই এক একটী মহাশক্তি। শক্তি কখনও অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে না। ভাবের অভ্যুদয়ে দেহে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কি প্রকারে

দেহে ভাব প্রকাশিত হয়, শ্রীভক্তিরসামৃত গ্রন্থে উহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকক্রম লিখিত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটং
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছেদ্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং
তদা স্তম্ভাদয়োভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী

অর্থাৎ চিত্ত সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণেরও তখন বিকার জন্মে। বিক্রিয়াপ্রাপ্ত প্রাণ দেহকে আলোড়িত করিয়া তোলে। এই কারণে ভক্ত-দেহে স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়।

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের নামগুলি এই :—

তে স্তম্ভঃ স্বেদঃ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোহথঃ বেপথু
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ

অর্থাৎ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু কম্প বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় (চেষ্টাশূন্যতা) এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। কি প্রকারে স্তম্ভ স্বেদাদির উৎপত্তি হয় তাহার হেতু এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তদ্‌যথা :—

চত্বারি ক্ষ্মাদি ভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে।
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ॥
স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ।
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ॥
স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দ মধ্য তীব্রত্বভেদভাক্॥

অর্থাৎ কখন কখন প্রাণ পৃথিবী জল তেজ ও আকাশ অবলম্বন করিয়া থাকে এবং কখন কখন স্বীয় আশ্রয়ে দেহে বিচরণ করে। প্রাণ ভূমিস্থ হইলে স্তম্ভ, জলাশ্রিত হইলে অশ্রু, তেজস্থঃ হইলে স্বেদ, আকাশাশ্রিত হইলে প্রলয় (মূর্চ্ছা) হইয়া থাকে। আর প্রাণ যখন বায়ুস্থিত হয় তখন মন্দত্ব, মধ্যত্ব, ও তীব্রত্বানুসারে রোমাঞ্চ কম্প ও স্বরভেদ জন্মে।

হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য বিষাদ ও অমর্ষ হইতে স্তম্ভের উৎপত্তি হয়। স্তম্ভ হইতে বাক্যরোধ, নিশ্চলতা ও শূন্যত্বাদি ভাব প্রকাশ পায়। হর্ষ ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরের আর্দ্রতাই স্বেদ নামে অভিহিত হয়। মনস্তত্ত্বের

আধুনিক পণ্ডিত প্রফেসর বেইনও তাহাই বলেন যথা—The cutaneou. perspiration is liable to be acted on during strong feelings আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চের উৎপত্তি হয়। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। গদ্‌গদ বাক্যকে স্বরভেদ কহে। বিত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য হয় তাহাকে বেপথু বলে। বেপথু শব্দের অর্থ কম্প। বিষাদ ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণের যে বিকার হয় তাহার নাম বৈবর্ণ্য। ইহাতে মালিন্য ও কৃশতা জন্মে। এই বৈবর্ণ্যের অতি সূক্ষ্ম প্রকার ভেদ আছে তদ্‌যথা :—

বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তো ধৌসর্য্যং কালিমাক্কচিৎ।
রোষেতু রক্তিমা ভীত্যা কালিকাক্কাপি শুক্লিমা
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেহপি কুত্রচিৎ
অত্রা সর্ব্বাত্রিকত্বেন নৈবাস্যোদাহৃতিঃকৃতা।

অর্থাৎ বিষাদে শ্বেত ধূসর ও কোন কোন স্থলে কালিমা প্রকাশ পায়, রোষে রক্তিমা, ভয়ে কালিমা ও শুক্লিমা এবং অতিশয় হর্ষে রক্তিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

হর্ষ ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা বিনা প্রযত্নে নেত্রে যে জলোদ্গম হয় তাহার নাম অশ্রু। প্রফেসর বেইন বলেন—Grief and excessive joy cause the liquid to be secreted and poured out. A strong sensibility lodges in the lachrymal organ—the proof of a high cerebral connection

রসশাস্ত্রবিদেরা অশ্রুর ও সূক্ষ্ম প্রকার ভেদ নিরূপিত করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

হর্ষজেহশ্রুণি শীতত্ব মৌষ্ণ্যং রোষাদি সম্ভবে।
সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ রাগ সংমার্জ্জনাদয়ঃ॥

অর্থাৎ হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং ক্রোধাদি জনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অশ্রুতেই নেত্রচাঞ্চল্য ও রক্তিমা ও সম্মার্জ্জনাদি দৃষ্ট হয়। সুখ দুঃখ নিবন্ধন চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম

প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমিনিপতন প্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই সকল কথার প্রমাণ-বচন লিখিত আছে।

এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের গোপন করার চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব সকল যদি স্পষ্টতঃ প্রকাশ না পায়, অথবা উহাদের গোপন সম্ভবনীয় হয় তাহা হইলে উহাকে ধূমায়িতা বলে। ধূমায়িতা ভাব ব্রজভাবিনীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ধূমায়িতার লক্ষণ এই যে :—

অদ্বিতীয়াঃ অমীভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতামতাঃ॥

অপিচ দুই বা তিন ভাব এক কালীন প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহা যদি অতি কষ্টে গোপন করা যায় তবে উহাকে জ্বলিত কহে যথাঃ—

দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যুগপদ্‌যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥

পাশ্চত্য শারীর বিজ্ঞানে Law of Inhibition বা ক্রিয়া-প্রতিরোধের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মের মর্ম্মাভিজ্ঞান জন্মিলে ধূমায়িতা ও জ্বলিতার ক্রিয়াতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ভাবের বেগাতিশয্যে কোনক্রমেই ভাবের বাহ্য প্রকাশ সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না। সেই অবস্থার বিশেষ বিশেষ নাম রসশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। তদ্‌যথা :—

প্রৌঢ়াস্ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চবা যুগপদ্গতাঃ।
সম্বরিতু মশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈ রুদাহৃতা॥

অর্থাৎ তিন চারি অথবা পাঁচটি প্রৌঢ় ভাব এককালীন উদয় হইলে যদি তাহাদের সম্বরণ করা অসম্ভব হয় তবে উহা দীপ্তা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। আবার পাঁচ ছয় অথবা সমস্ত ভাব যদি এককালীন উদিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষায় আরূঢ় হয়, তাহা হইলে তাহাকে উদ্দীপ্তা বলে, তদ্‌যথা :—

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চবা সর্ব্বএববা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥

আবার সাত্ত্বিক ভাব সকল মহাভাবে পরম উৎকর্ষ পাইয়া থাকে।

এই উদ্দ প্ত ভাব সকলই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত নামে কথিত হয়। এই জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার বলেন :—

উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্বএব পরাং কোটীং সাত্ত্বিকাযত্র বিভ্রতি॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির পাঠও প্রায় এই প্রকার তদ্‌যথা :—

উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সুদ্দীপ্তা সন্তি কুত্রচিৎ।
সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষ কোটিমত্রৈব বিভ্রতি।

ইহাই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকৃতি। ভাবের প্রকৃতি ও বিকৃতি জ্ঞান ভাববিচারের প্রধান সাধন। এই সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞান না থাকিলে বৈষ্ণব সাহিত্যে কিছুমাত্র প্রবেশাধিকার জন্মে না। এমন কি বৈষ্ণবের নিত্য ও অবশ্য পাঠ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানিও বোধগম্য হয়েন না সুতরাং এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা আমাদের নিকট অতীব সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমরা অগ্রে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়াছি। ভক্তগণের :মধ্যে কখন কখন শুদ্ধ সত্ত্বের উদ্গম না হইয়াও সাত্ত্বিক ভাবের আভাস পরিলক্ষিত হয়। উহার নাম সাত্ত্বিকাভাস। এই সাত্ত্বিকাভাস চারি প্রকার তদ্‌যথা :—

১। অনুরক্তির ভাবচ্ছায়ায় রত্যাভাস,

২। হর্ষ বিস্ময়াদি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে স্বত্ত্বাভাস,

৩। হর্ষবিস্ময়াদি যখন প্রকৃতপক্ষে অন্তরকে স্পর্শ করে না, কেবল বাহিরকে স্পর্শ করে, তখন উহার নাম নিস্বত্ত্ব,

৪। বিরোধভাব হইতে যে দ্বেষের উদ্ভব হয় উহার নাম প্রতীপ।

এই চারি প্রকার সত্ত্বাভাসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। রত্যা-ভাসের দৃষ্টান্ত যথা :—

(১) বারাণসী নিবাসী কোন ব্যক্তি সন্নাসিসভায় হরিগুণ গান করিতে করিতে পুলকাঙ্কিত হইলেন, এবং অশ্রুজলে তাঁহার গণ্ডদ্বয় সিক্ত হইল। ইহাই রত্যাভ্যাস। দেশ ও পাত্রের বিচারে এখানে প্রকৃত প্রেমময় শ্রীভগবানের কোনও হেতু নাই অথচ রতির এক প্রকার আভাস

এ স্থলে দেখা গেল। ইহাই রত্যাভাস। সত্ত্বাভাসের লক্ষণ এই যে ঃ—

মুদ্বিস্ময়াদেবাভাসঃ প্রোদ্যন্ জাত্যাশ্লথে হৃদি।
সত্ত্বাভাস ইতি প্রোক্তঃ সত্ত্বাভাসভব স্ততঃ॥

অর্থাৎ ভাবাক্রান্ত চিত্ত স্বভাবতঃই শ্লথ। এই শ্লথ চিত্তে হর্ষ ও বিস্ময়াদির যে আভাস প্রকাশ পায় উহাই সত্ত্বাভাস নামে অভিহিত। প্রকৃত হর্ষ ও প্রকৃত বিস্ময়াদির শক্তি ও ক্রিয়ার সহিত এই আভাসের সাদৃশ্য আছে মাত্র কিন্তু ইহার শক্তি ও ক্রিয়া অতি ক্ষীণ। ইহার একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। কোন পুরাণ-পাঠক বলিতেছেন—

মুকুন্দচরিতামৃত প্রসর বর্ষিণস্তেময়া
কথং কথন চাতুরা মধুরিমা গুরুর্বর্ণ্যতাম্।
মুহূর্ত্ত মতদর্থিনো বিষয়িনোঽপি যস্থাননা
ন্নিশম্য বিজয়ং প্রভো দরতি বাষ্পধারাময়ী॥

অর্থাৎ হে মুকুন্দ, তুমি চরিতামৃতবর্ষী। তোমার লীলামাহাত্ম্যের মাধুর্য্য কি করিয়া বর্ণনা করিব? যাহারা একান্ত বিষয়ী, লীলারস শ্রবণে যাহাদের অধিকার নাই, এমন লোকেরাও আমার মুখে তোমার লীলা শ্রবণ করিয়া অশ্রুসিক্ত হইতেছে।

তাৎপর্য্য এই যে বিষয়ী লোকের হৃদয় বিষয়াসক্ত, সুতরাং রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ। এমন হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বোদ্রেকের কোনও সম্ভাবনা নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণে তাহাদের যে নেত্রজল প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উহা প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকার নহে, সত্ত্বাভাস মাত্র। লীলার স্বাভাবিক গুণেই এইরূপ সত্ত্বাভাস উদ্রিক্ত হইয়া থাকে।

এখন নিঃস্বত্ত্বের লক্ষণ বলা যাইতেছে তদ্‌যথা ঃ—

নিসর্গ পিচ্ছিলস্বান্তেঃতদভ্যাস পরেঽপিচ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যাৎ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

অর্থাৎ স্বভাববশতঃ বা অভ্যাসবশতঃ পিচ্ছিল হৃদয়বিশিষ্ট লোকের সত্ত্বাভাস ব্যতিরেকেও কোন কোন স্থলে অশ্রুপুলকাদি দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাহার উপরি কোমল, অথচ অন্তর কঠিন—এমন হৃদয়বিশিষ্ট লোককেই পিচ্ছিলহৃদয়বিশিষ্ট লোক বলে। শ্লথ হৃদয় সেরূপ

নহে। শ্লথ হৃদয়ে স্বভাবতঃই অন্তরে বাহিরে কোমল। কিন্তু পিচ্ছিল-হৃদয়বিশিষ্ট লোক সাত্ত্বিক ভাব দেখাইবার জন্য এক প্রকার অভ্যাস করে, এই অভ্যাসের ফলে ইহারা অশ্রুপুলকাদি প্রকাশ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবের অভিনয় করে মাত্র, বাস্তবিক ইহারা নিঃস্বত্ত্ব। কিন্তু বাহিরে যাহার কোমলতা না থাকে অভ্যাস করিয়াও সে সত্ত্বাভাস দেখাইতে পারে না। এই জন্যই পিচ্ছিলহৃদয়বিশিষ্ট নিঃসত্ত্ব ব্যক্তির দেহেও সত্ত্বাভাসের অলীক ও কল্পিত অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত সত্ত্বাভাস ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবতঃ যাহাদের মন শিথিল ও পিচ্ছিল, কীর্ত্তন-সভায় ও পাঠাদি-সভায় প্রায়শঃই তাহাদের সত্ত্বাভাস পরিলক্ষিত হয়। তদ্‌যথা ঃ—

প্রকৃত্যা শিথিলং যেষাং মনঃ পিচ্ছিলমেববা।
তেষ্বেব সাত্ত্বিকাভাসাঃ প্রায় সংসদিজায়তে॥

ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তনাদি সময়ে কোন কোন ব্যক্তির পুলক ও নেত্রে অশ্রু প্রভৃতি যে ভাবোদ্গম পরিলক্ষিত হয়, তাহা সত্ত্বাভাস বা নিঃসত্ত্ব এই উভয় হেতু হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। সত্ত্বাভাস প্রদর্শন করার জন্য কেহ কেহ এমন অভ্যাসিত, যে তাহার সেই ভাব দেখিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে প্রকৃতই উহার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকারের প্রতীতি হয়। কিন্তু তাদৃশ বিষয়ীর হৃদয়ে সত্ত্বাভাসের এমন কি সত্ত্বাভাসের উদ্রেক হওয়াও অসম্ভব। বলা বাহুল্য যে অভ্যাসবশে নিঃসত্ত্ব ব্যক্তিও ভক্তিরসের এই সকল ভাব অভিনয় করিয়া থাকে। অন্য এক প্রকার আভাস আছে উহার নাম প্রতীপ। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু প্রভৃতিতে ক্রোধ ভয়াদি দ্বারা যে সাত্ত্বিকাভাস হয়, তাহাকে প্রতীপ বলে।

প্রতীপ অপেক্ষা নিঃসত্ত্ব ভাল, নিঃসত্ত্ব অপেক্ষা সাত্ত্বিকাভাস ভাল, সাত্ত্বিকাভাস হইতে রত্যাভাস ভাল। প্রকৃত ভক্তের মধ্যে আভাস নাই। বিষয়ী ব্যক্তিগণের হৃদয়েই ভাবাভাসের উদ্রেক হয়। সত্ত্বাভাস সম্বন্ধে আলোচনার কেবল এই মাত্র প্রয়োজন যে এতদ্দ্বারা প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকার, আভ্যাসজনিত বিকার ও কাল্পনিক বিকার-অভিনয়-বিনির্ণয় করার সুবিধা ঘটে। সাত্ত্বিক বিকার ও সাত্ত্বিক আভাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল।

সাহিত্য দর্পণাদি গ্রন্থের এই প্রকরণের সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই প্রকরণের বিশেষ একটু পার্থক্য আছে। ভক্তিরস সাহিত্যদর্পণের লক্ষ্য নহে। অপিচ সাহিত্যদর্পণকার আরও বলেন ঃ—

বিকারাঃ সত্ত্বসম্ভূতাঃ সাত্ত্বিকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সত্ত্বমাত্রোদ্ভবত্বাত্তে ভিন্না অপ্যনুভাবতঃ॥

সত্ত্বমাত্র হইতে উদ্ভূত সত্ত্বসম্ভূত বিকারই সাত্ত্বিক বিকার। এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। দর্পণকার নিজেও সত্ত্বকে আন্তর ধর্ম্ম বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব যে শ্রম ও পীড়া প্রভৃতি দ্বারাও উৎপন্ন হয় ইহাও লিখিয়াছেন। এই যুক্তি দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইল না। শ্রম দ্বারা ঘর্ম্মের উৎপত্তি হয়, পীড়া দ্বারাও ঘর্ম্মোদ্গম হয় ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু আন্তর ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ দেহে এই সকল ক্রিয়ার প্রকাশই এই সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষ্য। রোগের দ্বারা যে স্তম্ভাদির উৎপত্তি হয় এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক ও আতিদেশিক। শ্রমাদির দ্বারা যে ঘর্ম্মোদগম হয় উহা আন্তর ধর্ম্মসম্ভূত নহে, উহা জড়ীয় শক্তির ক্রিয়ামাত্র। উহাতে আন্তর ধর্ম্মের প্রভাব আদৌ সূচিত হয় না। সুতরাং সাহিত্যদর্পণের এই উক্তি আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল না।

ব্যভিচারী ভাব।

বৈষ্ণবের উপাস্য শ্রীভগবান্—রসিকশেখর—রসরাজ। সুতরাং পরমানন্দময় রসের বিষয় না জানিলে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শনের প্রকৃত মর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শেষ লীলার যে মহারসের অলৌকিকী লীলা প্রকটন করেন, কেবল শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ রায় এই দুই মহা ভাগ্যবান্ প্রিয় পার্ষদ সে লীলার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারা উভয়েই সে তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। রসিক-শেখর শ্রীভগবান্ দিনরজনি যে ভাবসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, যে রসে তাঁহার চিত্ত বিভোর থাকিত, জগতের জীবের পক্ষে সেইরূপ উপাসনা সম্ভবপর না হইলেও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। সেই লীলা পাঠে, সে লীলার

অনুধ্যানে, সে লীলার পরিচিন্তনেও জীব কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু রসশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অধিগম্য না হইলে সেই মহালীলাসাগরের বিন্দু-মাত্রও স্পর্শ করা যায় না। আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত জড়ীয় কণাবৎ জীবের পক্ষে সেই চিন্ময় রসতত্ত্বের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করা বর্ত্তমান অব-স্থায় একান্তই অসম্ভব। জীবের ভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং এ সম্বন্ধে যে দৈন্যোক্তি করিয়াছেন তাহা এই :—

দূরে শুদ্ধ প্রেম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব সৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমে অমৃতেরসিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসিবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেমে সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দসনে,
নিজ ভাব কয়েন বিদিত।

চিদানন্দ রসময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ যে অপকট প্রেমরস-সেবার একমাত্র ফল, সেই রসের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম পরিজ্ঞানের জন্য যত্ন করা বৈষ্ণব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, এবং রসময় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার বিন্দুমাত্র

উপলব্ধির নিমিত্তও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে এই রসশাস্ত্রের আলোচনা প্রয়োজনীয়।

ইতঃপূর্ব্বে সাত্ত্বিক ভাব ও তদ্ভাবাবেশের কথা কিছু বলিয়াছি। এখন ব্যাভিচারী ভাবের কথা বলা যাইতেছে। ব্যাভিচারী ভাবের আলোচনা করিতে হইলে, স্থায়ী ভাবের বিষয় অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। কেন না, ব্যভিচারের লক্ষণ বলিতে হইলেই স্থায়ী ভাবের কথা উল্লেখ করিতে হয়। যথা সাহিত্য দর্পণে ঃ—

বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরণাৎ ব্যভিচারিণঃ
স্থায়িন্যুন্মগ্ন নির্ম্মগ্নাস্ত্রয় স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ

কখন প্রাদুর্ভূত কখন বা তিরোহিত এই প্রকারে যে সকল ভাব স্থায়ী ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে অভিমুখ হইয়া থাকে তাহারাই ব্যভিচারী ভাব। বি+অভি+চর—ণিন্=ব্যভিচারী। অর্থ এই যে বি,—বিশেষ রূপে, অভি,—অভিমুখে, অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে স্থায়ী ভাবের অভিমুখে গতিশীলতা আছে যে সকল ভাবের তাহারাই ব্যভিচারী ভাব। সুতরাং স্থায়ী ভাব কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। সাহিত্যদর্পণ-কার স্থায়ী ভাবের যে লক্ষণা করিয়াছেন তাহা এই ঃ—

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যংতিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবো স্থায়ীতিসম্মতঃ॥

অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবই হউক আর অবিরুদ্ধ ভাবই হউক কোন প্রকার ভাবই যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না তাদৃশ আস্বাদাঙ্কুর কন্দস্বরূপ ভাবই স্থায়ী ভাব নামে অভিহিত।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লক্ষণাও ঠিক্ এইরূপ যথা ঃ—

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাংনয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥

অর্থাৎ হাসাদি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাব এই উভয় জাতীয় ভাব সমূহকে স্বীয় বশে আনিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ী ভাব। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থায়ী ভাবের যে বিশিষ্টতা আছে তাহা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রতিকেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু স্থায়ী ভাব বলেন।

স্থায়ী ভাবের আলোচনা সময়ান্তরে করা যাইবে। এখন যে সকল ভাব কখন আবির্ভূত কখনবা তিরোহিত হইয়া এই স্থায়ী ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপ অভিমুখ হয় সেই সকল ব্যভিচারী ভাবের কথাই অগ্রে বলা যাইতেছে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ঃ—

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥
বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপিতে ॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তিতদ্রূপতাঞ্চতে ॥

অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের প্রতি যে সকল ভাব বিশেষ রূপে অভিমুখ হয়, সেই সকল ভাবই ব্যভিচারী ভাব। ইহারা বাক্য, ভ্রুনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ব্যভিচারী ভাব সকল ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা যায়। স্থায়ী ভাব অমৃত-মহাসাগর। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী সকল উহার তরঙ্গ সদৃশ। উন্মজ্জন ও নিমজ্জন ক্রমে ইহারা এই আনন্দোচ্ছাস মহাসাগরকে সততই বিক্ষোভিত ও তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে এবং ইহারাও স্থায়ী ভাবের রূপ প্রাপ্ত হয়। এই ব্যভিচারী ভাব ৩৩টী, যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ঃ—

নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌচমদগর্ব্বৌ,
শঙ্কা ত্রাসাবেগে উন্মাদাপস্মৃতি তথাব্যাধিঃ,
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা,
স্মৃতিরথ বিতর্ক চিন্তা মতিধৃতরো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ,
ঔগ্র্যামর্ষা সূয়শ্চপল্যঞ্চৈব নিদ্রাচ,
সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমখ্যাতাঃ।

অর্থাৎ নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু আলস্য জাড্য ব্রীড়া অবহিত্থা (আকার গোপন) স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুকতা,

উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তিও জাগরণ, ইহারাই ব্যভিচারী ভাব।

যাহারা প্রচলিত ছন্দে এই ভাবগুলি কণ্ঠস্থ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সহিত দর্পণের পদ্যটীও অভ্যাস করিতে পারেন তদ্‌যথা :—

নির্ব্বেদাবেগ দৈন্যশ্রমমদজড়তা ঔগ্র্যমোহৌ বিবোধঃ।
স্বপ্নাপস্মারগর্ব্বা মরণ মলসতামর্ষ নিদ্রাবহিত্থাঃ॥
ঔৎসুক্যোন্মাদ শঙ্কাঃ স্মৃতিমতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা
হর্ষাসূয়াবিষাদাঃ সধৃতিচপলতাগ্লানি চিন্তা বিতর্কাঃ।

কিন্তু শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি শ্রীব্রজগোপীদের ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনে লিখিয়াছেন গোপীদের ব্যভিচারী ভাবে ঔগ্র্য বা আলস্য নাই। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ঔগ্র্য ও আলস্য শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—হিংসাকর চণ্ডতার নাম ঔগ্র্য, আর শক্তি সত্ত্বেও কার্য্য করার অনুন্মুখতাই আলস্য। এখন নির্ব্বেদ লক্ষণ বলা যাইতেছে, যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

মহার্ত্তি বিপ্রযোগের্ষা সদ্বিবেকাদি কল্পিতং।
স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে॥
অশ্রু চিন্তাশ্রু বৈবর্ণ্য দৈন্য নিশ্বাসিতাদয়াঃ।

অর্থাৎ মহাদুঃখ, বিপ্রযোগ, ঈর্ষা, অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ নিমিত্ত শোচনা এবং নিজ অপনোদন এই সকল কারণ হইতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। এই নির্ব্বেদে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য দৈন্য ও দীর্ঘনিশ্বাসাদি হইয়া থাকে। এই ক্রন্দন, াহিত্যদর্পণে যে প্রমাণ আছে তাহা অপেক্ষা উল্লিখিত প্র [illegible] করি [illegible]ন্দর।

মহাদুঃখ নিবন্ধ [illegible]র্ব্বেদের একটী দৃষ্টান্ত শুনুন :—শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমিত করার জন্য কালীয়হ্রদে নিমজ্জিত হইলেন, তাঁহাতে অনিষ্ট চিন্তা করিয়া গোপীকাকুল আকুল হইয়া শ্রীমতী যশোদাকে বলিলেন, যশোদে আর কেন আমরা এ পাপদেহ ভার বহন করিব? এস আমরাও এই বিষময় কালীয় হ্রদে প্রবেশ করিয়া আত্মদেহ বিনাশ করি।”

বিরহে নির্ব্বেদ।—

মাধব মাধুর্য্য হীন, বৃন্দাবন পুষ্পহীন,
বিশীর্ণ নীরস বৃন্দাবন।
কোথারে প্রাণের ভাই, কোথা কৃষ্ণ রে কানাই,
দেখা দিয়ে রাখরে জীবন্॥
ব্যাকুল বিরহ তান, গাইয়া বিরহ গান,
সুবল মধুপ গেল চলি।
কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ বিরহী জনে,
জীবন কুসুম পড়ে টলি॥

ঈর্ষা হেতু নির্ব্বেদ।—সত্যভামা বলিলেন, "কৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রশংসা শুনা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল।"

সদ্বিবেক হেতু নির্ব্বেদ।—হে ভগবন্, রাজ্য ও ধনগর্ব্বে আমি শ্রীমদান্ধ হইয়াছি। আমার জীবনে ধিক্।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি হইতেও নির্ব্বেদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামী বলেন, নির্ব্বেদ অর্থ স্বাবমানন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় বলেন,—নির্ব্বেদ আত্মধিক্কার। বিদগ্ধমাধব হইতে মহার্ত্তিজনিত নির্ব্বেদের একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে, তদ্‌যথা ঃ—

যস্যোৎসঙ্গ-সুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বীগুরুভ্যস্ত্রপা।
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা সখিতয় [illegible] পরিক্লেশিতাঃ॥
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিত [illegible] ধ্যাসিতঃ।
ধিক্‌ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীব[illegible]

সখি, যাহার কোমল কোল-সুখ-আশে।
ত্যজি গুরু লাজ, বাস কুঞ্জবাসে॥
তোরা সহচরী, পরাণ দোসরী।
কতবা ভোগিলি সে যাতনা-বিষে॥
ছাড়ি গৃহকর্ম্ম, ছাড়ি সতী ধর্ম্ম।
কলঙ্কেতে ঝাঁপ দিনু অনায়াসে॥

এবে সেই শ্যাম, হায় হলো বাম।
ধিক্ পাপ প্রাণ আছে দেহবাসে॥

বিরহে নির্ব্বেদ,—উদ্ধব সন্দেশে—

ন ক্ষোদীয়ানপি সখি মম প্রেমগন্ধো মুকুন্দে।
ক্রন্দন্তীং মাং নিজ সুভাগবতা খ্যাপনায়প্রতীহি॥
খেলদ্বংশী বলয়িনমনালোক্য তদ্ বক্ত্রবিম্বং
ধ্বস্তালম্বা যদহমহহ প্রাণকীটং বিভর্ম্মি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বদনপঙ্কজনিঃস্যন্দিত পদ্য-মকরন্দের আনন্দ প্রবাহটীও এই রূপ যথা :—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ।
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং॥
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা।
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

উপরি উক্ত পদ্যটী প্রভুর পদ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রভু নিজেই বুঝি গ্রন্থকারের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্বীয় ভাব উক্ত কবির হৃদয়ে বিস্তার করিয়া ছিলেন। ইহার অনুবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই আমরা প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যের জন্য পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে যথা :—

দূরে শুদ্ধ প্রেম বন্ধ কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ॥

ঈর্ষা, ইষ্টবস্তু অপ্রাপ্তি নিবন্ধন বিষাদ, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি নিবন্ধন বিষাদ, বিপত্তি ও অপরাধ হইতেও নির্ব্বেদ জন্মিয়া থাকে। প্রারব্ধ

কার্য্যের অসিদ্ধিহেতু বিষাদের একটি দৃষ্টান্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্য অনুসরণ করিয়া বলা যাইতেছে যথাঃ—

সখি, কৃষ্ণ তরে কাঁদে মম মন।
যদিও আমারে বাম, তবু তার গুণগ্রাম
প্রাণ মোর করিছে স্মরণ।
দোষ সোঙরিতে যাই, খুঁজে তাহা নাহি পাই,
নাহি হয় কোপ পরকাশ॥
মোরে কৃষ্ণ পরিহরি, ভজে অন্য ব্রজনারী,
তবু মন যাচে তার পাশ॥

অপরাধজনিত বিষাদের একটী দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা ঃ—

চরণ নখরমণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ে কাঁদে গোকুলচাঁদ॥
লাগল কুদিন মম কয়লু মান।
অব নাহি নিকষয়ে কঠিন পরাণ॥

ব্যভিচারী ভাবের প্রত্যেকটী ভাবের উদাহরণ সহ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। অতঃপরে মধ্যে মধ্যে কোন কোন ভাবের দুই একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইবে।

এখন দৈন্যের সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ঃ—

দুঃখ ত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু দীনতা।
চাটুকৃন্মান্দ্য মালিন্য চিন্তাঙ্গ জড়িমাদিকৃৎ॥

অর্থাৎ দুঃখ ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য জন্মে তাহার নাম দৈন্য। এই দৈন্য চাটু, হৃদয়ের ক্ষুন্নতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তা জন্মে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহালীলাতে ব্যভিচারী ভাব পরিলক্ষিত হয় যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

করি এত বিলাপন প্রভু শচীর নন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক

দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥
যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রাসাথ,
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু মন নেত্র ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥
তাহা হইতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাহা গোপেন্দ্র নন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন।
কাহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন ॥
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন।
উঠিল নানা ভাব আবেগ, মনে হইলে উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে লোভাইতে ॥
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে।

প্রভু এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উদ্বেগ ভাবসূচক একটী পদ্য পাঠ করিলেন। উহার পদ্যানুবাদ শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রিদিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥

উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পুড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঁই পুছেন উপায় ॥

অতঃপর উদ্বেগসূচক আরও একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। তাহার অনুবাদ এই :—

তোমার মাধুরী বল, তাহাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাহা করোঁ কাহা যাঙ, কাহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহতো আপনি ॥"

এইরূপে প্রভুর হৃদয়ে বিবিধ ভাব এক কালে উপস্থিত হইল। পাঠক, বর্ষার আকাশে যখন মেঘমালার উদয় হয়, আর মেঘের উপর মেঘ, তার উপর মেঘ, তার উপর মেঘ, আবার তাহার উপরেও মেঘ,—এইরূপ মেঘে মেঘে আকাশ-পট ঘনীভূত হইয়া উঠে, সে দৃশ্য অবশ্যই দেখিয়াছেন; আবার এক মেঘ নীচ দিয়া আসিতেছে, আর এক মেঘ উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইতেছে, আর অমনি গগন কাঁপাইয়া, ভূতধাত্রী ধরিত্রী ও ভূধর কাঁপাইয়া ভীষণ বজ্রনাদ হইতেছে, তাহাও দেখিয়াছেন। আবার অনন্ত, অপরিসীম, সেই বিশ্ববিপ্লাবী মেঘ হইতে যখন মুষলধারে পলল ধারাপাতে সমগ্র জগৎ পরিপ্লুত হয়, গোষ্পদ-খাদ হইতে নদনদী পর্য্যন্ত যখন সেই জলধারায় পরিপূর্ণ হয়, এবং গ্রাম নগর পাহাড় পর্ব্বত ডুবাইয়া যখন উহার বন্যাধারা প্রবাহিত হয়, তাহাও ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঝটিকাবেগে স্থির সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে কি বিশাল উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাব ধারণ করে তাহাও কেহ কেহ হয়তো প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর মহাভাবের তরঙ্গলীলার কথাও একবার শুনুন। তাঁহার হৃদয় আকাশ অপেক্ষাও অসীম, অনন্ত, উদার ও মহৎ এবং সমুদ্র অপেক্ষাও সুবিশাল ও সুগম্ভীর। সমুদ্রের তরঙ্গ লহরীর সীমা আছে, কবির লেখনীতে তাহার সুবর্ণনাও আছে। কিন্তু শ্রীরাধাভাবে বিক্ষুব্ধ মহাপ্রভুর হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকৃতই বর্ণনার বিষয় নহে। কিঞ্চিৎ আভাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিতে পাওয়া যায়। উহার একটী কথা এই ঃ—

নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষা মর্ষাদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥
মত্ত গজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজ যুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কালে এই যে নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য ঔৎসুক্য চাপল্য রোষ ও অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের এই সকল নাম শুনিতে পাওয়া যায়, রসশাস্ত্র অনুসারে এই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান না হইলে শ্রীগৌর-লীলার কোন কথার মর্ম্মই বুঝা যাইতে পারে না। ইতঃপূর্ব্বে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়াছি। এই অষ্টসাত্ত্বিক ভাব শ্রীগৌরলীলায় ভগবান স্বয়ং প্রকটন করিয়া দেখাইয়াছেন তদ্‌যথা ঃ—

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥

* * *

গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্যমন্য,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

রসশাস্ত্রোক্ত এই সকল শব্দের পরিভাষা না জানিলে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, উহার অধ্যয়ন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশিষ্ট ব্যভিচারী ভাবের পরিভাষার অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। ইহা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-সম্মত।

ব্যভিচারী ভাবের অবশিষ্ট ভাব গুলির কথা বলা যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে নির্ব্বেদ, বিষাদ ও দৈন্যের কথা বলা হইয়াছে। এখন গ্লানি প্রভৃতি অপরাপর ভাবের কথা বলিতেছি।

৪ গ্লানি।—শ্রম ও মনঃ-পীড়াদির জন্য দেহের বলপ্রদ ও পুষ্টিকর পদার্থের ক্ষয়ে যে দুর্ব্বলতা জন্মে তাহারই নাম গ্লানি। ইহাতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা এবং নয়নের চাপল্যাদি; জন্মে।

৫ শ্রম।—পথশ্রম ও নৃত্যাদিজনিত শ্রম বলিয়া অভিহিত।

৬ মদ।—জ্ঞান-নাশক আহ্লাদের নাম মদ। মদ দুই প্রকার, মধুপানজনিত ও কন্দর্পবিকারাতিশয়জনিত। ইহাতে গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন নেত্রঘুর্ণা ও রক্তিমাদি হইয়া থাকে।

৭ গর্ব্ব।—সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় ও ইষ্টলাভাদি দ্বারা অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব কহে। এই গর্ব্বে সোল্লুণ্ঠন, লীলা বশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ দর্শন, স্বাভিপ্রায় গোপন এবং অপরের বাক্য শ্রবণ না করা ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে।

৮ শঙ্কা।—স্বীয় চৌর্য্যাপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রূরত্বাদি হইতে যে আপনার অনিষ্ট দর্শন—তাহারই নাম শঙ্কা। এই শঙ্কায় মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্ নিরীক্ষণ এবং লুক্কায়িত হওয়া প্রভৃতি ব্যাপার ঘটে।

৯ ত্রাস।—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম ত্রাস। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর অবলম্বন, রোমাঞ্চ কম্প স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে।

১০ আবেগ।—যাহা চিত্তে সম্ভ্রম অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরকারী হয় তাহার নাম আবেগ। এই আবেগে প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ এবং শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। প্রিয়োত্থ আবেগ হইতে পুলক, প্রিয়-ভাষণ, চাপল্য এবং অভ্যুত্থানাদি দৃষ্ট হয়।

অপ্রিয়োত্থ আবেগ ইহতে ভূমিপতন, চীৎকার শব্দ ও ভ্রমাদি জন্মে। অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্ত গতি কম্প ও নয়নমুদ্রন ও অশ্রু প্রভৃতি হইয়া থাকে। বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গ আবরণ, দ্রুত গমন ও চক্ষু মার্জ্জনাদি ঘটে। বৃষ্টিজনিত আবেগে ধাবন, ছত্র গ্রহণ ও অঙ্গ-সঙ্কোচনাদি হয়। উৎপাতজনিত আবেগ হইতে মুখ বৈবর্ণ্য বিস্ময় ও উৎকম্পনাদি জন্মে। গজজনিত আবেগ হইতে পলায়ন উৎকম্পন ও পশ্চাৎ নিরীক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। শত্রুজনিত আবেগ হইতে বর্ম্ম শস্ত্রাদি গ্রহণ ও গৃহ হইতে অপসরণ ঘটে।

১১ উন্মাদ।—অতিশয় আনন্দ আপদ ও নিরুৎসাহাদিজনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে।

১২ অপস্মার।—দুঃখোৎপন্ন, ধাতুবৈষম্যাদিজনিত চিত্তের যে বিপ্লব তাহার নাম অপস্মার। ইহাতে ভূমিপতন, ধারণ, আস্ফোটন, ভ্রম, কম্প ফেণস্রাব, বাহুক্ষেপণ, ও উচ্চ শব্দাদি হয়।

১৩ ব্যাধি।—অতিশয় দোষ ও বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যাধি বলে কিন্তু এ স্থলে তদুৎপন্ন ভাবকেই ব্যাধি বলা যায়। এই ব্যাধিতে স্তম্ভ অঙ্গ-শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, এবং গ্লানি প্রভৃতি ঘটে।

১৪ মোহ।—হর্ষ, বিচ্ছেদ-ভয় এবং বিষাদাদি হইতে জাত মনের বোধশূন্যতার নাম মোহ। এই মোহে ভূমিপতন, অবশ-ইন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ ও নিশ্চেষ্টাদি জন্মে।

১৫ মৃত্যু।—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ ঘটে, তাহাব নাম মৃত্যু! ইহাতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহ-বৈবর্ণ্য, অপস্মার ও হিক্কাদি হইয়া থাকে।

১৬ আলস্য।—তৃপ্তি ও শ্রমাদি নিবন্ধন সামর্থ্য সত্ত্বেও কার্য্য অকরণের নাম আলস্য। ইহাতে অঙ্গ মোটন, জৃম্ভা, কার্য্যের প্রতিরোধ, চক্ষুমর্দ্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা নিদ্রা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

১৭ জাড্য।—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ দর্শন এবং বিরহাদিজনিত বিচার-শূন্যতার নাম জাড্য। ইহা মোহের পূর্ব্বাবস্থা ও পরাবস্থা। এই জাড্যে অনিমেষ নয়ন, তুষ্ণীম্ভাব ও বিস্মরণ প্রভৃতি ঘটে।

১৮ পীড়া।—নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞাদি দ্বারা যে অধৃষ্টতা উৎপন্ন হয় তাহার নাম পীড়া। ইহাতে মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন ভূমিলিখন এবং অধোমুখতা প্রভৃতি জন্মে।

১৯ অবহিত্থা।—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অনুভাব সম্বরণ করাকে অবহিত্থা কহে। ইহাতে ভাব প্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্য দিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা ও বাগ্‌ভঙ্গি ঘটে। প্রাচীনদিগের মতে অনুভাবের সঙ্গোপক ভাবকে অবহিত্থা কহে।

২০ স্মৃতি।—সাদৃশ বস্তু দর্শন অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি (জ্ঞান) তাহারই নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রুক্ষেপাদি জন্মে।

২১ উহ।—বিমর্ষ অর্থাৎ হেতু পরামর্শ এবং সংশয়াদি নিমিত্ত যে তর্ক উপস্থিত হয় তাহাকে উহ কহে। এই উহতে ভ্রুক্ষেপ এবং শির ও অঙ্গুলী চালনাদি হইয়া থাকে।

২২ চিন্তা।—অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তি-নিবন্ধন ভাবনার নাম চিন্তা। ইহাতে নিশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প ও দৈন্য প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২৩ মতি।—শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থ নির্দ্ধারণকে মতি কহে। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্য করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তর্কবিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২৪ ধৃতি।—জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তির অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমে মনের পূর্ণতার নামই ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না।

২৫ হর্ষ।—অভীষ্ট দর্শনও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রসন্নতার নাম হর্ষ। ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু মুখ-প্রফুল্লতা, ত্বরা, উন্মাদ জড়তা এবং মোহ প্রভৃতি জন্মে।

২৬ উগ্রতা।—অপরাধ ও দুরুক্তাদি জনিত ক্রোধকে উগ্রতা কহে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসনা ও তাড়নাদি হইয়া থাকে।

২৭ অমর্ষ।—তিরস্কার ও অপমানাদি জন্য অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ।

ইহাতে ঘর্ম্ম শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২৮ অসূয়া।—সৌভাগ্য এবং গুণাদি দ্বারা পরের উন্নতি বিষয়ক দ্বেষই অসূয়া। ইহাতে ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ সকলের দোষারোপ, অপবাদ, বক্র দৃষ্টি ও ভ্রুকুটিলাদি জন্মে।

২৯ চাপল্য।—রাগ ও দ্বেষাদির নিমিত্ত চিত্তের লঘুতার নাম চপলতা। ইহাতে অবিচার, নিষ্ঠুর বাক্য ও স্বচ্ছন্দাচারিতাদি ঘটে।

৩০ নিদ্রা।—আলস্য স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে মীলন অর্থাৎ বাহ্যবৃত্তির যে অভাব তাহার নাম নিদ্রা। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

৩১ তৃপ্তি।—নানা প্রকার চিন্তা ও নানা বিষয়ক অনুভব স্বরূপ নিদ্রার নাম তৃপ্তি অর্থাৎ স্বপ্ন। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিশ্বাস ও চক্ষুর নিমীলন আদি হইয়া থাকে।

৩২ বোধ।—অবিদ্যা মোহ ও নিদ্রাদি ধ্বংস জন্য যে প্রবুদ্ধতা অর্থাৎ জ্ঞানের আবির্ভাব তাহার নাম বোধ।

৩৩ উৎসুকতা।—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন স্পৃহা ও প্রাপ্তি স্পৃহার কাল-বিলম্বের অসহিষ্ণুতার নাম উৎসুকতা। ইহাতে মুখ শোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘ নিশ্বাস ও স্থিরতাদি হইয়া থাকে।

এই ত্রয়ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব কথিত হইল। উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে উক্ত ভাব সকলকে যথাযোগ্য বর্ণন করা কর্ত্তব্য। মাৎসর্য্য, উদ্বেগ দম্ভ, ঈর্ষা, বিবেক, নির্ণয়-বিক্লবতা, ক্ষমা, কৌতুক উৎকণ্ঠা, বিনয় সংশয় ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি যে সকল অতিরিক্ত ভাব আছে তৎসমুদায়কেও পূর্ব্বোক্ত ভাব সকলের অন্তবর্ত্তী জানিতে হইবে। এ কারণে উহাদের আর পৃথক্ উদাহরণ করা হইল না। অসূয়াতে মাৎসর্য্য অন্তর্ভূত আছে। কারণ পর-শ্রীতে দ্বেষ করার নাম মাৎসর্য্য, আর পরগুণে দোষারোপণের নাম অসূয়া সুতরাং মাৎসর্য্য ও অসূয়া এই দুইয়ে পরস্পর ভেদ নাই। অপর বিদ্যুৎতাদি নিমিত্ত সহসা যে ভয় হয় তাহার নাম ত্রাস এবং ঐ ত্রাসে অসহিষ্ণুতার নাম উদ্বেগ। অতএব ত্রাসের মধ্যেই উদ্বেগ অন্তর্ভূত

হইয়াছে। আবার গোপনের নাম অবহিত্থা এবং স্বীয় উত্তমতা প্রকাশের নাম দম্ভ, এই উভয়ই কপটময়, সুতরাং অবহিত্থাতে দম্ভ অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। পরের অপরাধ অসহনের নাম অমর্ষ, পরের উৎকর্ষ অসহনের নাম ঈর্ষা এই উভয়ই অসহ্য স্বরূপ, সুতরাং অমর্ষে ঈর্ষা অন্তর্ভূত হইয়াছে। অর্থ নির্দ্ধারণের নাম মতি, ও মতির নামই নির্ণয়। নির্ণয়ের কারণ বিচার এবং বিচারের নাম বিবেক, সুতরাং নির্ণয়েতে বিবেক অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। অপর হইতে আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞানের নাম দৈন্য এবং অনুৎসাহের নাম ক্লৈব্য, সুতরাং দৈন্যে ক্লৈব্য অন্তর্ভূত আছে। মনের চাঞ্চল্যের নাম ধৃতি এবং সহিষ্ণুতার নাম ক্ষমা, সুতরাং ধৃতির অন্তর্ভূত ক্ষমা রহিয়াছে। কালযাপনে অসমর্থতার নাম ঔৎসুক্য এবং আশ্চর্য্য দর্শনের নাম কুতুক। কোন সময়ে কুতুকও ঔৎসুক্যের কারণ হয়, এ নিমিত্ত ঔৎসুক্যে কুতুক অন্তর্ভূত আছে। ঔৎসুক্যের সূক্ষ্মাবস্থায় নাম উৎকণ্ঠা, সুতরাং ঔৎসুক্যে উৎকণ্ঠাও অন্তর্ভূত আছে। লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা, এ কারণ লজ্জাতে বিনয় অন্তর্ভূত আছে। সংশয় তর্কের অন্তর্ভূত। ধৃষ্টতার পরেই চপলতা হইয়া থাকে, সুতরাং চপলতায় ধৃষ্টতা অন্তর্ভূত আছে।

উক্ত সঞ্চারী ভাব সকলের মধ্যে যে সমুদয় ভাব অন্তর্ভূত আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও সম্বন্ধে পরস্পর ভাব ও অনুভাব হইয়া থাকে। নির্ব্বেদে অসূয়ার যেরূপ বিভাবতা হয়, পুনরায় অসূয়াতে ও নির্ব্বেদের অনুভাবতা যুক্ত হইয়া থাকে। অপর ঔৎসুক্যে চিন্তায় অনুভাবতা এবং নিদ্রায় ঐরূপ চিন্তায় বিভাবত্ব হয়, এইরূপে অন্যান্য ভাবেরও জানিতে হইবে। এই সকল সাত্ত্বিক, তথা নানাবিধ ক্রিয়ার পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব প্রায় লোক ব্যবহার অনুসারেই জ্ঞেয় হয়।

নিন্দায় বৈবর্ণ্য ও অমর্ষ এই দুয়ের বিভাবত্ব, আবার অসূয়াতে ঐ নিন্দার বিভাবতা কথিত হয়। সংমোহ ও প্রলয়ের প্রতি প্রহারের বিভাবত্ব এবং উগ্রের প্রতি ঐ প্রহারের অনুভাবতা, এইরূপ অন্যান্য ভাবকেও জানিতে হইবে। ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, আলস্য মধুপান জন্য মত্ততা, ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবের কোন স্থানে রতি

অনুভাবতা অর্থাৎ রতির কার্য্য হইবে। ঐ ত্রাসাদি ছয়টীর সহিত রতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই কিন্তু উহারা পরম্পরায় লীলার অনুগামী হয়। বিতর্ক মতি নির্ব্বেদ, ধৃতি, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দীনত্ব, সুসুপ্তি ইত্যাদি ভাব সকলের কোন স্থানে রতি বিভাবত্ব হইয়া থাকে। এই প্রকরণ মনস্তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম তথ্যপূর্ণ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনুবাদ মাত্র এস্থলে গ্রহণ করা হইল।

ভাবালঙ্কার।

সমুদ্র-তরঙ্গের অন্ত আছে, কিন্তু রসময়ী ব্রজগোপীগণের রসসমুদ্র-তরঙ্গের সংখ্যা করা অসম্ভব। শ্রীল স্বরূপ বলিতেছেন যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

অষ্ট সাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধচকিত॥
এত ভাব ভূষায় শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণের মন॥

ইতঃপূর্ব্বে অষ্ট সাত্ত্বিক ও হর্ষাদি ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যভিচারী ভাবের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাবের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব নায়িকার ভাবালঙ্কার। যাহা দ্বারা শোভা সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম অলঙ্কার। ভাবোদ্গম ভিন্ন নায়িকাদেহের প্রকৃত শোভা অসম্ভব। কাষ্ঠপুত্তলিকা রত্নমণ্ডিত হইলেও ভাবুকের চক্ষে তাহা প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না, সে অলঙ্কার অলঙ্কার বলিয়াই বোধ হয় না। নায়িকার প্রকৃত অলঙ্কার,—হীরা মণি মুক্তা বা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার নহে,—ভাব ভূষণই তাঁহার প্রকৃত অলঙ্কার। সাহিত্য-দর্পণকারের মতে এই অলঙ্কারের সংখ্যা কুড়িটী। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থেও আমরা এই বিংশতি প্রকার

অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু এই গ্রন্থে বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সাহিত্যদর্পণ ও শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি হইতে এই বিংশতি ভাবের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব প্রকরণে বিংশতি অলঙ্কারের আলোচনা করা হইয়াছে। অনুভাব তিন প্রকার—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর (নীবি ও উত্তরীয় ভ্রংশনাদি সপ্ত) এবং বাচিক (আলাপাদি দ্বাদশ।) এস্থলে অলঙ্কারের সংখ্যা-গণনায় সাহিত্যদর্পণ ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির শ্লোক-বিন্যাস প্রায় একই রূপ, সুতরাং আমরা শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্‌যথা ঃ—

যৌবনে সত্ত্বজা স্তাসামলঙ্কারস্তু বিংশতিঃ।
উদয়ন্ত্যদ্ভুতাং কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ॥
ভাবো হাবশ্চ হেলাচ প্রোক্তাস্তত্র স্ত্রয়োঙ্গজাঃ।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা॥
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈবস্যুরযত্নজা।
লীলা বিলাসোবিচ্ছিত্তি বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্॥
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতংতথা।
বিকৃতঞ্চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ॥

যৌবনাবস্থায় কামিনীগণের সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার বিংশতি। কিন্তু কান্তের প্রতি সর্ব্ব প্রকার অভিনিবেশহেতু ঐ সকল অলঙ্কার সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উক্ত নায়িকাদিগের যৌবনাবস্থায় কান্তের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে অভিনিবেশ জন্য যে সকল সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার উদিত হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতি। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা এই তিনটী অঙ্গজ। আর শোভা, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদাস্য ও ধৈর্য্য এই সাতটী অযত্নজ অর্থাৎ শোভানিমিত্ত বেশাদি প্রযত্নের অভাবে স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর লীলাবিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশটী স্বভাবজ, অর্থাৎ নায়িকাদিগের স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। এখন ইহার প্রত্যেকের আলোচনা করা যাইতেছে যথা ঃ—

১ ভাব।—প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া॥

উজ্জ্বল রসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়ী ভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে যে প্রথম বিক্রিয়া হয় তাহারই নাম ভাব। এ সম্বন্ধে আরও একটী প্রাচীন প্রমাণ-বচন আছে, তাহা এই :—

চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদি বিকারবৎ॥

অর্থাৎ বিকারের কারণ সত্ত্বে যে অবিকৃতি তাঁহারই নাম ভাব। বীজের আদি" বিকৃতি যেমন অঙ্কুর, তেমনই সত্ত্বের আদি বিকৃতির নাম ভাব।

২ হাব।—গ্রীবারেচক-সংযুক্তো ভ্রূণেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদিবৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে।

ইহা গ্রীবাতির্য্যক্‌করণ ভ্রূনেত্রাদি প্রকাশক এবং ভাব হইতে ঈষৎ প্রকাশক।

৩ হেলা।—হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার সূচকঃ।
হাব স্পষ্টরূপে শৃঙ্গার সূচক হইলে তাহাকে হেলা বলা যায়।

৪ শোভা।—সা শোভারূপ ভোগাদৈ র্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্
রূপ ও ভোগাদির দ্বারা অঙ্গের বিভূষণের নাম শোভা।

৫ কান্তি।—শোভৈব কান্তিরাখ্যাতামন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।
শোভা মন্মথের-বৃদ্ধি নিবন্ধন উজ্জ্বলা হইলে উহাকে কান্তি বলে।

৬ কান্তি।—কান্তিরেব বয়োভোগ দেশকাল গুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তাচেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥

বয়স ভোগ দেশ কালও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অত্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহারই নাম দীপ্তি।

৭ মাধুর্য্য।—মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা॥
সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা সমূহের চারুতাকেই মাধুর্য্য বলে।

৮ প্রগল্‌ভতা।—নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা।
প্রয়োগ বিষয়ে নিঃশঙ্কতার নাম প্রগল্‌ভতা।

৯ ঔদার্য্য ।—ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ।
সর্ব্বাবস্থগত বিনয়কে ঔদার্য্য বলে!

১০ ধৈর্য্য।—স্থিরা চিত্তোন্নতি র্যাতু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।
স্থিরা চিত্তোন্নতির নামই ধৈর্য্য।

১১ লীলা।—ক্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।
রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা যে ক্রিয়ার অনুকরণ, তাহার নাম লীলা।

১২ বিলাস।—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মাণাং।
তৎকালীকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসং প্রিয়াসঙ্গজম্।

গতিস্থান আসন মুখনেত্রাদির কর্ম্মসমূহের প্রিয়সঙ্গমজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যের নাম বিলাস।

১৩ বিচ্ছিত্তি।—আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিতি কান্তিপোষকৃৎ।
বেশ-রচনা অল্প হইয়াও যদি দেহ-কান্তির পুষ্টি সাধন করে, তাহার নাম বিচ্ছিত্তি। কেহ কেহ বলেন প্রিয় ব্যক্তি অপরাধ করিলে ঈর্ষা ও অবজ্ঞান্বিতা উত্তমা স্ত্রীলোকের সখী-প্রযত্নেই যেন অলঙ্কার সকলের ধারণ হয়, এমত স্থলে উহাও বিচ্ছিত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে যথাঃ—

সখী যত্নাদিরধ্বতির্মণ্ডলানাং প্রিয়াগসি।
নের্ষাবজ্ঞা বরস্ত্রীভির্ব্বিচ্ছিত্তিরিতিকেচন॥

১৪ বিভ্রম।—বল্লভ প্রাপ্তি বেলায়াং মদনাবেশ সম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমোহার মাল্যাদি ভূষাস্থান বিপর্য্যয়ঃ॥

বল্লভ প্রাপ্তিকালে প্রবল মদনাবেশ বশতঃ হারমাল্যাদির অযথা স্থানের ধৃতির নামই বিভ্রম। অপিচ কেহ কেহ বলেন কৌটিল্যের আতিশয্য-প্রযুক্ত সেবাশীল কান্তের প্রতি অভিনন্দন না করার নাম বিভ্রম। যথা ঃ—

অধীনস্থাপি সেবায়াং কান্তস্যানভিনন্দনম্।
বিভ্রমো বামতোদ্রেকাৎ স্যাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন॥

১৪। কিলকিঞ্চিত ভাবটী অতি সুন্দর। এইজন্য এ সম্বন্ধে একটু সবিস্তার আলোচনা করা যাইতেছে। চরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

রাধা দেখি কৃষ্ণে যদি ছু ইতে করে মন।
দান ঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন॥

যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গাম।
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার প্রমাণ বচন এই ঃ—

গর্ব্ববিলাস রুদিতস্মিতাসূয়া ভয় ক্রুধাং।
শঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটী ভাব যদি হর্ষহেতু এককালীন প্রকটিত হয় তবে উহাকে কিলকিঞ্চিত বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার এইরূপ ঃ—

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্ট ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয়॥
গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত।
ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দ স্মিত॥
নানাস্বাদু অষ্ট ভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন॥
দধিখণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।
এলাচি মিলনে যৈছে রসাল মধুর॥
এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটী গুণ॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি হইতে একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা ঃ—

ময়াজাতোল্লাসং প্রিয় সহচরি লোচন-পথে
বনান্তস্তে রাধা কুচমুকুলয়োঃ পাণিকমলে
উদঞ্চ ভ্রূভেদং সপুলকমবষ্টম্ভিবলিতম্
স্মরাম্যন্তস্তস্যাঃ স্মিতরুদিত কান্তদ্যুতিমুখম্।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন ঃ—

শুন প্রাণ সখে একদা নিকুঞ্জে
সখীগণ সহ শ্রীরাধা আমার।

দেহ আবরণ করি উন্মোচন
আছিলা বসিয়া কি কহিব আর॥
মনের উল্লাসে আবেগের বশে
দিনু অকস্মাৎ তার বক্ষে কর।
প্রেয়সী অমনি পুলকে আকুলা
হইয়া ভ্রুভঙ্গ করিল সত্বর॥
ফিরাইল মুখ হইল নীরব
বসিল ঘুরিয়া অমনি তখন।
হাসি হাসি মুখে সহসা কি ভাবে
মিশে গেল যেন অধীর রোদন॥
সে যে কি সুন্দর ভাবের লহরী
বিদ্যুতের মত ভাবের স্ফুরণ।
এখনও মনে পড়িছে সে মুখ
এখনও মনে পড়িছে নয়ন॥

এই উদাহরণে ভ্রুভঙ্গ হেতু অসূয়া আর ক্রোধ, পুলকে অভিলাষ তির্য্যকভাবে স্তব্ধ হওয়ায় গর্ব্ব, ঈষৎ পরাবৃত্ত ভাবে ভয়, এবং হাস্য ও রোদন এই সাতটী এককালে প্রকটন হইল অথচ হর্ষই ইহার মূল। ইহাই কিলকিঞ্চিত।

কেবল অঙ্গ স্পর্শন জন্য যে কিলকিঞ্চিত হয়, তাহা নহে বর্ত্ম রোধেও কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইহার যে দৃষ্টান্তটী শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে ধৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সেই উদাহরণটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্‌যথা :—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃকুঞ্চতী
রুদ্ধায়া পথি মাধবেন মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ংবঃ ক্রিয়াৎ॥
দানকেলিকৌমুদী।

অর্থাৎ একদিন শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটে বসিয়া ব্রজবধূগণের আগমনের

প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ পথ দিয়া শ্রীরাধা দধির ভাণ্ড লইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, হ্যাদে তুমি দধি বিক্রয় করার জন্য যাইতেছে, ইহার শুল্ক দিবে না? ইহাই বলিয়া পথের দুই দিকে পা দিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শ্রীরাধার অন্তর-হাসিতে নয়ন উজলিয়া উঠিল, কিন্তু চক্ষের পক্ষ্ম-সকল অশ্রুজলে ভিজিয়া গেল, চক্ষুর প্রান্তে লাল রেখা দেখা দিল, রসিকতায় নয়ন সিক্ত হইল, উহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত ও কুটিল হইল এবং নয়নের তারা উর্দ্ধ দিকে উঠিল। শ্রীরাধার এই কিলকিঞ্চিত স্তবক-বিশিষ্ট দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। এই পদ্যটী দানকেলি-কৌমুদী নাটকেব নান্দী শ্লোক।

ইহার তাৎপর্য্য এই যেঃঅন্তঃস্মের শব্দে অন্তর-হাস্য, জলকণায় রোদন চিহ্ন, পাটলবর্ণ (শ্বেতরক্তিমা) দ্বারা ক্রোধ, রসিকতউৎসিক্ততা দ্বারা অভিলাষ, কুঞ্চিত চিহ্ন দ্বারা ভয়, উত্তার ও কুটিল নয়ন দ্বারা গর্ব্ব ও অসূয়া এই সাতভাব সূচিত হইয়াছে। কবি এখানে এক দৃষ্টিতেই সাতটী ভাবের সঙ্কীকরণ দ্বারা কিলকিঞ্চিত স্তবক দৃষ্টির অতি দুর্ল্লভ ও সুন্দর উদাহরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ফলতঃ প্রাণের ভাষাগুলি নয়নেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলিয়া থাকে Eye is the miror of our mind. অর্থাৎ নয়নই মনের দর্পণ। মনে যে সকল ভাব খেলা করে, নয়নে সেই সকল ভাবই প্রতিবিম্বিত হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহাশয়ের শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থেও কিল-কিঞ্চিতের একটী দৃষ্টান্ত আছে। তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা ঃ—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতম্
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা
দানন্দং তমবাপ কোটি গুণিতং যোঽভূদ্গিরাং গোচরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পথ রোধ করিলেন, তাহাতে শ্রীমতীর নয়ন

রোদনে বাষ্প ব্যাকুলিত হইল, ক্রোধে নেত্র প্রান্ত অরুণিত হইল, ভয়ে চঞ্চল হইল, গর্ব্বে রসোল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, অভিলাষে হেলার উদয়ে অধর চঞ্চল হইল, অসূয়ায় ভ্রুকুটী দেখা দিল, অথচ তাহাতে মৃদুহাস্যও মিশিয়া পড়িল। শ্রীমতীর এই কিলকিঞ্চিত ভাবযুক্ত বদন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বাক্যের অগোচর এবং সঙ্গম-সুখ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক।

১৬ মোট্টায়িত।—কান্ত স্মরণ-বার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমবিলাসস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে।

কান্তের স্মরণবার্ত্তাদি শ্রবণে তদ্বিষয়কস্থায়ী ভাবের ভাবনা নিবন্ধন হৃদয়ে অভিলাষের প্রাকট্যের নাম মোট্টায়িত।

১৭ কুট্টমিত।—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপিসম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ।

স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃদয়ের প্রীতি হইলেও বাহির যদি ক্রোধের প্রকাশ হয়, উহাকে কুট্টমিত বলে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শ্লোকটী শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে দ্রষ্টব্য। এখানে অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। সম্ভোগের পর পুনঃ সম্ভোগে প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী বলিতেছেন ঃ—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর,
ওহে অঘহর এ কিগো রঙ্গ;
চঞ্চল উদ্ধত তোমার ও কর
খুলিছে কবরী কেন নিরন্তর॥
যা হয়েছে বেশ, কেন পুন রসাবেশ,
ক্ষীণ তটিনীতে উঠে কি তরঙ্গ।
ওহে নিরদয় কঠিন হৃদয়।
ছি ছি একি শ্যাম, একি রসোদয়,
পড়ি পদতলে ক্ষম দাসী বলে।
ঘুমভারে দেখ বিবশ অঙ্গ॥

১৮ বিব্বোক।—ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকস্যাদনাদরাঃ।
'গর্ব্ব ও মান নিমিত্ত কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি অনাদরের নাম বিব্বোক।

১৯ ললিত।—বিন্যাসভঙ্গি রঙ্গানাং ভ্রূবিলাস মনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্।

যাহাতে অঙ্গ সকলের বিন্যাসভঙ্গি, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায় তাহারই নাম ললিত।

২০ বিকৃত।—হ্রীমানের্ষাদিভির্যত্রলোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ

অর্থাৎ লজ্জামান ঈর্ষা ইত্যাদি দ্বারা যে স্থলে কথিত অর্থ প্রকাশ পায় না তাহাকে বিকৃত বলে। ভাবালঙ্কার অনন্ত, রসতরঙ্গ অশেষ, লেখকের চিত্তবৃত্তি সঙ্কীর্ণ ও মলিন। সুতরাং এ সম্বন্ধে এবার এই পর্য্যন্তই নিবেদিত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্বরূপ ও শ্রীবাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায় শ্রীল স্বরূপের মুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কিলকিঞ্চিত ভাব-ভূষণের কথা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন এবং প্রেমভরে শ্রীস্বরূপকে আলিঙ্গন করিয়া অন্যান্য ভাব ভূষণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তদ্‌যথা ঃ—

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন॥

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের নিকট বিলাসাদি ভাবভূষার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন যথা ঃ—

বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
সেইভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥
তবে ত স্বরূপ গোসাঞী কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা।

প্রকৃত পক্ষে ভক্তগণের শ্রুতিসুখ ও শিক্ষা লাভের জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দ্বারা এই সকল তত্ত্ব প্রকটিত করেন। বিলাস ভূষণাদির লক্ষণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে কয়েকটী লক্ষণ লিখিত হইয়াছে এখানে পুনশ্চ সেই সকল পয়ারের উল্লেখ করা গেল না। ফলতঃ এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা বা সংখ্যা করা প্রকৃতই অসম্ভব ব্যাপার। শ্রীল স্বরূপের মুখে রথযাত্রার সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় ভক্তগণ এই রসতত্ত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন শ্রীল স্বরূপ শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের ভাববৈভবের কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন :—

এইমত আর সব ভাব বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ-মন॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥

শ্রীল স্বরূপের কথা শুনিয়া শ্রীবাস একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন শ্রীপাদ, আপনার ব্রজগোপীদের সম্পদের কথা তো শুনিলাম, কিন্তু এ সকলের সহিত আমার লক্ষ্মীর সম্পদের তুলনা হইতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদ্—কুসুম-কানন, কিশলয়, গিরিধাতু, ময়ূরপাখা আর গুঞ্জাফল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই রাজপুরীর এত বৈভব-বৈচিত্র্য ছাড়িয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেই তরুলতা ফলফুলময় শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন কেন? ইহাতে [illegible]র উদয় হইল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ বিস্তর॥
বৃন্দাবনের সম্পদ কেবল পুষ্প কিশলয়।
গিরিধাতু শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাফলময়॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হলো অসোয়াথ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥

তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র ফল ফুললোভে গেলা পুষ্প বাড়ী॥

ফলতঃ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্তের পত্র ফল ফুলে যেমন পরিতুষ্ট আর কিছুতেই তাঁহাকে তিনি সন্তুষ্টনহেন। অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাব লতাপাতা ফুল ফল ও শিখিপুচ্ছতেই সুপ্রকটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শ্রীভগবদ্গীতাতে তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞাই এই যে :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো যে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যোপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ

অর্থাৎ সংযতাত্ম ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যে পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, আমি সাদরে সেই সকল গ্রহণ করি।

শ্রীবৃন্দাবনেই অনন্ত মাধুর্য্যলীলা প্রকটিত। সুতরাং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনই অতি প্রিয় স্থান। কিন্তু দ্বারকা-লক্ষ্মীর মনে তাহাতে বড় দুঃখের উদয় হয়। এত বৈভব, এত সম্পদ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোরাখালসেব্য তৃণ-লতাপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে ধাবিত হয়েন কেন? দ্বারকা-লক্ষ্মীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন প্রীতি সহিতে পারেন না। কাজেই তাঁহাদের ক্রোধ হয়। শ্রীবাস বলিলেন "শ্রীপাদ গোপললনাদের ঐশ্বর্য্য কোথায়? ঐশ্বর্য্য থাকিলেই না অহঙ্কার হয়? তাঁহাদেরই আদৌ ঐশ্বর্য্য নাই, অহঙ্কার আসিবে কোথা হইতে? লক্ষ্মীর অহঙ্কার হইবারই কথা। কেননা, তিনি ঐশ্বর্য্যশালিনী। আমার রমাদেবীর অহঙ্কার দেখুন" এই বলিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দশম অঙ্কে :—

অস্যাঃ পশ্যত ভো মদস্য মহিমা দাসীকুলেনেশ্বরী
পর্ব্বোৎসেকমদোদ্ধুরেণ যদমী বধ্বা কটীরোধসি।
মুখ্যাএব জগৎপতেঃ পরিজনাঃ প্রত্যেক মাকর্ষতা
পাত্যন্তে স্ব নিজেশ্বরী পদপুরঃ প্রাপয্য চৌরা ইব॥

ভৃত্যাপরাধে স্বামিনো দণ্ড ইত্যেব শ্রুতম্। ইদন্তু তদ্বিপরীতমেব-ত্যহো অত্যদ্ভুতং।

শ্রীবাস শ্রীল স্বরূপকে বলিতেছেন, শ্রীপাদ, লক্ষ্মীর অহঙ্কার গৌরব একবার দেখুন, ইঁহার দাসীরাও অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়াও।সাক্ষাৎ জগৎপতি জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিজনদিগের প্রত্যককে চৌরের ন্যায় কটিতটে বান্ধিয়া নিজেশ্বরীর পদপ্রান্তে নিপাতিত করিতেছেন। ভৃত্যের অপরাধে স্বামীর দণ্ডের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এ যে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এ সম্বন্ধে পয়ার এইরূপ ঃ—

"এই করি কহে "কাহায় বিদগ্ধ শিরোমণি।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি॥"
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটি বস্ত্র বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি জোড় হাত॥
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥
তবে লক্ষ্মী শান্ত হয়ে যান নিজ ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর॥
দুগ্ধ আউটি দধিমথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন সিংহাসনে॥

ইহা শুনিয়া শ্রীল স্বরূপ একটু হাসিলেন, হাসিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত তোমার লক্ষ্মীর বৈদগ্ধ্য দেখ, এই অচেতন রথের কি অপরাধ! কিন্তু ভৃত্যগণ ইহাকেও তাড়না করিতেছেন। অপরন্তু "শ্রীভগবান সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন আমি নিকটেই যাইতেছি" এই কথা শুনিয়াই বা বিচিত্র দীর্ঘ কোপের কি প্রকারে শান্তি হইল? "ফলতঃ তোমার লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ প্রকৃতই অদ্ভুত! এরূপ অত্যাশ্চার্য্য অদ্ভুত ক্রোধ জগতে আর কোথাও কখনও দেখা যায় নাই।

যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ঃ—

অচেতনস্যাস্য রথস্য কোবা
মন্তু কথং তাড্যতে এষ ভৃত্যৈঃ।
যাস্যাম্যদূরেঽহমিতীশ্বরেণ
প্রোক্তে কথং বাঽশমি দীর্ঘকোপঃ॥

ইহা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন "শ্রীপাদ, ঈশ্বরীর একরূপই রীতি।"

শ্রীবাস ও শ্রীল স্বরূপের রসময়ী উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিয়া সর্ব্বমীমাংসক-চূড়ামণি, সর্ব্বজ্ঞ, পরমবিদগ্ধ মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীবাস তুমি নারদ, সুতরাং শ্রীভগবানের দ্বারকা-বিলাস তোমা অতীব প্রিয়। শ্রীল স্বরূপ ব্রজের রসে সুরসিক। কেন না ইনি শ্রীব্রজলীলার ললিতা সখী। শ্রীব্রজপুরীর আনন্দ-বৈদগ্ধ্যই উহাঁর অতি আদরের পদার্থ।" শ্রীচৈতন্য-চরিঅমৃতের পয়ার এইরূপ,ঃ—

নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস॥
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব।
ঐশ্বর্য্যভাব তোমার ঈশ্বর প্রভাব।
দামোদর স্বরূপ ইহা শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্যে না জানে ইহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসি॥

রসময় প্রভু রসকন্দল এক কথাতেই মীমাংসা করিয়া দিলেন। শ্রীবাস কৃতার্থ হইলেন। রসময় স্বরূপ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি স্বয়ং যে রসে নিমজ্জিত, স্বয়ং যে রসের ভাণ্ডার এবং স্বয়ং যে রসের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্যপ্রভাবকে সেই রসে নিমজ্জিত করাই তাঁহার কার্য্য। সুতরাং শ্রীল স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন-সম্পদের প্রভাব বর্ণনা করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

স্বরূপ কহে শ্রীবাস! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন সম্পদ বুঝি নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ তার এক বিন্দু॥

শ্রীল স্বরূপ এই বলিয়া শ্রীবাসকে ব্রহ্ম-সংহিতায় এক বচন পাঠ করিয়া শুনাইলেন, যথা ঃ—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো ।
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্
কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয় সখি
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপিচ ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার এইরূপ পদ্যানুবাদ আছে যথাঃ—

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাহা ধনী তাহা বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তা মণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ-ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাহা সাহাজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কাম ধেনু যাহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজে লোকের কথা যাহা দিব্য গীত।
সহজে মন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী যিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ॥

অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজসুন্দরীগণই পরমালক্ষ্মী এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, বৃক্ষ সকলই—কল্পবৃক্ষ; ভূমিই—চিন্তামণিগণময়ী; জলই—অমৃত; কথাই—গান; গমনই—নাট্য, বংশীই—প্রিয় সখী; এবং চিদানন্দরূপ বস্তুই—জ্যোতিঃ স্বরূপ।

শ্রীল বিল্বমঙ্গলও বলেন ঃ—

চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাম্
শৃঙ্গার পুষ্পতরব স্তরবঃ সুরাণাম্

বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু—
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধু রহো বিভূতিঃ।

অহো শ্রীবৃন্দাবনের কি সুখসিন্ধুময় বিভূতি! এখানে অঙ্গনাগণের চরণভূষণই—চিন্তামণি, বেশ বিন্যাসের সামগ্রী সাধক তরুগণই কল্পতরু এবং ধেনুগণই কামধেনু।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে রসস্বরূপ স্বরূপের রসসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। শ্রীবাস তখন সে রসমাধুর্য্য-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হইলেন। তিনি সেই তরঙ্গ রঙ্গে নাচিতে লাগিলেন, কক্ষতালি বাজাইয়া অট্টহাসির তুমুল রবে সকলকেই প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। স্বয়ং প্রভুও আবেশে শ্রীরাধার বিশুদ্ধ রসতত্ত্ব শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর মন বুঝিয়া স্বরূপ গান ধরিলেন, প্রভু তখন ভাবে আরও বিভোর হইয়া "বোল্ বোল্" বলিয়া স্বরূপের সেই সুধামাখা গান শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিলেন। স্বরূপ তখন ব্রজরসের গান ধরিলেন, আর অমনি প্রভু মধুরভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। স্বরূপের গানে আর মহাপ্রভুর নৃত্যে মূর্ত্তিমান্ ব্রজরস উথলিয়া উঠিল। সে গানের ও নৃত্যের প্রেমপ্রবাহে চারিদিক ভাসিয়া গেল, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করন শ্রীবাস।
কক্ষ তালি বাজায়ে করে অট্ট অট্ট হাস।
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল।
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
"বোল বোল" বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ॥
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥

প্রিয় ভক্ত পাঠক, এই চিত্রটী একবার মানসিক নয়নে অবলোকন করুন,—স্বরূপ গাইতেছেন আর মহাপ্রভু নাচিতেছেন! কি গাইতেছেন—না ব্রজরসের গীত। ব্রজরস কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবে না,

ব্রজগোপীদের ভাব-ভূষণাদি সকলই চিদানন্দময়—তাঁহাদের ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহাদের রসের গীত স্বরূপ গাইতেছেন—আর মহাপ্রভু নাচিতেছেন,—এ নৃত্য তাণ্ডব নৃত্য নহে—এ মধুর নৃত্য—ব্রজরসের ও ব্রজভাবের নৃত্য। লক্ষ্মী-বিজয় হইয়া গেল, লক্ষ্মীদেবী মন্দিরে গেলেন কিন্তু ভাবসিন্ধু গোরাচাঁদের নৃত্য ভাঙ্গিল না। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রভুর নৃত্য থামিল না। চারিদিকে চারি সম্প্রদায়ে গান করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রান্ত হইলেন কিন্তু প্রভুর শ্রান্তি নাই, ক্রমেই প্রেমাবেশ বাড়িয়া উঠিল, স্বরূপের রসময় সঙ্গীত প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে রাধাভাবে বিভাবিত করিয়া তুলিল। প্রভু শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নাচিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়া প্রভু মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। কেন না, নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ বলরাম, আর প্রভু এখন শ্রীরাধা ভাবে আবিষ্ট। কিন্তু তথাপি প্রভুর আবেশময় নৃত্য থামিল না। নিত্যানন্দ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ—

চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥
রাধা প্রেমাবেশে প্রভু হৈল সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি॥
নিত্যানন্দ জানি প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে কিছু রহে দূরদেশ॥

কিন্তু এ দিকে বেলা অবসান প্রায়, প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নাই। তাঁহার আবেশ ভাঙ্গিল না, সুতরাং কীর্ত্তন থামিতেছে না, শ্রীমন্নিত্যানন্দ এই অবস্থায় প্রভুকে ধরিয়া তাঁহার আবেশ ভাঙ্গাইয়া থাকেন, কিন্তু প্রভু এখন শ্রীরাধার ভাবাবেশে আবিষ্ট, শ্রীমন্নিত্যানন্দ এ অবস্থায় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীল স্বরূপ দেখিলেন এখন কোন উপায়ে কীর্ত্তন বন্ধ করাই আবশ্যক, তিনি নানা প্রকার ইঙ্গিত করিয়া মহাপ্রভুর দৃষ্টি ভক্তগণের দিকে আকৃষ্ট করিলেন, সহসা প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল, তিনি তখন ভক্তগণকে শ্রান্ত

দেখিয়া নৃত্য ত্যাগ করিলেন এবং সকলকে লইয়া পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে সভক্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক স্নান সমাপন হইল। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে লক্ষ্মীবিজয়ে মহাপ্রভু মহামহোৎসব করিয়া ভক্তগণকে ব্রজরস বিতরণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীল স্বরূপের মুখে ভক্তগণ সমক্ষে রসময় রসিকশেখর ব্রজের যে আনন্দলীলা রসের চিদানন্দ তত্ত্ব প্রকটন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মানন্দ অতি তুচ্ছ পদার্থ। আমরা এই প্রসঙ্গে মহাজনগণের লিখিত রস-তত্ত্বের দুই একটী বর্ণ মাত্র উচ্চারণ করিয়া এত দিন আত্ম দেহ মন ও রসনা পবিত্র করার প্রয়াস পাইয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু কোন কথাই ব্যক্ত করিতে পারি নাই, সে সাধ্য বা সে সাহসও আমাদের নাই। ব্রজের রস-তত্ত্ব অসীম ও অনন্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বরূপের দয়া ও ছোট হরিদাস।

শ্রীব্রজরসের প্রসঙ্গে শ্রীল স্বরূপের মুখে ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রসসিদ্ধান্তের তত্ত্বনিবহ শ্রবণ করান। পূর্ব্বে বলিয়াছি—সকল রসসিদ্ধান্তের বিবৃতি একে ত মানবীয় ভাষাতেই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করা অসম্ভব, তার পরে আমাদের ন্যায় মলিন জীবের পক্ষে আদৌ উহা ধারণার বিষয় নহে। বিবৃতি তো দূরের কথা, গুণময় দেহধারী এবং সেই দৈহিক ক্রিয়াবিকারাদির নিত্যদাসের পক্ষে চিদানন্দ ব্রজরসের উপলব্ধি অসম্ভব ব্যাপার। তবে যে এই সকল বিষয়ের নাম করা হয়, জীবের উচ্চতম ভজন প্রণালীর স্মৃতিসঞ্জীবন করাই তাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, এখন আমাদের প্রাণের স্বরূপের সম্বন্ধে অপরাপর কথার

কিছু কিছু বলা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিয়া আনেন। শ্রীল স্বরূপ উহা পাঠ করিয়া উহাতে সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস দোষ দেখিতে পান এবং এইজন্য ব্রাহ্মণকে কিছু কৃপাবাগ্‌দণ্ড প্রদান করেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছি রসময় স্বরূপের প্রাণে কঠোরতার লেশমাত্রও ছিল না। সাধারণ বৈষ্ণবের হৃদয়েই কঠোরতার লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না, মধুরতার খনি, প্রেমমূর্ত্তি স্বরূপের হৃদয় তো অমৃতরসের উৎস। তিনি উক্ত গ্রন্থলেখক মহোদয়ের প্রতি কৃপা প্রকাশের জন্যই এবং তাঁহার সবিশেষ হিতসাধনের জন্যই প্রথমতঃ একটী প্রকৃত কথা বলিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপের হৃদয়ে অনুক্ষণ দয়া ও মাধুর্য্যের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইত, তিনি জীবের ক্লেশ দেখিলে ব্যাকুল হইতেন। শ্রীল স্বরূপের দয়ার একটি কাহিনী প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীভগবান আচার্য্য মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগের উদ্যোগ করিতেন। এক দিবস তিনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয় ছোট হরিদাসকে শিখিমাহিতীর ভগ্নীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর ভোগের জন্য শুক্ল তণ্ডুল আনিতে আদেশ করেন। শিখিমাহিতীর ভগ্নীর বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহাতী তিন, তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধ জন॥

শিখিমাহাতীর ভগ্নী বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরম বৈষ্ণবী। মহাপ্রভু স্বয়ং ইহাকে শ্রীরাধিকার গণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হরিদাস এই মাধবী দেবীর নিকট হইতে শুক্ল তণ্ডুল আনিয়া শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহাশয়কে

প্রদান করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সেই তণ্ডুলের অন্ন দেখিয়া তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, এমন সুন্দর তণ্ডুল কোথা পাইলে" আচার্য্য বলিলেন— "শিখি মাহিতীর ভগ্নী মাধবীর নিকট হইতে তণ্ডুল আনা হইয়াছে।" অন্তর্য্যামী প্রভু বলিলেন "কে আনিয়া দিল?" সরল চিত্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্য, প্রভুর এইরূপ প্রশ্নের গূঢ় অভিসন্ধির বিন্দুমাত্রও মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে বলিলেন, "ছোট হরিদাস"। প্রভু আর কিছুমাত্র না বলিয়া অন্নের প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন—

আজ হৈতে আমার এই আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥

হরিদাস গোবিন্দের মুখে প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। কি কারণে প্রভু এইরূপ কঠোর আদেশ করিলেন, প্রভুর একান্ত ভক্ত হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কোনও ভক্ত ইহার কারণ জানিলেন না। কিন্তু ছোট হরিদাসের প্রতি এই কঠোর আজ্ঞা প্রচারিত হওয়ায় সকলেই বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ শুনিলেন, ছোট হরিদাস প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া তিন দিবস অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া কেবল হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ রব করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেছেন। ছোট হরিদাসের এই আর্ত্তির কথা শুনিয়া দয়াময় স্বরূপের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোট হরিদাসের দ্বার-মানা হইল কেন? তাহার অপরাধ কি? আজ তিন দিন হইল এই আজ্ঞা শুনিয়া সে উপবাসী আছে। প্রভুর দর্শন বিনা যে জন জল গ্রহণ করে না, তাহার প্রতি এরূপ আদেশ হইল কেন?"

শ্রীল স্বরূপের কথা শুনা মাত্রই প্রভু অমনি উত্তর করিলেন "হরিদাস বৈরাগী, বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতি সম্ভাষণ করে আমি তাহার মুখ দেখি না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনের মন॥
ক্ষুদ্র জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

প্রভু এই বলিয়া বিরক্ত ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার অভিন্নাত্মা স্বরূপ তাঁহার এই ভাব দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

ছোট হরিদাস কখন কোন্ প্রকৃতির (নারীর) নিকট যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানেন না, ইতঃপূর্ব্বে ইহা কেহ কখনও শোনেন নাই। সুতরাং সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন শ্রীভগবান আচার্য্যের ঘরে প্রভু যে শুক্ল তণ্ডুলের সম্বন্ধে এত প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং মাধবী দেবীর নিকট হইতে শুক্ল তণ্ডুল কে আনিল, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ছোট হরিদাসের বর্জ্জন বোধ হয় তাহারই ফল। কেননা ছোট হরিদাসই মাধবী দেবীর নিকট হইতে শুক্ল তণ্ডুল চাহিয়া আনেন। কিন্তু ইহাতে প্রভুর এত ক্রোধ হওয়ার কারণ কি? সম্ভবতঃ হরিদাসের অন্যান্য ত্রুটিও থাকিতে পারে। কেহ কেহ মনে করিলেন বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বুঝি প্রভু হরিদাসের প্রতি এইরূপ গুরুতর কঠোর আদেশ প্রচার করিয়া অপর সকলের শিক্ষা প্রদান করিলেন। কেন না জগতে মানুষের যত রিপু আছে, কামুকত্ব অপেক্ষা প্রবলতম রিপু মানুষের আর নাই। সুতরাং সংসারত্যাগী ভগবন্নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ যাহাতে ইন্দ্রিয়-প্রলোভনীয় বস্তু অপেক্ষা দূরে বাস করেন ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। সুতরাং কোন একটী সূত্র ধরিয়া তিনি সাধক বৈষ্ণবদিগকে সবিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন।

ফলতঃ ইহা লইয়া কয়েক দিবস মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে সবিশেষ আলোচনা চলিতে লাগিল! কিন্তু সমুদ্র-গম্ভীর মহাপ্রভুর প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারিলেন না। প্রভুর ভাব দেখিয়া একথা কেহ সহসা তাঁহার নিকট আবার উপস্থিত করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু

হরিদাসের আর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহারা অগত্যা একদিন পুনরায় প্রভুর নিকট এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন "প্রভো, হরিদাসের অপরাধ অতি অল্প, ভবিষ্যতে এমন অপরাধ আর হইবে না। হরিদাস তোমার চরণাশ্রিত এবার তাহাকে ক্ষমা কর। তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আমাদের সকলের অনুরোধে এবার হরিদাসকে ক্ষমা করিতেই হইবে।"

কিন্তু গম্ভীর হৃদয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্তগণের এ অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমার মন আমার বশে নহে, আমি ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করিলেও মনে হয়,—হরিদাস ক্ষমার যোগ্য নহে। তোমরা বৃথা কথা বারে বারে আর বলিও না, আমি প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর মুখ দেখিব না।" ইহার পরেও কোন কোন ভক্ত মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমরা আবার এই অসঙ্গত অনুরোধ করিলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা॥

এই কথা শুনিয়া সকলেই কাণে হাত দিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, সকলেই বুঝিলেন হরিদাসের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, এ ভাঙ্গা কপাল বুঝি আর জোড়া লাগিবে না।

এইরূপে কয়েকদিন চলিয়া গেল। এ দিকে ছোট হরিদাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, দিবারাত্র কেবল "হা গৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম লইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখশশী নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িল। পরম দয়াল বৈষ্ণবগণ হরিদাসের এই আর্ত্তি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, প্রভু হরিদাসকে যে আর গ্রহণ করিবেন না, হরিদাসের অপরাধের যে আর

ক্ষমা নাই তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন, হরিদাসের কথা তুলিতে প্রভু যে প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন তাহাও তাঁহারা প্রত্যক্ষই দেখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় প্রভুর নিকট এই কথা পুনর্ব্বার উপস্থিত করিতে আর কেহই সাহসী হইলেন না। কিন্তু হরিদাসের আর্ত্তি নির্ব্বেদ, বিষাদ ও দৈন্য দেখিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহারা সকলে যুক্তি করিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রভু যাহাতে হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হয়েন এজন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করার নিমিত্ত শ্রীল পরমানন্দপুরীকে বলিলেন। পুরীগোসাঞি বৈষ্ণবগণের অনুরোধে সম্মত হইয়া একক প্রভুর নিকট গমন করিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীকে প্রভু মান্য করেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরীগোসাঞি বলিলেন, "বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিলাম ছোট হরিদাসের সামান্য অপরাধে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছ, তুমি নাকি তাঁহার মুখ দেখিবে না। তাহাকে ক্ষমা কর, ইহা সকল বৈষ্ণবেরই ভিক্ষা। তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হও, আমারও এই অনুরোধ।"

প্রভু কখনও পরমানন্দপুরীর বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু ছোট হরিদাসের কথা উত্থাপন হওয়া মাত্রই প্রভু অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, পুরী গোসাঞি, আপনি এই সকল বৈষ্ণব লইয়া এখানে থাকুন, আজ্ঞা করুন গোবিন্দকে লইয়া আমি আলালনাথে যাই। কিছুতেই আমি ছোট হরিদাসের মুখ দেখিব না।" এই বলিয়া প্রভু পুরীগোসাঞিকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন এবং গোবিন্দকে ডাকিয়া প্রস্থান করিলেন। পরমানন্দপুরী দেখিলেন, বৈষ্ণবগণের অনুরোধে তিনি প্রকৃতই এক মহা কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি অতি ব্যস্তে মহাপ্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন "থাক্, এ অনুরোধ আর করিব না, তুমি ঘরে ফির, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তুমি ঈশ্বর, তোমার লীলা আমরা কি বুঝিব, আর তোমার বিধানের উপর আমাদের কথাই বা কি? তুমি যাহা কর, সকলই লোকের হিতের জন্য। তোমার কথার উপরে আমাদের কথা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, আর এমন অন্যায় অনুরোধ করিব না। এখন

ঘরে চল!” প্রভু ফিরিলেন। এইবার ভক্তগণের সকল আশাই ফুরাইল। তাঁহারা বুঝিলেন আর কোন ক্রমেই হরিদাসের প্রতি প্রভুকে প্রসন্ন করা যাইবে না। সুতরাং এখন হরিদাসকে প্রবোধ দেওয়া ও সান্ত্বনা দেওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় রহিল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দয়ার দুগ্ধ-ধারায় স্বরূপের হৃদয় পরিপূর্ণ। স্বরূপ তখন হরিদাসের নিকট যাইয়া তাঁহার সান্ত্বনা করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্বরূপ বলিলেন “হরিদাস, জান ত আমরা সকলেই তোমার হিতৈষী। তোমার জন্য তাঁহাকে যতদূর বলিবার তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তো কাহারও অধীন নহেন,—তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। এখন তিনি কাহারও কথা শুনিতেছেন না, কিন্তু সময়ে অবশ্য তাঁহার দয়া হইবে, তখন তিনি তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন। তুমি এমন ভাবে পড়িয়া থাকিলে আর কি হইবে। স্নান ভোজন কর, দেহ রক্ষা কর, অবশ্যই কোন সময়ে প্রভুর কৃপা হইবে।”

হরিদাস স্বরূপের কথা এড়াইতে পারিলেন না। উঠিলেন, স্নান করিলেন, আহার করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র না দেখিয়া হরিদাস কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না। কুলটা গৃহবধূ যেমন প্রণয়ী জনের মুখখানি দেখিবার জন্য নানাস্থানে দঁড়ায়, নানা চেষ্টা করে, হরিদাসও দূর হইতে মহাপ্রভুর বদন-শশী দেখিবার জন্য সেইরূপ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু জগন্নাথ দর্শন করার জন্য যখন যাতায়াত করিতেন, হরিদাস সেই সময়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়া উকিঝুঁকি দিয়া সতৃষ্ণ ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের বদনখানি নিরীক্ষণ করিতেন, আর অমনি তাহার দেহ আনন্দে অবশ হইয়া পড়িত, নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত হইত, চক্ষু মুছিয়া ফিরিয়া চাহিয়া আর শ্রীগৌরাঙ্গরূপ দেখিতে পাইতেন না। হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় ফিরিতেন, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন রজনী অতিবাহিত করিতেন।

হরিদাস এইরূপে নীলাচলে এক বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যেও তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না। তিনি দুঃসহ গৌরবিরহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন শেষ রাত্রিতে

মনে মনে শেষ-অভিপ্রায় স্থির করিলেন। উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। আর কাহাকে কোন কথা না বলিয়া শেষ রাত্রিতেই প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিবারাত্র চলিতে চলিতে হরিদাস অল্প সময়েই প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ উপেক্ষিত দেহ আর রাখিবেন না। একদিবস তিনি প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমস্থলে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তিসঙ্কল্প করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-পদযুগল ভাবিতে ভাবিতে ত্রিবেণীর প্রসন্ন সলিলে গুণময় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। প্রভু হরিদাসের যে দেহ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, হরিদাস অবলীলাক্রমে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণের আরাধ্য দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু এবার তাঁহার প্রিয় ভৃত্যকে অভয় দিলেন। হরিদাস দিব্য গন্ধর্ব্ব দেহ লাভ করিয়াছিলেন, সে দেহ জন-সাধারণের চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য। তিনি রাত্রিতে গান করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতেন, কিন্তু তাহা অপরের শ্রুতিগোচর হইত না।

একদিন রসিক-শিরোমণি মহাপ্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাস কোথা, তাহাকে একবার এখানে ডাক দেখি।" একজন বলিলেন "প্রভো হরিদাস আপনার বিরহে এক বর্ষকাল দুঃখ কষ্টে এখানে ছিল। এক বৎসর পরে এক দিবস শেষ রাত্রিতে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না।" ইহাতে প্রভু একটু হাসিলেন। প্রভুর এ হাঁসি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যে হরিদাসের কথা প্রভু একটী বারও জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ স্বীয় শ্রীমুখে হরিদাসের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল হরিদাসের কথা বুঝি প্রভুর মনে পড়িয়াছে। তাঁহার প্রতি প্রভু বুঝি প্রসন্ন হইয়াছেন। কিন্তু যখন হরিদাসের সন্ধানের কথা কেহ বলিতে পারিল না, তখন প্রভুর দুঃখ প্রকাশ করাই উচিত ছিল। অথচ তিনি তাহা না করিয়া একটু হাসিলেন, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

একদিন ভক্তগণ সমুদ্র-স্নানে যাইতে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বরূপ জগদানন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর ও কাশীশ্বরের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সহসা ইঁহারা আকাশ-পথে গান শুনিতে

পাইলেন। সে গান ও কণ্ঠস্বর তাঁহাদের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল,—কে গায় আই! কেহ বলিলেন কই মানুষ কোথায়, স্বরটী যেন আকাশ হইতে আসিতেছে। অপর জন বলিলেন স্বরটী অতি পরিচিত—যেন ঠিক ছোট হরিদাসের কণ্ঠস্বর। গোবিন্দ ইহার পরে ঠিক সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, "এ স্বর হরিদাসের। তাহাতে কিছুমত্রে সন্দেহ নাই। দুঃসহ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে হরিদাস সম্ভবতঃ বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকিবে। যদিও আমরা উহার আকার দেখিতেছি না কিন্তু উহার কণ্ঠের স্বর শুনিহে পাইতেছি।"

গোবিন্দের কথায় বাধা দিয়া সিদ্ধান্তি-শিরোমণি স্বরূপ বলিলেন, গোবিন্দ তোমার এ অনুমান নিতান্তই মিথ্যা। যে আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছে, প্রভুর সেবা করিয়াছে, যে প্রভুর একান্ত কৃপাপাত্র, আর এই শ্রীক্ষেত্রে যাহার মৃত্যু তাহার কি কখনও দুর্গতি হয়। এ সকলই প্রভুর ভঙ্গী; এ খেলা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভু কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রেতে মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি যে হয়।
মহাপ্রভুর ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়॥

শ্রীল স্বরূপের এই সিদ্ধান্তে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর ভঙ্গী জানিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস যখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তি কামনা করিয়া ত্রিবেণীতে দেহ ত্যাগ করেন এই বৈষ্ণব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে আসিয়া হরিদাসের এই অলৌকিক দেহ ত্যাগের কথা শ্রীবাসের নিকট বলেন। শ্রীবাসাদি সকলেই ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বর্ষান্তরে শিবানন্দ সেন ও শ্রীবাস প্রভৃতি গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতেন। সেবারও সকলে শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। শ্রীবাসের মনে কেবল এক কথা,—যেই তিনি প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পাইবেন, আর অমনি ছোট হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রভুর চরণ-দর্শন-প্রাপ্তি মাত্রই শ্রীবাস ঈষৎ ব্যগ্র ভাবে

জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো, ছোট হরিদাস কোথায়?" প্রতিভাবান্ প্রভু অমনি উত্তর করিলেন "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ লোক স্বকর্ম্ম ফলভোগ করে।

শ্রীবাস তখন প্রয়াগের বৈষ্ণবের মুখে হরিদাসের দেহ-ত্যাগের যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন প্রভুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিবার সময়ে মনে করিয়াছিলেন প্রভু বুঝি এই কঠোর নিগ্রহের জন্য অনুতপ্ত হইবেন। কিন্তু প্রভুর হৃদয়ে ভাব অলৌকিক। তাঁহার হৃদয় বজ্র হইতেও সুকঠিন, আবার কুসুম হইতেও সুকোমল। প্রভু হাসিয়া বলিলেন "ঠিক হয়েছে। বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি দর্শন করিলে তাঁহার এইরূপ প্রায়শ্চিত্তই হয়ে থাকে!"

ত্রিবেণীতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তির কামনায় হরিদাসের দেহ-ত্যাগের কথা শ্রীল স্বরূপ শ্রীবাসের মুখে শুনিয়া ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আকাশে যে গান শুনিয়াছিলে তাহা মনে আছে কি? ভক্ত কখনও প্রভু ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রভুও স্বীয় ভক্তকে দীর্ঘকাল দূরে রাখিতে পারেন না। হরিদাস দিব্যদেহে প্রভুর পার্শ্বে আসিয়াছে।" ইহাতে ভক্তগণের মধ্যে এক আনন্দের রোল উঠিল।

এই বিরহ-বিধুর হরিদাসের মহাপ্রভু মিলনে কৃপাময় স্বরূপের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এই এক লীলায় প্রভু অনেক শিক্ষা প্রকটন করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটী করণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্ত আত্মসাত।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচসাত॥
মধুর চৈতন্য লীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥

দয়াময় স্বরূপ তাই বলিয়াছিলেন "বিষপানে হরিদাসের অপমৃত্যু হইয়াছে, এরূপ মনে করিও না, তাদৃশ কৃপাপাত্রের পক্ষে উহা অসম্ভব। তবে অচিরেই প্রভুর ভঙ্গী জানিতে পারিবে।" ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা

রসজ্ঞ শ্রীস্বরূপের বাক্যের গূঢ় বাক্যের মর্ম্ম ভক্তগণ অচিরেই বুঝিতে পারিলেন। এই লীলা অতি অদ্ভুত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিয় তর্কে হয় বিপরীত॥

ফলতঃ এই চিন্ময়ী লীলা জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞানের দুরবগাহ। পরন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত এই লীলা শ্রবণ করিলে শুদ্ধ ভক্তি লাভ ও জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

বিংশ অধ্যায়।

স্বরূপ ও বিদ্যানিধি।

শ্রীল স্বরূপের চরিত্র বর্ণন করিতে হইলে তাঁহার বন্ধুর চরিত্রও অবশ্য বর্ণনীয়। সমপ্রকৃতিক না হইলে বন্ধুত্ব হয় না। কাহারও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানিতে হইলে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুর চরিত্রের অনুসন্ধানে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। শ্রীল স্বরূপের পূর্ব্বাশ্রমের বন্ধুর নাম শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ১১শ অধ্যায়ে—

পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম।
প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম॥

* * *

দামোদর স্বরূপ তাহান পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা॥

* * *

নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদর স্বরূপের বড় প্রিয় পাত্র॥
দুই জনে জগন্নাথ দেখে এক সঙ্গে।
অন্যোন্যে থাকেন কৃষ্ণ রস কথা রঙ্গে॥

কি সুন্দর বন্ধুতা! বহুদিন পরে শ্রীক্ষেত্রে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। বিদ্যানিধি প্রেমনিধি নামে অভিহিত হইয়াছেন। রসনিধি ও প্রেমনিধির আজ সম্মিলন হইল। সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র ও নীলাচলচন্দ্র। চন্দ্র-দর্শনে আজ দুই সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। একের তরঙ্গে অপরের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। দুই জনে একত্র মহাপ্রভু দর্শন করেন, দুইজনে একত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন এবং কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে দিন যামিনী অতিবাহিত করেন। জীবের ভাগ্যে এরূপ বন্ধু-সহবাস প্রকৃতই দুর্ল্লভ। এ সুখ বৈকুণ্ঠ সুখ হইতেও বুঝি অধিকতর বাঞ্ছনীয়। শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বন্ধুত্ব চিন্ময়জগতের এক মহা আকর্ষণ। স্বরূপ যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন তখন হইতেই শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহিত তাঁহার বন্ধুতা। শ্রীল স্বরূপের জন্মভূমি কোথায়, তাহার নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। শ্রীল বিদ্যানিধির সহিত প্রথমতঃ কোন্ স্থানে বন্ধুতা হয় তাহাও জানিবার হেতু নাই। শ্রীল স্বরূপ চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন কিনা, প্রচলিত বৈষ্ণব ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহোদয়ের নিবাস যে চট্টগ্রামে ছিল, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত স্পষ্টতঃই বলিতেছেন :—

এবে শুন বিদ্যানিধির আগমন।
পুণ্ডরীক নাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥

শ্রীবিদ্যানিধি সময়ে সময়ে নবদ্বীপেও থাকিতেন। নবদ্বীপেও তাঁহার বাসা ছিল। শ্রীল বিদ্যানিধির নৈষ্ঠিকী ভক্তি ও শতদগ্ধ-স্বর্ণ-সমুজ্জ্বল অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম বিষয়-সম্ভোগের ছদ্ম আবরণে লুক্কায়িত থাকিত, লোকে তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিত না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ-সমক্ষে বিদ্যানিধির যে পরিচয় প্রদান করেন তাহাতে তিনি বলেনঃ—

চাটিগ্রামে আছেন এথায়ও বাসা আছে।
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে॥

তানে ঝাট কেহই চিনিবারে না পারিবা।
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান মাত্র সে করিবা॥

ফলতঃ শ্রীল বিদ্যানিধি প্রেমভক্তির মহানিধি হইয়াও বিষয়ীর ন্যায় বিচরণ করিতেন। ভোগবিলাস ও বিষয়ভোগের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া লোকে তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে প্রয়াস পাইত না। এমন কি স্বয়ং শ্রীগদাধরও প্রথমতঃ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। ইহাও অসম্ভব নয় যে সময়েই তাঁহার সহিত স্বরূপের (পুরুষোত্তমাচার্য্যের) বন্ধুতা ঘটিয়াছিল।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিন্ন হৃদয়, সুতরাং যিনি স্বরূপের বন্ধু তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরও বন্ধু ইহা স্বতঃসিদ্ধ। স্বয়ং মহাপ্রভুর বিরহ-ক্লেশ তাঁহার ভক্তগণের পক্ষে যেমন অসহ্য, আবার অপর পক্ষে প্রিয়তম ভক্তের বিরহও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পক্ষে তেমনই দুঃসহ। ইহাই লীলাময়ের লীলামাধুর্য্য,— ইহাই লীলারহস্য। শ্রীল বিদ্যানিধি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কত প্রিয়বন্ধু, তাহ আমরা স্বীয় কল্পনায় কিছু বলিব না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি॥

এই ক্রন্দন কাহিনী অতি বিচিত্র। মহাপ্রভু একদিন নৃত্য করিয়া উপবেশন করিলেন, আর সহসা শ্রীবিদ্যানিধির কথা তাঁহার মনে হইল। শ্রীল বিদ্যানিধি তখন চট্টগ্রামে। ভাবের মহাসাগর শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় যেমন গম্ভীর আবার সময়ে সময়ে প্রায় তেমনই চঞ্চল। সমুদ্র স্বভাবতঃ অতি স্থির, আবার বায়ু-সন্তাড়নে সেই স্থির জলধিতে যখন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন সে সমূদ্রের ভাব আবার সম্পূর্ণই বিপরীত।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের গুণগানে নাচিতে ছিলেন, নাচিতে নাচিতে বসিয়া পড়িলেন, নৃত্যতরঙ্গে তরঙ্গায়িত শ্রীগৌরসাগর যেন স্থির ও শান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এ স্থিরতা ও শান্তভাব অতি অল্পক্ষণেই অন্যভাবে পরিণত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখকমল পরিম্লান হইল, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘ

নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন। বিরহিণী যেমন আপন প্রিয়জনের বিরহে তাহাকেস্মরিয়া স্মরিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, তিনি সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে শ্রীগৌরের আজ এমন হইল কেন? তখন তিনি হৃদয়ের বেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তিনি আবেগ-বিহ্বলা কোমলহৃদয়া রমণীর ন্যায় চীৎকার করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন "পুণ্ডরীক রে, আর মোর বাপ্‌রে, আমার প্রাণের বান্ধব রে, তোমার আবার কবে দেখ্‌ব রে—আরে আমার বাপ্‌রে"—শ্রীগৌর সহসা এইরূপ বিনাইয়া বিনাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীল বিদ্যানিধির জন্য ধীর, গম্ভীর, অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যপ্রতিভাশালী শ্রীনিমাই পণ্ডিত কান্দিয়া এমন আকুল হইলেন কেন? লোকের কি আর বন্ধু-বিরহ হয় না? জগতে তো এমন করিয়া আর কাহাকেও এইরূপ কারণে কাঁদিতে দেখা যায় না। প্রভু আমার প্রেমময়। প্রিয়জনের বিরহে প্রেমিক হৃদয়ে যে আবেগের উদয় হয়, তাহা চাপিয়া রাখা অসম্ভব। প্রভুর হৃদয় প্রেমের সাগর। বিরহ-বাত্যায় সে সাগরে যে তরঙ্গ লহরী প্রবাহিত হয়, প্রেমের গোষ্পদখাতে তাহা প্রত্যক্ষ হইবার নহে। শ্রীল বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদরের বন্ধু, স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সুতরাং শ্রীল বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্তবন্ধু। কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য(স্বরূপ) মহাপ্রভুর সহিত তখন সুন্দররূপে পরিচিত হয়েন নাই, শ্রীল বিদ্যানিধির সহিত শ্রীল পুরুষোত্তমে বন্ধুত্ব আছে কিনা, জগতে যখন ইহাও অপ্রকাশিত, তখনও শুদ্ধভক্ত মহাপ্রেমিক শ্রীল বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভু অতি প্রিয় ভক্তবন্ধু বলিয়াই মনে করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়বন্ধু এই শ্রীল বিদ্যানিধির সহিতই স্বরূপের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল; শ্রীল স্বরূপ দামোদর যে মহাপ্রভুর প্রকৃতই দ্বিতীয় স্বরূপ এ ঘটনাটিও তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

মহাপ্রভুর ভক্তবন্ধু-বিরহে এইরূপ ব্যাকুলতা অনেক স্থলেই বর্ণিত আছে। শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ১৯শ সর্গেও স্বরূপের অদর্শনে মহাপ্রভুর এইরূপ ব্যাকুলতার বর্ণনা করিয়াছেন।

উহার মর্ম্ম এই যে মহাপ্রভু গৌড়ে যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রভুর ইচ্ছা—স্বরূপ গাইবেন, আর তিনি নিজেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে জগন্নাথের নিকট গৌড়ে যাইবার বিদায় চাহিবেন, এই মনে করিয়া শেষ রাত্রিতে প্রভু পথে যাইয়া স্বরূপের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈববশতঃ স্বরূপ সেই সময়ে মিলিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার জন্য প্রভুর আর উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি সিংহদ্বারে বসিয়াঃ স্বরূপ-দামোদরের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে—

গায়ং গায়ং গমিষ্যামি জগন্নাথং বিলোকিতুম্।
দামোদরোঽসৌ মৎসঙ্গে গায়ন্ স্থাস্তি নিশ্চিতম্॥
ইত্যসৌ রজনী শেষে প্রথমাবসন্নং বিভোঃ
নিজকীর্ত্তন সংহর্ষে গচ্ছন্ পথি বভৌ প্রভুঃ
দৈবাদ্দামোদরঃ সোঽহয়ং মিলিতোনাভবৎতদা।
সিংহদ্বারে ক্ষণং তস্থৌ তমপেক্ষ্য স্বয়ং প্রভুঃ॥

এই উপলক্ষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

ভাবাভাবাভিভাবাভিভবভাবে বভৌ ভবঃ
বিভাবেমন্তাবভাবে বভুবভূবি বৈভবম।

উল্লিখিত শ্লোকটী দ্ব্যক্ষর চিত্রকাব্য। ইহার পদচ্ছেদ, অন্বয় ও ব্যাখ্যা মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অর্থ এই যে স্বরূপ-দামোদরের অভাবজনিত বিরহে মহাপ্রভু ব্যাকুল হইলেন। ইহাতে স্বরূপদামোদরের জন্ম সফল এবং মহাগৌরবময় হইল। ফলিতার্থ এই যে যাঁহার বিরহে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ব্যাকুলতা জন্মে, তাঁহার জন্মই গৌরবময়। সুতরাং বিদ্যানিধির জন্য মহাপ্রভুর বিরহ-বিলাপে শ্রীল বিদ্যানিধির জন্ম সফল ও গৌরবময় হইয়াছিল।

শ্রীল স্বরূপের প্রিয়বন্ধু প্রেমনিধি শ্রীল পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির নিমিত্ত সদ্যঃপুত্র-শোকাকুল জননীর ন্যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। প্রভু কাহার জন্য এরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছেন, ভক্তগণ তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সময়ে সময়ে রোদন

করিয়া থাকেন, পুণ্ডরীক নাম শুনিয়া তাঁহারা প্রথমতঃ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই বুঝি বা প্রভুর এইরূপ রোদনের কারণ। কিন্তু প্রভু শুধু পুণ্ডরীক বলিয়া রোদন করিতেছেন না। তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বলিয়া রোদন করিতেছেন। সুতরাং ভক্তগণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেননা, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নাম তাঁহারা জানিতেন না। কিন্তু সকলেই বিচার করিয়া এটুকু বুঝিলেন যে প্রভু তাঁহার কোন প্রিয় ভক্তের জন্যই এইরূপ ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে-ছেন। প্রভু রোদনে একান্ত বিভোর। কাজেই তাঁহাকে তখন কেহ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহার রোদন থামিল, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন্ ভক্তের জন্য কাঁদিতেছ, খুলিয়া বল ; তুমি যাঁহার জন্য রোদন কর, তাঁহার জন্ম সফল, তিনি ধন্য।" তাঁহার কথা শুনিলে আমরাও ধন্য হইব। ভক্তগণের প্রার্থনায় প্রভু শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মুখোদিত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-চরিত্র এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে ঃ—

প্রভু বলে তোমরা সকলে ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাহার আখ্যান॥
পরম অদ্ভুত তান সকল চরিত্র।
তার নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র॥
বিষয়ীর প্রায় তান সব পরিচ্ছদ।
চিনিতে না পারে কেহ তিনি যে বৈষ্ণব॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম স্বধর্ম্ম সর্ব্বলোক অপেক্ষিত॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জাতিতে ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত, অথচ ব্রাহ্মণত্ব-নিষ্ঠ, তিনি লোকাপেক্ষাত্যাগী উদাসীন বৈষ্ণব ছিলেন না। শ্রীল বিদ্যানিধি লোকাপেক্ষা রাখিতেন, সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতেন, অথচ অন্তরে অন্তরে সর্ব্ববিষয়েই জনক রাজার ন্যায় নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি বিষয়ীর ন্যায় বিচরণ করিতেন, বিষয়ীর ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার

সাংসারিক ব্যবস্থা অতি ভাল ছিল। সে পরিচয় পরে প্রকাশ করা যাইবে। ফলতঃ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-প্রবাহ সততই তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিত, তিনি ভক্তির জাহ্নবী-প্রবাহে সততই ভাসিয়া বেড়াইতেন। তাই প্রভু বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রুকম্প পুলকে বেষ্টিত কলেবর ॥

তাঁহার বৈধিভক্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার গুণখ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগঙ্গার প্রতি তাঁহার ভক্তি প্রকৃতই অদ্ভুত। লোকে পবিত্রতার জন্য গঙ্গাস্নান করে কিন্তু পরম ভক্ত শ্রীল বিদ্যানিধি গঙ্গাস্নান করিতেন না। দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন করিতেন না। গঙ্গার প্রতি এত ভক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যানিধি গঙ্গাস্নান করিতেন না কেন, এবং দিবাভাগেই বা গঙ্গাদর্শন করিতেন না কেন, তাহার কারণ প্রভুর শ্রীমুখের বাক্যেই শুনুন :—

গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ ভয়ে।
গঙ্গার দর্শন করেন নিশার সময়ে ॥
গঙ্গায় যে সর্ব্বলোক করে অনাচার।
কুল্যাদি দন্তধাবন কেশ-সংস্কার ॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনোব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥

গঙ্গায় স্নান করিলে পাদস্পর্শ হইবে। গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মসনাতনী, সেই গঙ্গাদেহে পাদস্পর্শ হইবে, বিদ্যানিধি এই জন্য গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিতেন না। দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন করিতেন না কেন? গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া লোকে গঙ্গায় বড় কদাচার করে,—মুখের কুল্যাদি নিক্ষেপ করে, গঙ্গায় দন্তধাবন করে, কেশ সংস্কার করে,—এই সকল অনাচার দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ব্যথা হইত। এমন ধর্ম্মভীরুতা, এমন সজীব ধর্ম্মভাব এখনকার দিনে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার আর এক বিচিত্র গঙ্গাভক্তি এই ছিল যে দেবার্চ্চনা করার পূর্ব্বেই তিনি গঙ্গাজল পান করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে গঙ্গা সাক্ষাৎ দ্রবব্রহ্ম। গঙ্গাজল

পানে জীব পবিত্র হয়, পশুভাব ও জীবভাব দূরীকৃত হয়, দেব-ভাবের উদয় হয়, সুতরাং দেবার্চ্চনার অধিকার জন্মে। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসেই তিনি পূজার পূর্ব্বে গঙ্গাজল পান করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :—

বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চনা পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান॥
তবে সে করেন পূজা আদি নিত্যকর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতের বুঝালেন ধর্ম্ম॥

মহাপ্রভু এইরূপে শ্রীল বিদ্যানিধির চরিত্র বর্ণন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহারে না দেখিলে আমার আর স্বস্তি নাই। তোমরা কৃষ্ণভক্ত, তোমাদের চিত্তের আকর্ষণে অবশ্যই তিনি এখানে আসিতে পারেন, তোমরা আকর্ষণ করিয়া সত্বরে তাঁহাকে আনিয়া দাও।" এই বলিয়া মহাপ্রভু আবার আবিষ্ট হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পুণ্ডরীক বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ফলতঃ কি প্রকারে ভক্তের মাহাত্ম্য বিস্তার করিতে হয় স্বয়ং শ্রীভগবানই তাহার একমাত্র শিক্ষাগুরু। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অচিরেই নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

স্বয়ং শ্রীল গদাধরের শ্রীমুখে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রেমনিধি বিদ্যানিধির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্তলীলায় গ্রন্থকার স্বীয় রচনাতেই তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যথা :—

যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥

গ্রন্থকার শ্রীল বিদ্যানিধির অনেক কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়া-ছেন :—

আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যার শিষ্য গদাধর—এই প্রেম সীমা॥
যার কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যার কীর্ত্তি বলেন মুরারি হরিদাস॥

হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না ব্যাখানে।
পুণ্ডরীক শুদ্ধ ভক্ত কায়বাক্য মনে॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না জানি অদ্ভুত কি চৈতন্য কৃপাপাত্র॥

ফলতঃ এইরূপ মহাভক্ত না হইলে কি বিদ্যানিধি শ্রীল স্বরূপের বন্ধু হইতে পারিতেন? শ্রীল বিদ্যানিধির নিকট গদাধর প্রভুর মন্ত্র গ্রহণ বৈষ্ণব ইতিহাসের এক মহান্ ব্যাপার এবং ভক্তিরাজ্যের এক বিচিত্র ঘটনা। তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

একবিংশ অধ্যায়।

বিদ্যানিধি ও গদাধর।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আকর্ষণে বিদ্যানিধির হৃদয় নবদ্বীপ বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি সেই নীরব আহ্বানে ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার বোধ হইল তিনি যেন এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে সমর্থ নহেন। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন—সঙ্গে রাজার ঠাট—বহু লোক জন—বহু আসবাব। শ্রীল বিদ্যানিধি সুপণ্ডিত। ছাত্রগণ ও ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই নবদ্বীপ আসিলেন। বিদ্যানিধি যে প্রেমনিধি নবদ্বীপবাসী লোকেরা পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সকলেই মনে করিতেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি একজন প্রধান বিষয়ী—জমীদার—অতি সম্পত্তিশালী লোক। পুণ্ডরীকের প্রকৃত সম্পত্তি তখনও কাহারও জ্ঞানগোচর হয় নাই। কিন্তু শ্রীল মুকুন্দদত্ত ও বাসুদেব শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয়কে খুব ভালরূপেই জানিতেন। কেন না, চট্টগ্রাম তাঁহাদেরও জন্মভূমি।

মুকুন্দের সহিত গদাধরের বড় বন্ধুভাব। দুইজন এক সঙ্গে বিচরণ করেন, একত্র কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ করেন, একত্র কীর্ত্তন করেন। কোথাও

কোন নূতন ব্যাপার দেখিলে বা শুনিলে একে অন্যকে না বলিয়া স্থির থাকিতে পারে না, দুইজনে যেন অভেদাত্মা। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আসিয়াছেন, মুকুন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তাঁহার ভক্তির মন্দাকিনী তরঙ্গ তুফানে মুকুন্দ আনন্দরসে নিমজ্জিত হইলেন, তাঁহার প্রিয়তম শ্রীল গদাধর এই আস্বাদলাভ করুন, মুকুন্দের ইহাই ইচ্ছা। মুকুন্দ তাড়াতাড়ি গদাধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন পণ্ডিত এখানে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব আসিয়াছেন, দেখিবে যদি, চল; দেখিলে তুমি বড় আনন্দ পাইবে, আমি তোমাকে আজ আনন্দিত করিব, দেখিও, আমাকে সেবক বলিয়া স্মরণ রাখিতে ভুলিও না।"

গদাধর পরম বৈষ্ণব, গম্ভীর, শান্ত, সুশীল ও সুপণ্ডিত। প্রিয় অনুচর মুকুন্দদত্তের কথা শুনিয়া তাঁহার কৌতুহল বাড়িল। তিনি বলিলেন আর ক্ষণার্দ্ধ বিলম্বও সহিতেছে না, এখনি চল। এই বলিয়া দুই 'বন্ধু কৃষ্ণ বলিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাসা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অচিরেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দদত্তের ইঙ্গিতে বিদ্যানিধি মহাশয়কে দেখিয়া নমস্কার করিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় গদাধর পণ্ডিতকে দেখিয়াই প্রীতি লাভ করিলেন যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

বিষ্ণু ভক্তি তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর।

তিনি মুকুন্দদত্তের নিকট উহার নাম ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন! মুকুন্দদত্ত গদাধরের যে পরিচয় প্রদান করেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে :—

মুকুন্দ বলেন শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান।
মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহারে॥
ভক্তি পথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইল দেখিতে॥

দুই কথাতেই অতি সুন্দর পরিচয় দিয়া মুকুন্দ দত্ত নীরব হইলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় আকৃতি দেখিয়াপ্র কৃতির যে অনুমান করিয়াছিলেন সে অনুমান যে যথার্থ, তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীল গদাধরের এই পরিচয় পাইয়া তিনি সমাদর পূর্ব্বক গদাধরের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

গদাধর বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বিদ্যানিধি মহাশয়ের গৃহের বিলাস-উপকরণ-সমূহের উপর সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন—বিদ্যানিধি মহাশয় যেন এক রাজাধিরাজ। তাঁহার খাটখানির ন্যায় এমন সুন্দর খাট নবদ্বীপের কোনও বড়লোকের ঘরে তিনি এযাবৎ দেখিতে পান নাই, উহার ঝক্‌ঝকে বার্ণিশ—অমন সুন্দর হিঙ্গুলে রং, পিত্তলের কাজ,—খাটের বাহার কত? খাটের উপরে এক চন্দ্রাতপ, তাহার উপরে আরও একখানি চন্দ্রাতপ, আবার তাহার উপরে আরও একখানি চন্দ্রাতপ। খাটের উপরে দুগ্ধ-ফেণনিভ সুকোমল সূক্ষ্ম বসনের কোমল শয্যা, চারি পাশে পট্ট বস্ত্রাচ্ছাদিত অতি মনোরম বালিশ,—গদাধর বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিলাসিভোগ্য এই শয্যা দেখিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন—একি ব্যাপার, বৈষ্ণবের এরূপ বিলাস-শয্যা কেন? শয্যা দেখিতে দেখিতে ঘরের মেঝের উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সেখানে দেখেন ঝক্‌ঝকে ছোট বড় চারি পাঁচটা ঝারি, সুমার্জ্জিত পিত্তলের বাটা—সে বাটায় পাকা পান বিবিধ উপকরণের সহিত শোভা পাইতেছে। দুই পাশে দুইটী আলবাটী। বিদ্যানিধি মহাশয় পান খাইতেছেন, আর কথা বলিতেছেন, তাঁহার ওষ্ঠ দুইখানি পাকা তেলাকুচের রং ধারণ করিয়াছে, আর রসময়ী রসনাটী ওষ্ঠ অপেক্ষাও যে রক্তরাগে অধিকতর সুন্দরী তাহা দেখাইবার জন্যই যেন এক একবার ওষ্ঠভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। গদাধর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব, বিষয়-বিরক্ত যতি ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর ব্রতাবলম্বী। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তাম্বুল-বিলাস দেখিয়া তাঁহার হাসি পাইল, কিন্তু সে হাসি চাপিয়া রাখিলেন।

এখন গ্রীষ্মাতিশয্যও নাই তথাপি দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন ভৃত্য ময়ূর

পুচ্ছের মনোহর পাখা দ্বারা তাঁহার অঙ্গে বাতাস দিতেছে। কপালে চন্দনের উর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড, তাহার মধ্যে ফাগুর বিন্দু—সে ফাগু আবার সুগন্ধ মিশ্রিত। তাঁহার চুলের পারিপাট্যও অতি চমৎকার, সুগন্ধি আমলকী ভিন্ন তাঁহার কেশ-সংস্কার হয় না। দেহখানি সুঠাম ও নধর—দেখিলে বোধ হয় যেন এক রাজপুত্র। আঙ্গিনায় একখানি দোলা। দোলা দেখিয়া গদাধর বুঝিলেন, বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রীপদযুগলের স্পর্শসুখ বোধহয় বসুন্ধরার ভাগ্যে কখনও ঘটে না।

ফলতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই সকল বিলাসিভোগ্য বিবিধ বিচিত্র বৈভব-সন্দর্শনে আজন্মবিরক্ত গদাধরের হৃদয়ে কেমন এক সন্দেহ জন্মিল। আলাপে তাঁহার সুখ বোধ হইল না, গদাধরের আর স্ফূর্ত্তি রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মুকুন্দের একি রঙ্গ। মুকুন্দ এই বৈষ্ণবটীকে দেখাইতে এত বলিয়া আমাকে এখানে লইয়া আসিল কেন? ইনি যদি বৈষ্ণব, তবে ঘোর বিষয়ী কে? দূর হইতে ইহার কথা শুনিয়া একটু ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ দেখিয়া এখন আর ভক্তির লেশমাত্রও রহিল না। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :—

ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বাস দিব্য গন্ধ কেশ॥
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
যে ছিল সে ভক্তি এবে গেল দরশনে॥

ফলতঃ গদাধর স্ফূর্ত্তিহীন হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা তিনি এখানে আর অবিক্ষণ না থাকেন। মুকুন্দ দত্ত গদাধরের সতত সঙ্গী। গদাধরের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুকুন্দ গদাধরের মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারেন। মুকুন্দ বুঝিলেন গদাধর ঠকিয়াছেন, গদাধর বিদ্যানিধির বাহ্যবেশ দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। মুকুন্দ মনে করিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভক্তিরস আস্বাদনে তাহার প্রিয়বন্ধু পূজ্যপাদ গদাধর বঞ্চিত হইবেন কেন? বিদ্যানিধির অন্তশ্চরিত্রচিত্রপট শ্রীল গদাধরের সমক্ষে প্রকটিত করার জন্য মুকুন্দ ভক্তি-মহিমসূচক দুইটী শ্লোক গানের স্বরের

উচ্চারণ করিলেন—সে শ্লোক দুইটী এই :—

অহো বকী যং স্তনকালকূটম্
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্য সাধ্বী
লেভে গতিং ধাত্র্যোচিতাং ততোঽন্যম্
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥
পূতনা লোকবালঘ্নীং রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্তাপি সদ্গাতিম্॥

অর্থাৎ "অহো বকী রাক্ষসী পূতনা হত্যা-মানসে স্তনে কাল কূট মাখিয়া যাঁহাকে পান করাইল, কিন্তু তাহাতেও যিনি সেই রাক্ষসীকে ধাত্রীর ন্যায় সদ্গাতি প্রদান করিলেন, বল দেখি; তিনি ভিন্ন আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব। অপরন্তু লোকের শিশু সন্তান বিনাশ করাই যাহার স্বভাব, সেই রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা হত্যা করার মানসে হরিকে স্তনদান করিয়া সদ্গাতি লাভ করিল।"

মুকুন্দ গানের স্বরে ভক্তি মাহাত্ম্যসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক দুইটী পাঠ করা মাত্রই বিদ্যানিধি কাঁদিয়া উঠিলেন, আত্মহারা হইলেন, নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া সুচিক্কণ সুন্দর শয্যা ভিজিয়া গেল, সহসা অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ঝটিকার ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ পাইল—দেহে কম্প, নয়নে অজস্র জলধারা, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু ও পুলক এবং পর্য্যায়ক্রমে মূর্চ্ছা ও হুঙ্কারে তাঁহার দেহ অধীর হইয়া পড়িল। তিনি বোল বোল বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, একবারেই উন্মত্ত ও আত্মহারা; বিন্দুমাত্রও বাহ্যজ্ঞান রহিল না। খট্টা হইতে গড়াইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন তাঁহার উন্মত্ততা উপস্থিত হইল, ইতস্ততঃ পাদ বিক্ষেপণে ঘরের দ্রব্য সকল ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, পানের বাটা ও পান পদাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, মাথার সেই সুচিক্কণ সুন্দর সুগন্ধি দ্রব্যমাখা সুবাসিত কেশ ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমাবেশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পরিহিত বস্ত্র দুই হাতে চিরিতে লাগিলেন। অবশেষে ধূলায় লুটাইয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ," বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। আর বলিতে লাগিলেন আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন, হে কৃষ্ণ, তুমি

এমন পরম দয়াল, আর তোমার প্রতি আমার ভক্তি হইল না।” এই বলিয়া মহা গড়াগড়ি দিয়া এক একবার উঠিয়া আবার ধড়াস করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন—ভাব-বিকারে ভয়ঙ্কর কম্প উপস্থিত হইল, দশজনে ধরিয়াও তাঁহাকে স্থির রাখিতে পারিল না। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঃ—

বস্ত্র শয্যা ঝারি বাটি সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল, কিছু নাহি আর॥

* * * *

কোথা গেল সেবা দিব্য কেশ সংস্কার।
ধূলায় লুটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
মুঞি সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে॥
মহা গড়াগড়ি দিয়া যে পড়ে আছাড়।
সভে মনে করে কিবা চূর্ণ হৈল হাড়॥

বিদ্যানিধি প্রেম বিকারে এইরূপ উন্মত্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ দেহ-বিক্ষেপের পর প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শরীর একবারে নিষ্পন্দ হইয়া পড়িল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

এই মতে কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈঞা রহিল পড়িয়া॥
তিলমাত্র ধাতু নাহি সকল শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে॥

বিদ্যানিধির ভক্তির এই বিশাল ভাব দেখিয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে ভয়, ভক্তি, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হইল। তাঁহার ভয়ের কারণ এই যে তিনি প্রথমতঃ বিদ্যানিধির বিলাসিজন-সেব্য দ্রব্যাদি দেখিয়া তাঁহাকে বিলাসী ভাবিয়াই মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, মহদবজ্ঞা অপরাধজনক, ইহা ভক্তি পথের দারুণ কণ্টক, তাই গদাধর বলিলেন—

হেন জনেরে আমি অবজ্ঞা করিনু
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইনু

বিদ্যানিধির এই ভক্তি-প্রবাহ দেখিয়া তাঁহার প্রতি গদাধরের একান্ত ভক্তি জন্মিল। প্রিয়বন্ধু মুকুন্দ যে প্রকৃতই বন্ধু কার্য্য করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া গদাধর মুকুন্দকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিয়া নয়ন জলে তাঁহার বক্ষ ভিজাইয়া গদাধর বলিলেন—

মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলা ভক্তি, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥

তাঁহার বিস্ময়ের কারণ এই যে তিনি মহাপ্রভুর ভক্তিভাব দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু গদাধর জানেন, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, জনসাধারণের শিক্ষার জন্যই ভক্তির অভিনয় করেন। কিন্তু মানুষের ভক্তিভাবে এরূপ বিশাল সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইতে পারে, গদাধর তাহা আর কখনও দেখেন নাই। সুতরাং *এদৃশ্য* তাঁহার পক্ষে প্রকৃতই বিস্ময়ের হেতু হইল, তাই তিনি বলিলেন ঃ—

এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রৈলোক্য পবিত্র হয়, এ ভক্ত দর্শনে॥
আজি আমি এড়াইনু পরম শঙ্কটে।
সেহো যে কারণে তুমি আছিলা নিকটে॥

গদাধর এইরূপ নিজের হৃদয়ের ভাব প্রিয়তম বন্ধু মুকুন্দের নিকট ব্যক্ত করিলেন। ফলতঃ মুকুন্দের বুদ্ধি প্রভাবেই গদাধর বিদ্যানিধির বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন বিদ্যানিধির বিলাস-উপাদানের সহিত তাঁহার চিত্তের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নির্ম্মুক্ত আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার যতটুকু সম্বন্ধ, উড্ডীয়ন ধূলি রাশির সহিত আকাশের যেটুকু সম্বন্ধ, বিদ্যানিধির চিত্তের সহিত তদীয় বিলাসি-ভোগ্য বস্তুরাশির ততটুকু সসম্বন্ধও নাই। গদাধরের মনে প্রকৃতই অনুতাপ হইল; কেন না, এমন যে মহাভক্ত, তাঁহার প্রতি তিনি আপন মনে কুসন্দেহের স্থান দিয়াছিলেন। গদাধর মনে করিলেন এই বৈষ্ণব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তিনি মনে মনে বলিতে

লাগিলেন :—

এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজন॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই আমি মন্ত্র উপদেষ্টা ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যেই করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥

শাস্ত্রে লিখিত আছে বৈষ্ণবাপরাধ অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান ও বৈষ্ণবাপরাধীর নিস্তার করিতে পারেন না, ভক্তিরাজ্যে সেরূপ বিধান নাই। যাঁহার নিকট অপরাধী হওয়া যায়, তিনি ভিন্ন অপরে সেই অপরাধ হইতে মুক্তি দিতে পারেন না। সুতরাং সুপণ্ডিত গদাধর অতি উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রিয়বন্ধু মুকুন্দকে তাহা জানাইলেন। বলা বাহুল্য যে মুকুন্দ এই প্রস্তাবে অতি আহ্লাদিত হইলেন।

এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় দুই প্রহর পর্য্যন্ত আনন্দসুধাসাগরে নিস্পন্দ ভাবে নিমজ্জিত ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল, তিনি চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে পদ-পার্শ্বে মুকুন্দ ও গদাধর। নয়ন-জলে গদাধরের অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে, পূর্ণ বিকসিত কমলদলের ন্যায় গদাধরের নয়নকমলে অশ্রুধারার বিরাম নাই। গদাধরের প্রেম দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বড় আনন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গদাধর পিতার বক্ষে পুত্রের ন্যায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া আনন্দে নিস্পন্দ হইলেন। মুকুন্দ, গদাধরের মনের বাসনা বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট খুলিয়া বলিলেন। উপযুক্ত শিষ্য না হইলে শাস্ত্রে মন্ত্র দেওয়ার নিষেধ আছে, মুকুন্দ ইহা জানিতেন, তাই তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট গদাধর-চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দিয়া বলিলেন—

বিষ্ণুভক্তি, বিরক্তি, শৈশবে বৃদ্ধ রীত।
মাধব মিশ্রের কুল নন্দন উচিত॥

শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর॥
আপনি বুঝিয়া চিত্তে একশুভ দিনে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্র দীক্ষা করাহ আপনে॥

বিদ্যানিধি মহাশয় অতীব আহ্লাদের সহিত মুকুন্দের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, বিধাতার কৃপায় আমি মহারত্ন পাইলাম, বহুভাগ্য ফলেই এমন সুশিষ্য লাভ হইয়া থাকে। তিনি শুক্লাদ্বাদশীতে গদাধরের দীক্ষার দিন স্থির করিয়া দিলেন! গদাধর বিদ্যানিধির শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণাম করিয়া মুকুন্দের সহিত সেদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীল গদাধর, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাসা হইতে আসিয়া রাত্রিতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদ্যানিধির প্রেম-ভক্তির কথা তুলিলেন। মুকুন্দও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীভগবানের এমনই বিধান শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ও তখনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য আগমন করিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়কে ঘরের বাহির হইতে হইলে দোলা চাই, লোক জন চাই, নানাবিধ আসবাব চাই—সে এক নবাবি কাণ্ড,—রাজ রাজড়ার ঠাঁট! কিন্তু রাত্রিযোগে বিদ্যানিধি একাকী মহাপ্রভুর সদনে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রভুর সদনে আসিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া প'ড়িলেন, প্রভুকে প্রণামও করিতে পারিলেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে॥

আনন্দের আবেগ বিদ্যানিধির হৃদয়ে স্থান না পাইয়া সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইল, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াও সে বেগের হ্রাস হইল না। আনন্দ-বেগভরে বিদ্যানিধির দেহ অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, মহা-প্রভুকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াই অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল। তিনি অনুতাপ করিয়া

কান্দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিয়াছেন তাই তিনি নির্ব্বেদ-ও-বিষাদমিশ্র প্রার্থনা বাক্যে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

কৃষ্ণ রে জীবন মম কৃষ্ণ মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতবা দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥

এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার করুণ রোদন রোলে উপস্থিত ভক্তমাত্রেরই প্রাণ বিগলিত হইয়া পড়িল, সকলেরই নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইনি কে, তাহা কেহ চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু দয়াময় মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বিদ্যানিধিকে স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কান্দিয়া বলিলেন বাপ পুণ্ডরীক, তুমি এতদিন আমাকে ছাড়িয়া কোথা ছিলে, আজ আমার নয়ন সফল হইল, আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম। এই বলিয়া মহাপ্রভু কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন ইনিই সেই বিদ্যানিধি। তখন প্রেমের এক প্রবল প্রবাহ বহিতে লাগিল, সকলেই আনন্দ অশ্রুতে পরিপ্লাবিত হইলেন। মহাপ্রভুর আনন্দ ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্যানিধি মহাশয় পরিস্নাত হইলেন।

গঙ্গা মহাপ্রভুর পাদোদক মাত্র। শ্রীগঙ্গা জীবের তাপ দূর করিতে পারেন, হৃদয় পবিত্র করিতে পারেন, জীবকে স্বর্গের সুখ প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু মহাপ্রভুর নয়নোদক সাক্ষাৎ প্রেম-প্রবাহ, প্রেম-গঙ্গা। ইহার কণামাত্র স্পর্শ হইলেও জীব শ্রীবৃন্দাবন-সুখসম্পত্তির অনন্ত অক্ষয় অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়। মহাপ্রভুর যুগল নয়ন-কমল হইতে প্রেমসুধা ধারায়-ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে প্রবাহে বিদ্যানিধি পরিস্নাত হইলেন। কাঙ্গাল, মাণিক পাইলে যেমন আত্মহারা হইয়া যায়, কোথায় সে মাণিক লুকাইবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়, বিদ্যানিধি মহাপ্রভুকে পাইয়া যেন প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় ধন প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যানিধির ইচ্ছা তাঁহাকে চিরদিনের জন্য আপন হৃদয়ে লুকাইয়া

রাখেন। তিনি তাঁহাকে প্রেমভক্তিভরে অতি আদরে জড়াইয়া ধরিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী প্রভু যেন বিদ্যানিধির শরীরে লীন হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে একপ্রহর কাল অতিবাহিত হইল, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি হরি হরি বলিয়া জাগিয়া উঠিলেন আর অতীব আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন :—

আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাম সর্ব্ব মনোরথ সার॥

শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের মিলন, ইহা ভক্তিরাজ্যের যেমন এক আকর্ষণ ব্যাপার, আবার ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের মিলনও তেমনি এক আকর্ষণ ব্যাপার। কৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি দ্বারা ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত সম্মিলিত হয়েন, আবার ভাগবতী কৃপাকর্ষণে শ্রীভগবান স্বীয় ভক্তকে বুকে লইয়া ভক্তিরাজ্যের পরিধি বিস্তার করেন। শ্রীভগবল্লাভের জন্য ভক্তজীবের যেমন আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ, ভক্ত-লাভেও শ্রীভগবানের তেমনি আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ। ভক্তিরাজ্যের এই মহাভাব অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য। তাই মহাপ্রভু বলিলেন, আজ আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, আজ কৃষ্ণ আমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিলেন। ভক্তের ভগবান এবং ভগবানের ভক্ত এই দুই লইয়াই ভক্তিরাজ্যের পূর্ণতা। প্রভু এই লীলায় এই মহা সত্য জগতে প্রচার করিলেন।

সকল বৈষ্ণবের সহিত তিনি বিদ্যানিধির মিলন করিয়া দিলেন। তখন মহা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ভক্তগণ আনন্দে নিমজ্জিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীকীর্ত্তন নিবৃত্ত হইল, কিন্তু বিদ্যানিধির যে আনন্দ মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন তাঁহার আর চেতনার সঞ্চার হইল না। দেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-পুলক ও স্বেদাদি সাত্ত্বিক চিহ্ন সকল প্রতিভাত হইতে লাগিল। বিদ্যানিধির এই অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, ইহার নাম পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। কিন্তু বিধাতা যেন প্রেমভক্তি বিতরণ করার জন্যই এই শ্রীমূর্ত্তির গঠন করিয়াছেন সুতরাং "প্রেমনিধিই" ইহার প্রকৃত পদবী হইল। যথা শ্রীচৈতন্য

ভাগবতে :—

ইঁহার পদবী পুণ্ডরীক প্রেমনিধি।
প্রেমভক্তি বিতরিতে গড়িলেন বিধি॥

প্রভু প্রেমনিধির হাত তুলিয়া তুলিয়া প্রেমনিধির গুণবর্ণন করিতে লাগিলেন, আর ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তদর্শন যে কত মঙ্গলজনক, কত পুণ্যময় মহাপ্রভু ভক্তদিগের সমক্ষে ভক্তমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, যথা ভাগবতে—

প্রভু বলে আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে॥

শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য ভক্তেরই বিদিত, আর ভক্তের মহিমা প্রকটন করিতে শ্রীভগবান্‌ই সমর্থ। সুতরাং মহাপ্রভু ভিন্ন ভক্ত-মহিমা এরূপ ভাবে প্রকটন করিতে আর কাহার সাধ্য। মহাপ্রভু বলিলেন আজ আমার সুপ্রভাত, কেন না আজ প্রকৃত ভক্তের দর্শন পাইলাম। আজ আমার মহামঙ্গল, কেন না ভক্তদর্শনের ন্যায় মঙ্গল জগতে আর কি হইতে পারে? প্রেমনিধি বিদ্যানিধির দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয়ে আজ আনন্দ ধরিতেছে না, যিনি সাক্ষাৎ সরস্বতীর প্রবর্ত্তক, আজ ভক্ত-মহিমাকীর্ত্তনে তাঁহারও বাক্য যেন ব্যাকুল ও অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন। ভক্তিরাজ্যের এই ভাব অভক্তদের অজ্ঞেয়, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য।

যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমনিধি মহাশয়ের বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি যেন জাগিয়া উঠিলেন! চাহিয়া দেখেন সম্মুখে মহাপ্রভু! তাঁহাকে ভক্তিবিহ্বল ভাবে প্রণাম করিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য মহাশয়ও সেখানে ছিলেন, তাঁহাকেও প্রণাম করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণকে যথাযোগ্য প্রেমসম্ভাষণ করিলেন। ভক্তগণ প্রেমনিধির দর্শনে পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। প্রেমনিধির সন্দর্শনে সেই সময়ে ভক্তগণের মধ্যে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গ লীলালেখক ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—

ক্ষণেক যে হৈল প্রেম ভক্তি আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ॥

আনন্দ-তরঙ্গ একটু প্রশমিত হইলে পর গদাধর মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার নিজের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন "মুকুন্দের সহিত যখন আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই, তখন প্রথমতঃ উহাঁর ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে অবজ্ঞা জন্মে। তাহাতে আমার বৈষ্ণব অপরাধ হইয়াছে। উহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার না করা পর্য্যন্ত সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত অপর কিছুতেই হইবে না। আমি উহাঁর শিষ্য হইলে উনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। সুতরাং আমি উহার শিষ্য হইতে বাসনা করিয়াছি, এজন্য আমি আপনার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি।" বলা বাহুল্য যে মহাপ্রভু অতীব আনন্দের সহিত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। কয়েকদিন পরে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে গদাধর প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রেমভক্তিভরে প্রেমনিধি পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এহেন প্রেম-নিধিই শ্রীল স্বরূপের প্রিয়তম বন্ধু। ইনিই নাকি পূর্ব্ব লীলার শ্রীরাধার জনক বৃষভানু রাজা। তাই মহাপ্রভু ইহাকে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আর অপর মহিমা কীর্ত্তন করার প্রয়োজন কি? তিনি গদাধরের গুরু এই কথা বলিলেই তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দেওয়া হয়। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য যার, ভক্তের সেই সীমা॥
যোগ্য গুরু শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় অনুচর॥

পুণ্ডরীক-গদাধরের মিলন-কাহিনী পরম প্রেমভক্তি প্রদায়িনী। তাই শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন—

পুণ্ডরীক গদাধর দুইয়ের মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তার মিলে প্রেমধন॥

পরমভক্ত শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাক্য ঋষি-সত্তমের বাক্য।

হার একটী বর্ণও মিথ্যা হইবার নহে। এ প্রসঙ্গ প্রকৃতই প্রেম-ভক্তি পূর্ণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বন্ধু-সমাগম।

শ্রীল স্বরূপের প্রিয়তম বন্ধুর নিকট শ্রীল গদাধর মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। যিনি গদাধরের ইষ্টদেবতা—গদাধরের দীক্ষাগুরু তাঁহার চরিত্র পাঠে হৃদয়ে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? বিশেষতঃ বন্ধুর চরিত্র কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীল স্বরূপেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইবে ইহাই মনে করিয়া এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয়ের চরিত্র-কীর্ত্তন অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

নীলাচলে শ্রীল বিদ্যানিধির মিলন-প্রসঙ্গ আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। এই স্থলে বহুদিন পরে প্রেমনিধি শ্রীল বিদ্যানিধি ও রসময় স্বরূপদামোদর, এই উভয় বন্ধুর পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হয়। শ্রীল বিদানিধির নীলাচলে শুভাগমনসংবাদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীতে সর্ব্বপ্রথমে গদাধর জানিতে পান। যে সূত্রে শ্রীল গদাধর তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীল প্রেমনিধির আগমনবার্ত্তা জানিতে পান, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহা এইরূপ বিবৃত আছে তদ্‌যথা ঃ—

একদিন গদাধর দেব প্রভু স্থানে।
কহিলেন পূর্ব্বমন্ত্র দীক্ষার কারণে॥
ইষ্ট মন্ত্র আমি যে কহিনু কার প্রতি।
সেই হইতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মনে প্রসন্নতা হইবে আমার॥

গদাধরের দীক্ষামন্ত্র স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, তাই তিনি মহাপ্রভুর নিকট সেই মন্ত্রস্মৃতির প্রার্থনা করিলেন, সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে এই প্রার্থনা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, শ্রীল বিদ্যানিধি কি মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দীক্ষাগুরু যে মন্ত্র প্রদান করেন, অপরে তাহা জানিতে বা শুনিতে পায় না, ইহাই প্রচলিত রীতি। বিশেষতঃ দীক্ষামন্ত্র একজনেরই দিবার অধিকার, অপরের সে অধিকার নাই। সুতরাং গদাধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও এমন অশাস্ত্রজ্ঞের ন্যায় প্রার্থনা করিলেন কেন?

সাধারণ বুদ্ধির এই ধারণা ভ্রমাত্মিকা। কেন না, শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগুরু এবং সকলের আত্মস্বরূপ বলিয়াই জানিতেন। সুতরাং তাঁহার গুরু হইতে মহাপ্রভু ভিন্ন, এ ধারণা গদাধরের ছিল না এবং সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি যে তাঁহার দীক্ষামন্ত্র জানিতে পারেন না, গদাধরের এই ক্ষীণ বিশ্বাসও ছিল না। কাজেই তিনি সরলভাবে মন্ত্র-স্ফূর্ত্তির জন্য মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু সৎশাস্ত্রসিদ্ধান্ত সংস্থাপন ও দৃঢ়ীকরণের জন্য অবতীর্ণ। সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সহিত সৎশাস্ত্রের বিরোধ হইতে পারে না। মন্ত্রদাতা গুরু ভিন্ন অপরের নিকট পুনর্ব্বার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করা যায় না শাস্ত্রের ইহাই বিমল সিদ্ধান্ত। ইহার অন্যথাচরণ করিলে পূর্ব্বগুরুর নিকট অপরাধী হইতে হয়, এই লৌকিক ধর্ম্মের মর্য্যাদা-সংরক্ষণের জন্য মহাপ্রভু বলিলেন "তোমার দীক্ষাগুরুর বর্ত্তমানতায় অপরের নিকট তুমি মন্ত্রস্মৃতি লাভের প্রার্থনা করিতে পার না, তাহাতে তোমার অপরাধ হইবে। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :—

প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান তথা অপরাধী হও পাছে॥
মন্ত্রের কি দায়,—প্রাণ আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার॥

বলা বাহুল্য সর্ব্বশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্ত হিন্দুমাত্রেরই স্মরণ রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য। যাহা হউক

ইহা শুনিয়া গদাধর বলিলেন তিনি এখানে উপস্থিত রহেন, বিশেষতঃ তাঁহাতে ও আপনাতে প্রভেদ কি। আপনি সর্ব্বাত্মস্বরূপ। তাঁহাতে ও আপনাতে আমার কোন পৃথগ্‌ভাব নাই। এইজন্যই এরূপ প্রার্থনা করিয়াছি।" প্রভু বলিলেন তোমার গুরুদেব সত্বরেই এখানে আসিবেন। তোমার মন সততই তাঁহাকে টানিতেছে, তিনি তোমার আকর্ষণে আর কি স্থির থাকিতে পারেন? আমাকে দেখার উপলক্ষ করিয়া তিনি দশদিনের মধ্যে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি প্রভুর বাক্য সফল হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় নীলাচলে প্রভুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল বিদ্যানিধি প্রভুকে "বাপ" বলিয়া আহ্বান করিতেন। দেখামাত্রই "বাপ এসেছ, "বাপ এসেছ" বলিয়া প্রভু আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় প্রকৃতই প্রেমনিধি। তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমময় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন :—

প্রেমনিধি প্রেমে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥
শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন রোদন॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারি ভিতে।
বৈকুণ্ঠ স্বরূপ সুখ মিলিল সাক্ষাতে॥
ঈশ্বর সহিতে যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥

বসন্তের উদয়ে যেমন সমস্ত জগৎ প্রফুল্ল হয়, চন্দ্রোদয়ে যেমন আকাশ ও জগৎ সেই সুধামাখা কিরণে হাসিয়া উঠে, শ্রীল প্রেমনিধি বিদ্যানিধি যখন যেখানে যাইতেন সেইখানেই ভক্তগণের হৃদয়ে প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিত। নীলাচলে শ্রীপ্রেমনিধি উদিত হওয়া মাত্রই প্রেমেশ্বর মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত মহাপ্রেমে মাতিয়া উঠিলেন। মহাসঙ্কীর্ত্তনের মহাতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। এমন সময়ে শ্রীল স্বরূপদামোদর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীল বিদ্যানিধি কীর্ত্তনে নৃত্য

করিতেছেন। দীর্ঘ কাল পরে দুই বন্ধুর দেখা হইল, এইরূপ দেখার পর উভয়ের গাঢ় আলিঙ্গন অবশ্য সম্ভাব্য। কিন্তু তাহা হওয়ার যো নাই। শ্রীল বিদ্যানিধি গৃহী, আর তাঁহার বন্ধু শ্রীল স্বরূপ সন্ন্যাসী। সুতরাং শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় তদীয় বন্ধু শ্রীল স্বরূপের চরণধূলি গ্রহণ করিতে অবনত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শ্রীল স্বরূপ তাহাতে প্রস্তুত নহেন, তিনি শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয়কে বাধা দিয়া নিজেই তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতে মাথা নোয়াইলেন এবং হাত বাড়াইলেন। এইরূপে কীর্ত্তন স্থলে উভয় বন্ধু দুই মল্লের ন্যায় আদ্যপ্রণামরূপ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। দুই বন্ধুর এই বিচিত্র রঙ্গতরঙ্গ দেখিয়া মহারঙ্গে গৌরাঙ্গ হাসিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

দামোদর স্বরূপ তাঁহার পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হইল দেখা॥
দুই জনে চাহিল দুঁহার পদধূলি।
দোঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহ কারে নাহি পারে দুই মহাবলী।
দেখিয়া হাসেন গৌরাঙ্গ কুতুহলী॥

ফলতঃ কেহই কাহার চরণধূলি লইতে পারিলেন না, অবশেষে একে অপরকে গাঢ়রূপে বুকে আঁটিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত প্রেমবেগভরে অশ্রুজলে অপরকে পরিসিক্ত করিলেন।

যাহা হউক, মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল প্রেমনিধি কিয়ৎদিবস শ্রীধামে অবস্থান করার সংকল্প করিলেন! শ্রীল গদাধর এই সময়ে তাঁহার দীক্ষামন্ত্রোদ্ধার করিয়া লইলেন। সমুদ্রতটে যমেশ্বর নামক স্থানে মহাপ্রভু শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর অনেক সময়ই তাঁহার বন্ধুর নিকট থাকিয়া অতিবাহিত করিতেন, উভয়ে এক সঙ্গে বেড়াইতেন, এক সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে বিভোর থাকিতেন, একত্র শ্রীজগন্নাথ ও মহাপ্রভু দর্শন করিতেন ও কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইতেন। গৃহী বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী এই পার্থক্য প্রকৃত বৈষ্ণবতায়

বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষত হয় না, শ্রীল বিদ্যানিধি ও স্বরূপ দামোদরের বিশুভাবে সহবাসে এই উক্তির উত্তম দৃষ্টান্ত প্রকৃতই প্রোজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইল।

দেখিতে দেখিতে ওড়ন ষষ্ঠীর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ওড়ন ষষ্ঠী ক্ষেত্রের এক মহোৎসব। এই তিথিতে শ্রীজগন্নাথ দেব নূতন বস্ত্র পরিধান করেন। সে বস্ত্র ধৌত করিয়া ব্যবহার করা হয় না, উহাতে মাড় থাকে। শ্রীল বিদ্যানিধির মনে ইহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ খটকা বাঁধিল। শ্রীল বিদ্যানিধি মনে করিলেন নীলাচলের এ আবার কি ব্যবহার? মাড় বস্ত্র অশুদ্ধ। উড়িয়া সেবকগণ শ্রীজগন্নাথকে এই অশুদ্ধ বসন প্রদান করেন কেন? আর কাহারও নিকট এই প্রশ্ন করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তাঁহার প্রিয় বন্ধু স্বরূপের নিকট তাঁহার আর গোপন করিবার কি আছে? তিনি শ্রীল স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখে এ কিরূপ? জগন্নাথ দেবকে মণ্ড বস্ত্র দেওয়া হয় কেন? এদেশে ত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অভাব নাই অথচ মণ্ড বস্ত্র না কাচিয়া দেওয়ার কারণ কি? শ্রীল স্বরূপ বলিলেন, ইহা এই স্থানের দেশাচার। বোধ হয় ইহা যেন শ্রীভগবানেরই অভিপ্রায়, নচেৎ রাজাই বা ইহাতে নিষেধ না করেন কেন? শ্রীল বিদ্যানিধি বলিলেন—ভাল, শ্রীভগবান যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তিনি স্বতন্ত্র,—নিষেধবিধির বাহিরে। কিন্তু দেখিতেছি আজ সকলেই মণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, প্রজা, পাণ্ডা, পরিছা, বেহারা সকলেরই এক সাজ। ঈশ্বরের ব্যবহার মানুষে করে কেন? মণ্ডবস্ত্র অপবিত্র। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁহার পবিত্রতা-অপবিত্রতার বিচার না থাকুক কিন্তু তাঁহার সেবকগণের এই বিচার থাকা একান্তই কর্ত্তব্য। মণ্ডবস্ত্র স্পর্শ করিলে হাত ধুইতে হয়, নচেৎ হস্ত অশুদ্ধ থাকে। ইহারা শ্রুতি স্মৃতিশাস্ত্রাচার জানিয়াও এরূপ কার্য্য করেন? দেখিতেছি, রাজাও অবাধে এই মণ্ডবস্ত্র আপনার শিরে বাঁধিয়াছেন।

শ্রীল স্বরূপ। আমার মনে হয় ওড়ন-যাত্রায় বুঝি মণ্ডবস্ত্র ব্যবহারে দোষ নাই। সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং এখানে বিধি-নিষেধেরও বিচার নাই।

শ্রীল বিদ্যানিধি। পরমব্রহ্ম জগন্নাথ স্বতন্ত্র ও বিধিনিষেধাতীত। সুতরাং বিধি-নিষেধ-লঙ্ঘনে তাঁহার আবার দোষ কি? তোমার এ কথা ঠিক্। কিন্তু এ লোক গুলাও যে তাঁহার দেখা দেখি ব্রহ্ম হইয়া গেল। সামাজিক লোকমাত্রেরই লোক-ব্যবহার মানিয়া চলা উচিত। কিন্তু দেখিতেছি এই উড়িয়াগুলি লোক ও ব্যবহার ত্যাগ করিয়া একবারেই ব্রহ্ম-অবতার হইয়া উঠিল! যথা ভাগবতে—

তান দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এগুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে॥
ইঁহারা ছাড়িলেক লোক ব্যবহার।
সবে হইলেন ব্রহ্মরূপ অবতার॥

এইরূপ কথোপকথনে উভয়েই হাসিতে হাসিতে বাসায় চলিয়া গেলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীল বিদ্যানিধি গৃহস্থ বৈষ্ণব। তিনি মহাপ্রেমিক হইলেও সামাজিক ব্যবস্থা ও লৌকিক ব্যবহার সর্ব্বথা মানিয়া চলেন। ওড়ন ষষ্ঠীর মণ্ডবস্ত্র ব্যবহার দেখিয়া জগন্নাথ সেবকদিগের কার্য্যও তিনি দোষজনক বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু দয়াময় তাঁহার প্রিয়জনের হৃদয়ে এই ভ্রান্তি রাখিবেন কেন? অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার এই ভ্রমচ্ছেদ হইল। কিন্তু যে প্রকারে এই ভ্রমচ্ছেদ হয় তাহা অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র। সে বিবরণ এইরূপ—

শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় সন্ধ্যার পরে প্রসাদাদি পাইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। এ সকল কথা প্রভুর নিকট কিছু বলিলেন না—বলিবার বিষয়ও নহে। কেবল এক স্বরূপ ব্যতীত অন্য কেহই মণ্ডবস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মন্তব্য শুনিতে পান নাই। শ্রীল স্বরূপও এই কথা মহাপ্রভুকে বলেন নাই। দুই বন্ধুর রঙ্গরসের কথা,—ইহা অপরের নিকট বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি মহাপ্রভুর নিকট শ্রীল বিদ্যানিধির ভ্রমের বিষয় অবিদিত রহিবার নহে। তিনি অন্তর্য্যামী। সুতরাং শ্রীল বিদ্যানিধি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকগণের যে নিন্দাবাদ ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে বিদ্রূপোক্তি করিয়াছেন

অন্তর্যামী মহাপ্রভু স্বতঃই তাহা জানিতে পারিলেন। শ্রীল বিদ্যানিধির ভ্রমচ্ছেদ . এই অপরাধ হইতে তাঁহার নিস্তার করার জন্য শ্রীভগবান এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করিলেন। সন্ধ্যার পরে শ্রীল বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর সদনে উপস্থিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কথার প্রসঙ্গ হইলে, তিনি সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অন্যান্য ভক্তগণও নিদ্রিত হইলেন। রাত্রিশেষে শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন, গালে হাত দিয়া ফুলা অনুভব করিলেন. আর স্বপ্নের ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, সকলে উঠিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় আর ঘরের বাহির হইলেন না, তিনি বসিয়া এক মনে কেবল স্বপ্নের কথাই ভাবিতে ছিলেন, আর ফুলা গালে হাত বুলাইতেছিলেন। প্রত্যহ বিদ্যানিধি সকালে উঠিয়া স্বরূপের সহিত একত্র জগন্নাথ দর্শন করিতেন। কিন্তু এ দিন বেলা হইল, স্বরূপ তাঁহার বন্ধুকে তথাপি না দেখিতে পাইয়া নিজেই তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। দেখিতে পাইলেন শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয এত বেলাতে শয্যা ত্যাগ করেন নাই, বসিয়া বসিয়া কেবল কি জানি-কি ভাবিতেছেন। স্বরূপ বলিলেন "আজ তোমার হয়েছে কি ? এত বেলা হয়েছে, এখনও শয্যা ছাড়িতে পার নাই, জগন্নাথ দর্শনের বেলা হলো যে।

শ্রীল বিদ্যানিধি হাতের ইঙ্গিতে স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই, একবার এদিকে এস, আমার পাশে বসো, সকল কথাই বলিব, আগে আমার গাল দেখিয়া লও।

শ্রীল স্বরূপ তাহার বন্ধুর গালের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন "তাইতো এ হয়েছে কি ? দুইখানি গাল ফুলিয়া একবারে যে ঢাক হইয়াছে। এ কি ?"

শ্রীল বিদ্যানিধি হাসিয়া বলিলেন ইহা প্রভুর কৃপা—পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মণ্ড কাপড় দেখিয়া যে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহা সেই পাপের দণ্ড কিন্তু দণ্ড অতি অদ্ভুত। শুনিবে কি ? কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে মনের আনন্দে ঘুমাইয়াছি, শেষরাত্রিতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলাম,

শ্রীজগন্নাথ বলরাম দুই ভাই উগ্রমূর্ত্তিতে এ অধমের সম্মুখে উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া আর কোন কথা নাই, দুভাই আমাকে ধরিয়া সপাং সপাং করিয়া গালে চাপড় মারিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণ, বাপ ক্ষমা কর" বলিয়া পদতলে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম. বাপ কোন অপরাধে আমার এই দণ্ড। যথা ভাগবতে—

কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।
প্রভু বলে তোর অপরাধের অন্ত নাই॥
মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥
তবে কেন রহিয়াছ জাতিনাশা স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥
আমি যে করিয়াছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাবে অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমাকে করিলা ব্রহ্ম সেবক নিন্দিয়া।
মাগুয়া কাপড় স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া॥

আমি কথা শুনিয়া আরও ভয় পাইলাম, শ্রীচরণে মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিলাম, প্রভো বড় অপরাধ করিয়াছি এখন ক্ষমা কর, আর এমন অপরাধ করিব না। যে মুখে তোমার সেবকের নিন্দা করিয়াছিলাম, সে মুখের উত্তম দণ্ড হইয়াছে। আমার সৌভাগ্য, অতি সুপ্রভাত, তাই আজ আমার গালে আমার মুখে তোমার শ্রীহস্তের স্পর্শ হইল।"

শ্রীজগন্নাথ বলিলেন "তুমি সেবক, এই জন্যই তোমার প্রতি এই কৃপাদণ্ড প্রদর্শিত হইল।" এই বলিয়া দুই ভাই চলিয়া গেলেন। আমি জাগিলাম। জাগিয়া গালে হাত বুলাইয়া দেখি প্রকৃতই গাল ফুলিয়া উঠিয়াছে। মনে বড় আনন্দ বোধ হইল। আমার মহা অপরাধের জন্য জগন্নাথ যে আমাকে এত অল্প দণ্ড দিয়াই অব্যাহতি প্রদান করিলেন, ইহাতে নিজকে বড় ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলাম। আমি বুঝিয়াছি আমার প্রতি দয়াময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাকৃপা। নচেৎ এই অপরাধে আমাকে যে নিশ্চিতই অন্ধকূপে পড়িতে হইত।"

শ্রীল স্বরূপ তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীল বিদ্যানিধির সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও উল্লাসিত হইলেন। সখার সম্পদে সখার আনন্দোল্লাস বাড়িয়া উঠিল। স্বরূপ বলিলেন ভাই, এমন অদ্ভুত দণ্ডের কথা আর কখনও শুনা যায় নাই।

স্বপ্নে আসি শাস্তি করেআপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই সব দেখিল তোমাতে॥

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি স্বপ্নে এই কৃপাদণ্ডের কথায় অভক্তের বিশ্বাস না হইলেও এইরূপ ঘটনা যুক্তি তর্কের বহির্ভূত নহে। বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তিতে ইহাতে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। শ্রীল বিদ্যানিধি শ্রীভগবানের একান্ত নিজজন। সুতরাং তাঁহার প্রতি এইরূপ দণ্ড আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীল স্বরূপের কথা বলিতে হইলে তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যাদির কথা না বলিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর চরিত্রের অংশ মাত্র স্পর্শ করিয়াই এ প্রস্তাবের উপসংহার করা হইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

স্বরূপ ও তাঁহার শিষ্য।

শ্রীল স্বরূপদামোদরের চরিতামৃতের সহিত শ্রীমদ্‌রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিতামৃত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শ্রীল রঘুনাথ স্বরূপের প্রিয়তম শিষ্য, সহচর, অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র, এমন কি "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিয়াই পরিচিত। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে আরও কতিপয় রঘুনাথের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একজন পূজ্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ ভট্ট। বন্দনায় ইনিই ভট্ট রঘুনাথ বলিয়া প্রখ্যাত। অপর—বৈদ্য রঘুনাথ। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথপুরী রঘুনাথতীর্থ ও দ্বিজ রঘুনাথ প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের! আদিলীলায় অতি সংক্ষেপে এই ভজনাদর্শ চরিতের সারমর্ম্ম কয়েকটী কথায় বিশদরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, যথা ঃ—

মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধ্যানে আইল বৃন্দাবন॥

*　　*　　*　　*

অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুইতিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণ মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ড আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবের করে আলিঙ্গ-মান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনদিনে॥

এইরূপ সাধনভজনমহিমায় ইনি বৈষ্ণবসমাজে চিরপূজিত। এমন কি শ্রীমদ্ রঘুনাথ জাতিতে শূদ্র হইয়াও ভুবনপাবন ছয় গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া বৈষ্ণবগণের সভক্তি বন্দনার পাত্র, যথা বৈষ্ণববন্দনার মুখবন্ধে ঃ—

জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বৈরাগ্যের প্রকটমূর্ত্তি, সাধনভজনের অদ্বিতীয় আদর্শ এবং প্রেমভক্তির মহাসাগর। এইভুবনপাবন ভজনাদর্শের চরিত্র গঠন—শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের শিক্ষাগুরুতা-নৈপুণ্যেরই গৌরবকীর্ত্তি।

দাস রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় লাভের আশায় তদীয় চরণ সমীপে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু এই একান্ত অন্তরঙ্গ, পরম স্নেহাস্পদ ভক্তের হাতে ধরিয়া ইহাকে শ্রীপাদ স্বরূপের নিকট সমর্পণ করেন এবং "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিয়াই নামকরণ করেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঃ—

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হৈঞা॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈতে ইহার নামে॥

এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তারে দিল সমর্পিয়া॥
স্বরূপ কহে প্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥

শ্রীপাদ স্বরূপের সহিত রঘুনাথের কি সম্বন্ধ, এস্থলে অতি স্পষ্টরূপেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু তাঁহার "দ্বিতীয় স্বরূপ"কে বলিতেছেন, "এই রঘুনাথকে আজি আমি তোমার হাঁতে সমর্পণ করিলাম। রঘুনাথ আমার বড় প্রিয়, তুমি ইহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিও। রঘু তোমাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিবে, এবং ভৃত্যের ন্যায় তোমার সেবা করিবে। এ বস্তুটী আজ হইতে তোমার হইল, আজ হইতে এই রঘুনাথ "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে সকলের নিকট পরিচিত হইবে।" এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথের হাতে ধরিয়া উহাঁকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন। ইহাকেই বলে "হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়া।"

দান কাহাকে বলে? স্বস্বত্বধ্বংস-পরসত্ত্বোৎপত্তিফলক ত্যাগের নামই দান। রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। রঘুনাথ তখন মহাপ্রভুর নিজ বস্তু হইলেন। যাহাতে যাঁহার স্বত্ব নাই, তিনি তাহার দান বিক্রয়ের অধিকারী নহেন। রঘুনাথ জগতের সমস্ত ভোগ সুখাদি পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। মহাপ্রভু তাহার এই প্রিয়তম ভক্তরত্নকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিয়া বলেন "স্বরূপ আমার এই প্রিয় বস্তু আজ হইতে তোমার হইল, তুমি ইহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহকরিও। ইহাকে ভৃত্য মনে করিও, ইহার সেবা গ্রহণ করিও।" শ্রীপাদ স্বরূপ "যে আজ্ঞা" বলিয়া শ্রীরঘুনাথকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ সন্ন্যাসী। আজ প্রভুর আজ্ঞায় আকুমার সন্ন্যাসী স্বরূপ-দামোদর একটী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিয়াই ভক্তসমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকার-রচয়িতাও গুরু-শিষ্য উভয়ের স্মৃতিসূচক এই পবিত্রমধুর নামের উল্লেখ

করিয়াছেন, যথা :—

"স্বরূপের রঘুনাথে" দর্শন না পাইয়া।
কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইয়া॥

শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, রঘুনাথ স্বরচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কল্পবৃক্ষ" নামক স্তোত্রে তাহা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যথা :—

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিত মুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে য স্বীয় কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্দ্ধনশিলাম্
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

অর্থাৎ যিনি এহেন পতিত ও কুজনকে মহাসম্পত্তিরূপ দাবানল হইতে কৃপাগুণে উদ্ধার করিলেন এবং স্বীয়স্বরূপ শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, অপিচ বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর এই সময় হইতে রঘুনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথও স্বরূপকে পিতৃরূপে ও শিক্ষাগুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া অতীব যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলিয়া দিলেন শ্রীপাদ স্বরূপই তোমার শিক্ষাগুরু। (৬) তাঁহার নিকট সাধ্য-

(৬) শ্রীমদ্দাস গোস্বামী নীলাচলে সকলের প্রিয় ছিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীমদ্ রঘুনাথের শিক্ষাগুরু। ইঁহার দীক্ষাগুরু প্রেমবান্ শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে :—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব প্রিয়
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং
শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেক সততং স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধি র্ন কস্যবিদিতো নীলাচলেতিষ্ঠতাম্

অর্থাৎ শ্রীবাসুদেবের প্রিয়তম প্রেমবান্ যদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য বিবিধ গুণের নিধান রঘুনাথ দাস আমাদের প্রাণাধিক। নীলাচলস্থিত জনগণের মধ্যে এমন কে

সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা করিও। এই সকল তত্ত্ব স্বরূপ যেমন জানেন, আমিও তেমন জানি না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি তত নাহি, জানি ইঁহ যত জানে॥

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের মধ্যে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসের ভজন কিরূপ, স্বরূপ ও রায় রামানন্দ দ্বারাই প্রভু তাহা জগতে প্রচার করেন। ভক্তমহিমা প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু অদ্বিতীয়। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্ত সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে॥

আরও এক কথা এই যে তাঁহার যে ভক্ত দ্বারা তিনি যে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা আছে। ব্রজের মধুররসের ভজনতত্ত্বে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের বিশিষ্টতাই সূচিত হইয়াছে। প্রভু স্বয়ং বলিতেছেন "আমি তত নাহি জানি ইহঁ যত জানে।" অন্যত্রও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বল্লভ ভট্টের অভিমান দূরীকরণের জন্য প্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের যে মহিমা কীর্ত্তন করেন, তখনও শ্রীপাদস্ব রূপ-দামোদরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "স্বরূপের নিকটেই আমি ব্রজের মধুররসের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্যলীলার

আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাস্নিগ্ধ স্বরূপ-দামোদরের নিরতিশয় প্রিয় ও বৈরাগ্যের সাগর সেই রঘুনাথ দাসকে না জানেন। অপিচ—

যঃ সর্ব্বলোকৈক মনোঽভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদাকৃষ্ট পচ্যা
যত্রায়মারোপণ তুল্য কালম্
তৎপ্রেম শাখী ফলকাল তুল্যম্

৭ম পরিচ্ছেদে :—

দামোদর-স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্ ।
যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর রসের জ্ঞান ॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ হীন ।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য এই ভাব চিহ্ন ॥ (৭)
গোপীগণের শুদ্ধ ভাব ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন ।
প্রেমেতে ভৎর্সনা করে এই তার চিহ্ন ॥ (৮)
সর্ব্বোত্তম ভজন ইঁহার সর্ব্বভক্তি জিনি ।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী ॥ (৯)
ঐশ্বর্য্য ভাব হৈতে কেবল ভাব প্রধান ।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥
তিঁহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন । (১০)
স্বরূপের সঙ্গে পাইনু এসব শিক্ষণ ॥

---

(৭) যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতা শনৈঃ প্রিয়দধী মহিকর্কশেযু
তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধী র্ভবদায়ুষাং নঃ । ১০ অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত।

(৮) পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবন্ধবা
নতি বিলঙ্ঘ্যতেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ
গতিবিদ স্তবোদ্গীত মোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ ক স্তজেন্নিশি ।

(৯) ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্
স্ব সাধুকৃত্য বিবুধায়ুষা পিবা
যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বপ্রতিযাতু সাধুনা ।

(১০) আসামহোচরণরেণু যুষামহস্তাং
বৃন্দাবনে কিমপিগুল্মলতৌষধিনাম্
যাদুস্তজ স্বজন আর্য্য পথঞ্চহিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ।

এই যে সারগর্ভ ভজনতত্ত্বের উল্লেখ করা হইল, ইহাই ব্রজের মধুর রসের ভজন। বৈরাগ্য অন্তে প্রেম-ভক্তির সবিশেষ স্ফূর্ত্তিতেই এই ভজনে অধিকার জন্মে। এই ভজনের অপর নাম "অন্তরঙ্গ সেবা" বা "গুপ্ত সেবা"। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ স্বরূপদামোদারের নিকটেই এই নিগূঢ় ব্রজরসের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে :—

প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধান আইল বৃন্দাবন॥

যিনি মহাপ্রভু দ্বারা শ্রীল স্বরূপদামোদরের হস্তে ভজনসাধন-শিক্ষার্থ সমর্পিত হইলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের সহিত পুত্রবৎ-ভৃত্যবৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিয়া দিলেন, যিনি ষোড়শ বর্ষকাল স্বরূপের সহিত অনবচ্ছিন্ন ভাবে অন্তরঙ্গ ভজন করিলেন,—শ্রীপাদ স্বরূপের পুত্রতুল্য প্রিয়তম শিষ্য, নিয়তানুচর এবং সহচর শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামির চরিতামৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধক মাত্রেরই অবশ্য আস্বাদ্য। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের শিক্ষাপ্রভাবে শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর চরিত্র-বিকাশ নীলাচল লীলার এক গূঢ় রহস্যময় ব্যাপার। সাধারণ জ্ঞানে ইহার ধারণা অসম্ভব, গুরুকৃপা ভিন্ন ইহা বুঝা অসম্ভব, লৌকিক ভাষায় উহার অভিব্যক্তি তো একবারেই অসম্ভব। আমাদের উদ্দেশ্য—কেবল তাঁহার কথা স্মরণ করা,—কেবল তাঁহার নাম করিয়া আত্মশোধন করা, সুতরাং এই পবিত্র চরিত্রের কণামাত্র স্পর্শ করিয়াই এখানে ক্ষান্ত হইলাম। (১১)

---

(১১) এই ভজনাদর্শ প্রোজ্জল চরিতামৃতের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিয়া শ্রীপত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রভুর কৃপা হইলে সেই সকল প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করার বাসনা রহিল।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

স্বরূপ ও মহাপ্রভু।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার শেষ দ্বাদশবর্ষের মহাবিরহ ব্যাপার অচিন্ত্য, অত্যদ্ভুত ও আলৌকিক। বিপ্রলম্ভরসের সেই সাগর-তরঙ্গবর্ণন মহাভক্ত কবির পক্ষেও অসম্ভব। স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন ঃ—

কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥

*　　*　　*　　*

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥
জীব হৈঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপন শোধিতে তার লৈয়ে এক কণ॥

শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই দ্বাদশবর্ষ কাল স্বরূপ ও রামরায়ের সহিত যে অলৌকিক ভাবে কৃষ্ণরসআস্বাদন করেন, তাহাতে পরম ভক্তেরও বুদ্ধি-প্রবেশ হয় না, বর্ণনা করা ত দূরের কথা! শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধুসনে॥
সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত॥

*　　*　　*　　*

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, না পারি বর্ণিতে॥

ফলতঃ গম্ভীরলীলা ধারণার অগম্য। তথাপি আত্মশোধনের জন্য "স্বরূপ ও মহাপ্রভু" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা ছিল। কিন্তু সে মহাসমুদ্রের কথা তুলিলে সংক্ষেপে কোন কথাই বলিতে পারিব না। প্রভুর কৃপানুমতি পাইলে দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইবে। যে পর্য্যন্ত প্রভু তাহা না করাইবেন তাবৎ চিত্তে শান্তি অনুভব করিতে পারিব না। এই প্রস্তাবে কেবল নামোল্লেখ করিয়া রাখা যাইতেছে মাত্র।

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চির সহচর। ব্রজলীলার মর্ম্ম সখী ললিতা নবদ্বীপ-লীলায় স্বরূপদামোদররূপে ভক্তজন সমক্ষে অবতীর্ণ হয়েন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাব প্রচ্ছন্ন। ললিতা সখীও তখন প্রচ্ছন্ন ভাবেই মহাপ্রভুর চরণান্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তার নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে॥

পুরুষোত্তম শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতেন, কৃষ্ণ কথা বলিতেন ও শ্রবণ করিতেন, কিন্তু নবদ্বীপ লীলায় পুরুষোত্তমাচার্য্যের নাম লীলাগ্রন্থে বড় বিশদভাবে প্রকাশিত হয় নাই, হইবার কথাও নহে। কেননা, নিগূঢ় ব্রজরসাস্বাদিনী ব্রজের নর্ম্ম সখীর পক্ষে বহিরঙ্গ লীলায় প্রকাশিত হওয়া রসনিয়মের ক্রম-বিরুদ্ধ। কিন্তু পুরুষোত্তম অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে সততই শ্রীগৌরাঙ্গচরণ সন্দর্শন করিতেন, নীরবে নির্জ্জনে রসালাপ করিতেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীপাদ পুরুষোত্তম কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং বেদান্ত পাঠ করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর বিরহে তাঁহার প্রাণ সততই ব্যাকুল থাকিত। তিনি আর অধিক সময়ে কাশীধামে থাকিতে পারিলেন না।

১৪৩৪ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়েই পুরুষোত্তম সন্ন্যাসিবেশে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম

হইয়াছিল—শ্রীস্বরূপ। গ্রন্থের উপক্রমে এই বৃত্তান্ত যথাশক্তি লিখিত হইয়াছে। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের হৃদয় যে অনুক্ষণই মহাপ্রভুর জন্য ব্যাকুল থাকিত, তাহা তাঁহার প্রথম কথাতেই জানা যায়। স্বরূপ মহাপ্রভুর চরণান্তিকে বসিয়া বলিলেন,—"প্রমাদবশতঃই তোমায় ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম। তোমার চরণ ছাড়া হইয়া আমি থাকিতে পারি কি ?" প্রভুও স্বরূপের নিমিত্ত কি-জানি-কি-জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি স্বরূপকে একরূপ আকৃষ্ট করিয়াই শ্রীচরণান্তিকে আনিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তুমি যে আসিবে, তাহা স্বপ্নেই জানিলুঁ।
ভাল হলো, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥

ভাবনিধি মহাপ্রভুর এই বাক্যের ভাব অতি গম্ভীর। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় বিপ্রলম্ভ-রসের পূর্ণ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় শ্রীরাধাভাববিভাবিত রসরাজ নর্ম্মসখী ললিতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভু আমার নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেন, অধীর হইতেন, বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। নর্ম্ম সখী ভিন্ন এ অবস্থায় আর উপায় কি ? সেই বিষম বিরহে স্বরূপ ও রামানন্দের কৃষ্ণ কথায় প্রভু প্রাণ-রক্ষা করিতেন।

"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

এইরূপ বাক্য বলিয়া প্রভু ধাইয়া যাইতেন, আছাড় পড়িতেন, অজ্ঞান হইতেন। তখন স্বরূপ প্রভুকে কোলে করিয়া, কৃষ্ণকথায় তাঁহার সান্ত্বনা করিতেন। গম্ভীর-লীলার হৃদয়বিদারি বৃত্তান্ত পাঠ করিতেই প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে :—

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রি নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্যে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব।

* * * *

মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গাম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা যমুনাধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তায় কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥

এই ভীষণ সময়ে স্বরূপই হৃদয়ের আবেগে চাপা দিয়া তাহার প্রাণাধিকের কর্ণে কৃষ্ণনামের মধুর ধ্বনি করিতেন। অন্তর্দ্দশায় শ্রীমতী রাধিকার কর্ণে মৃতসঞ্জীবন শ্রীকৃষ্ণনাম-সুধাবর্ষণ করাই শ্রীমতী ললিতার নির্দ্দিষ্ট সেবা। শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহে এইরূপ সেবায় শেষ দ্বাদশ-বৎসর যেরূপ ভাবে অতিবাহিত করেন, তাহা বর্ণনাতীত। অবশেষে এক দিবস ধরাধাম অন্ধকার করিয়া শ্রীশচীদুলাল সহসা অপ্রকট হইলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ তাঁহার পাছে পাছে চলিয়া গেলেন। শ্রীপাদ স্বরূপের নির্য্যাণের পরেই শ্রীমদ্দাস গোস্বামী নীলাচল ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দময় নীলাচলের মহামহোৎসব বন্ধ হইল, রসের প্রবাহ থামিয়া গেল, চারিদিক্ মহাশূন্যবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট দুইচারিজন ভক্ত শোকের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিরহের হৃদয়বিদারি হাহুতাশে "হা গৌরাঙ্গ" রবে জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিয়া এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হায়রে, এমন চাঁদের হাট দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া গেল! জগৎ যেন সহসা এক ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িল!

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীচরিতামৃত।

হৃদয়ে আরও একটা যাতনা রহিয়া গেল, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চা গ্রন্থ দেখিবার ভাগ্য হইল না। অনেক চেষ্টা করিলাম, অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গ্রন্থখানি কেহ কোথাও দেখিয়াছেন এরূপ বলিতে পারিলেন না। শ্রীপত্রিকায় দীর্ঘকাল বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াও উহাঁর কোন সন্ধান পাইলাম না। পরম কারুণিক কবিরাজ গোস্বামী তদীয় অক্ষয়কৃপার চিহ্নস্বরূপ শ্রীচরিতামৃতে এই গ্রন্থের নাম ও কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ না করিলে এতদিন বোধ হয় এই পরম উপাদেয় রসমাধুর্য্যের অদ্ভুত অলৌকিক বর্ণনাপূর্ণ শ্রীগৌরলীলার গূঢ় গভীর গুহ্য ইতিহাস এই প্রপঞ্চে অপ্রকট হইয়া পড়িতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চার দুই চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরতত্ত্বনির্দ্দেশক এবং শ্রীগৌরাবতারতত্ত্বজ্ঞাপক শ্লোক দুইটী উল্লেখ্য। এই দুইটী শ্লোকেই শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চার গম্ভীর ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ স্বরূপের প্রকাশিত শ্রীগৌরতত্ত্ব-নির্দ্দেশসূচক সুবিখ্যাত পদ্যটী গৌরভক্তগণের নিত্যবন্দনা স্তোত্র। উহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাসবিবর্ত্তের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদীয় চরিতামৃতে ঐ পদ্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা ঃ—

> রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
> দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্
> রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

এই পদ্যের গম্ভীর ভাব পরিস্ফুট করা সহজ নহে। কৃপাময় পাঠক-গণ শ্রীচরিতামৃতে ইহার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছেন। এই পদ্যটী গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণের অতীব আদরের ধন। পুরাণাদি পাঠের পূর্ব্বক্ষণে বৈষ্ণব পাঠকগণ শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনায় শ্রীপাদ স্বরূপের রচিত এই বন্দনাটী এখনও অতীব ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ স্বরূপ এই পদ্যে প্রকাশ করিলেন, যিনি "রসো বৈ সঃ" তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ, তিনিই রসরাজ রসিক-শেখর শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা যে লীলারসের মহাভাণ্ডার এই বস্তুনির্দ্দেশ পদ্যেই তাহা সূচিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের অনেক প্রকার হেতু-নির্দ্দেশ হইয়াছে। বহি-রঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভেদে এই হেতু দ্বিবিধ। রসতত্ত্বের শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ দামোদর মহাপ্রভুর অবতারত্বের গূঢ় গভীর গুহ্যতম অন্তরঙ্গ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীরাধাপ্রেমের রসাস্বাদনই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য বীজ। কেবল একমাত্র শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরই এই নিগূঢ় হেতু জগতে প্রকাশ করেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥

শ্রীপাদ স্বরূপই জগতে প্রথমতঃ প্রকাশিত করিলেন "শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে রাধাকৃষ্ণ। ঐ যে গৌরদেহে কষিত কাঞ্চনদ্যুতি দেখিতেছ উহা শ্রীমতী রাধিকারই শ্রীঅঙ্গের দ্যুতি। কেবল দ্যুতি নয়, প্রভু আমার মহাভাবস্বরূপিণীর মহাভাবে বিভাবিত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥

স্বরূপ তাঁহার কড়চার প্রথম শ্লোকেই তদীয় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট তত্ত্ব জগৎ সমক্ষে অভিব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গে ভাব ও দ্যুতিরূপে শ্রীমতী প্রকটিতা হইয়াছেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর এই রাধাভাবের প্রতক্ষ্য সাক্ষী। ইঁহারা দুইজন শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী শ্রীমতীর পার্শ্বস্থা বিশাখা ও ললিতার ন্যায় অনুক্ষণ মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়া তাঁহার বিরহ-বেদনার প্রশমন করিতেন। (১২) অতি অন্তরঙ্গ স্বরূপদামোদর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার নিগূঢ় কারণ ভক্তজন সমক্ষে প্রকাশ

---

(১২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে ইহার উল্লেখ আছে যথা :—

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠে ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি॥ আদির চতুর্থে।
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লঞা।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘারিয়া॥ অন্ত্যের চতুর্দ্দশে।
এত কহি গৌরহরি দুইজনের কণ্ঠ ধরি
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥
এইমত গৌরহরি প্রতি রাত্রিদিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
সেই দুই জন সহ প্রভুর করে আস্বাদন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥ অন্ত্যের পঞ্চদশে।

একদিকে ভাবানুযায়ী শ্লোক পাঠ করাই শ্রীরাম রায়ের কার্য্য ছিল। অপরদিকে সুকণ্ঠ দামোদর-স্বরূপ সুধামধুর সঙ্গীতে মূর্ত্তিমান ব্রজরসের সৃষ্টি করিয়া মহাপ্রভুর বিরহতাপের অপনোদন করিতেন, যথা অন্ত্যের চতুর্দ্দশে :—

স্বরূপ গোসাঞী করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কৈলা কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও লিখিয়াছেন :—

ভাগবত পাঠ গদাধরের বিষয়।
দামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তন আশয়॥

করিয়া বলিলেন :—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশোবানয়ৈব।
স্বাদ্যোযেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশোঃ বেত্তিলোভা
তত্ভাবাঢ্যো সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

অর্থাৎ "শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কীদৃশ এবং ইনি আমার যে মধুরিমা আস্বাদন করেন, আমার সেই মধুরিমাই বা কীদৃশ এবং আমাকে অনুভব করিয়া ইনি যে সুখাতিশয় প্রাপ্ত হয়েন সেই সুখাতিশয়ই বা কীদৃশ"—এই তিন বিষয়ের অনুভব-লালসায় রসিকশেখর রসরাজেন্দু শচীর গর্ভরূপ দুগ্ধসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

পরমকারুণিক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই

একেশ্বর দামোদর-স্বরূপ শুনি গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥

*　　*　　*　　*

দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেইক্ষণ॥
পথ চলিতেও প্রভু দামোদর গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি মানে॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে টানে পড়িতে ধরেন॥

দামোদর স্বরূপের ন্যায় মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ আর কেহ নহেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলেন :—

সন্ন্যাসী পার্ষদ যত মহাপ্রভুর হয়।
দামোদর স্বরূপের সমান কেহ নয়॥

*　　*　　*　　*

দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাসি পার্ষদে এই দুই অধিকারী।
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করেন দণ্ডের গ্রহণ॥

দুইটী শ্লোক স্বরূপের কড়চা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিস্ফুটরূপে শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শেষের শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতেই জানা যায় রসস্বরূপ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে রসরাজরূপে দর্শন করিতেন। তদীয় কড়চা গ্রন্থও যে রসের সুধামধুর প্রবাহে সর্ব্বত্রই উচ্ছ্ সিত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া সহজেই তাহার উপলব্ধি হয়।

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের উক্ত শ্লোকের ভাব বিবৃতি করিতে করিতে লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষ কৈল রস আস্বাদন॥ আদির চতুর্থে

আবার অন্যত্র

কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ॥
* * * *
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ কহে মোরে॥

ইহাতেও সেই রসতত্ত্বেরই কথা অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল রায় রামানন্দ যখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত স্বরূপ-সন্দর্শন করিলেন, তখন তিনি এক অদ্ভুত অলৌকিক রসরাজ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ এই দুই পার্ষদ প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ। ইহারা উভয়েই শ্রীগৌরাসুন্দরকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা গ্রন্থখানি যে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার সুধাময় রসতত্ত্বে পরিসিক্ত, গ্রন্থখানি পাঠেই তাহা জানা যায়। প্রধানতঃ কোন

কোন্ গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন্ কোন্ অংশে বিরচিত হইয়াছে, শ্রীগ্রন্থকার বহু স্থানে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন ঃ—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বলিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥

প্রভুর কৃপায় মুরারি কড়চা এখন প্রকাশিত। কিন্তু হায় "স্বরূপের কড়চা" কোথায়! শ্রীল কবিরাজ কোন্ লীলা কোন্ কড়চা হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাও তাহার গ্রন্থে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। যথা ঃ—

আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি রাখিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে আদিলীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। কেবল সূত্রমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ কেন হইল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শ্রীল কবিরাজ দেখিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় গুপ্ত মহাশয়ের কড়চার সূত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। এমন কি স্থানে স্থানে উহার বিশুদ্ধানুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং আদিলীলার সূত্রনিবহের বিস্তৃতির আর প্রয়োজন কি? শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর বিপ্রলম্ভরসময়ী সুধামধুরা গম্ভীরালীলার ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই লীলা যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যভাগবতে সেরূপ প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। কেন হয় নাই, কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং তাঁহার কারণ লিখিয়াছেন তদ্‌যথা ঃ—

নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

* * * *

আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তা সবার আজ্ঞায় লিখি নির্লজ্জ হৈঞা॥

*   *   *   *

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তার আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তার কৃপা বিনে কিছু না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনভিব্যক্ত লীলা সবিস্তাররূপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবচরিত্রসুলভ দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর কড়চাই এই লীলা বর্ণনে তাঁহার প্রধানতম অবলম্বন। শেষ লীলায় শ্রীপাদ স্বরূপই মহাপ্রভুর নিত্যসহচর ছিলেন। স্বরূপ সতত মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঃ—

দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম নিত্যসহচর শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কড়চা, শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চা ও তদীয় শ্রীমুখের উপদেশামৃত প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়াই যে শ্রীল কবিরাজ শেষ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্বীয় মুখে গৌর-লীলা কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। দাস গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুর শেষ লীলার নিগূঢ় মর্ম্ম ইঁহাকে অবগত করাইয়াছিলেন। দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে সেই গম্ভীর লীলা শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কবিরাজ উহার বর্ণন করেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

চৈতন্য লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণ দিল এই ভেটে॥

মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ত্য লীলাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক প্রধান বিশিষ্টতা। এই লীলা প্রেমরাজ্যের দুরবগাহ মহাভাবের মহোচ্ছাস। ইহা অতীব দুর্ব্বোধ্য। ভাষায় ইহার অভিব্যক্তি আদৌ অসম্ভব। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন :—

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝি, বর্ণে,—চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥

এই দুর্গম দুরবগাহ লীলা-সাম্রাজ্যে শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামী কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসের পথ-প্রদর্শক। কেন না, অন্যান্য কড়চা গ্রন্থে এই লীলার বিষয় আলোচিত হয় নাই। কেবল শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চাতেই এই ভাব-গম্ভীর মহালীলা জগতে প্রকাশ পাইয়াছেন। অন্যান্য কড়চা-কর্ত্তারা তখন দূর দেশে

ছিলেন, তাঁহাদের কড়চাতে এই লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইয়ের কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেই কালে এই দুই রহে প্রভু পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূর দেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভাবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্র কর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তাহার বাহুল্যে বর্ণি পঞ্জি টীকা ব্যবহার॥

শেষ লীলা বর্ণনে শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রধানতম অবলম্বন। তিনি অন্যত্রও লিখিয়াছেন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞীর মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দায়।

শ্রীচৈতন্যমৃতের অন্ত্যলীলায় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের অন্তে লিখিত হইয়াছে ;—

প্রলাপ সহিতে এই উন্মাদ বর্ণন।
স্বরূপ গোঁসাঞী ইহা করিয়াছেন বর্ণন॥

এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণকর্ণামৃত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক প্রভৃতির শ্লোকও তাহার বঙ্গানুবাদই প্রলাপ বর্ণনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু নিম্ন লিখিত শ্লোকটী মূল কড়চার শ্লোক বলিয়াই অনুমিত হয় যথা ঃ—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্‌ঝিত দেহগেহঃ
গৃহীত কাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ।

অন্ত্য ১৪ পরিচ্ছেদ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পদে ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন যথা ঃ—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।

রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি, কহে "হাহা হরি হরি"
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম
যোগী হইয়া হইল ভিখারী॥
কৃষ্ণ লীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছ শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পড়ি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি
আশা ঝুলি কান্দের উপর॥
চিন্তা কাঁথা উড়ি গায়, ধূলী বিভূতি মলিন গায়
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনী মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥

* * * *

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন বিষয়-ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাসন
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে।
কৃষ্ণ গুণ রূপরস গন্ধ শব্দ পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সভার গ্রাস শেষ আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্য
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।

কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মন কৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মন হল যোগী
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশদশা হয়।
সেই দশদশা হয় প্রভুর উদয়॥

এই পদের অর্থ অতি সুগম্ভীর। কাপালিক ধর্ম্মে তত্ত্ব সাক্ষাৎকা জন্য কঠোর বৈরাগ্য, উৎকট ব্যাকুলতা ও তীব্রযোগের অনুষ্ঠান লক্ষিত হয়। কাপালিকের বাহ্য চিহ্নাদির স্থলে এখানে ব্রজরসের ভূষণে অতি চমৎকার রূপক কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীল চণ্ডী লিখিয়াছেন

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

অন্যত্রও এই ভাবের একটী পদ আছে যথা :—

বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পড়িব কাণে।

এইরূপ মহাভাবের ব্যাকুলতা আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ভাষ পরিস্ফুট করা অসম্ভব।

কড়চার শ্লোকের ন্যায় আরও একটী শ্লোক-মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পা চ্ছেদে প্রলাপ-সূত্র-বর্ণনে দৃষ্ট হয় যথা :—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥ ৩॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবয়ান।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি-কারণ॥
সখি হে। শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে-শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র-সম, জানহ সেই শ্রবণে,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা-সম॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি॥

শ্রীপাদ স্বরূপের সমগ্র কড়চা গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, এবং উহা সূত্রাকারে বর্ণিত। শ্রীল কবিরাজ প্রলাপে উক্ত শ্লোকগুলির পদ্যে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমাদের বোধহয় মূল শ্লোক অপেক্ষাও উহা অধিকতর উচ্ছ্বাসময়ী, অধিকতর প্রশান্ত গম্ভীর ও

অধিকতর মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতের প্রলাপের পদ্যগুলি প্রেমিকভক্তের পক্ষে প্রকৃতই হৃৎকর্ণের রসায়ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ স্বরূপকে ব্রজরসের শ্লোক পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিতেন

"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসায়ন, শুনি।"

শ্রীল কবিরাজ প্রকৃতই রসময় গোলকের কবিরাজ। তাঁহার গ্রথিত এক একটী প্রলাপ-পদ ভাব-সাগরের কোটী কোটী মহাতরঙ্গের লীলাস্থলী। আমি অতি অধম কিন্তু প্রলাপ পদপাঠে এ অধমের মলিন প্রাণও আকুল এবং উদাস হইয়া উঠে। ভবভূতির অমন উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা পড়িয়াছি, মহানাটকের উচ্ছ্বাসময় পদগুলিও আস্বাদন করিয়াছি, চণ্ডীদাসের বিরহ-কবিতায় মৃদু কাকলীর করুণরবও এ কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শ্রীল কবিরাজের বিরহোন্মাদের পদসুধালহরী-পাঠে বিরহের তীব্র ব্যাকুলভাবে হৃদয়ক্ষেত্রকে যেরূপ উদ্বেলিত করিয়া তুলে, কি জানি কি এক উন্মাদিনী শক্তির প্রভাবে চিত্তবৃত্তিকে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যেরূপ আকুল করিয়া দেয় এমন ভাব আর কিছুতেই অনুভূত হয় নাই। এই শুনুন একটী পদ :—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছ, কে কহে উপায়॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণবিনু প্রাণ মোর যায়॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন হাহা পদ্মলোচন
হাহা দিব্য সদ্‌গুণ নাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর হাহা পীতাম্বর ধর
হাহা রাসবিলাস সাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহা যাই
এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিলা ধরি
নিজ স্থানে বসাইল লৈয়া॥

শুনুন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

রামানন্দের গলাধরি করে প্রলাপন।
স্বরূপে পূছয়ে মানি নিজ সখীজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশখাকে রাধিকা পুঁছিল।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল॥

যথা ললিত মাধবে (৩।২৫)

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরব ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখিজীবরক্ষৌষধি
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্

সখি নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখিচন্দ্রিকাভূষণ কোথায়? মন্দ্রমুরলীধ্বনিকর শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? সে ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি কোথায়! সেই রাসরসতাণ্ডবী কোথায়? সখি, আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধিঃ কোথায়? হায় এখন আমার সেই সুহৃত্তম কোথায়? হায়, হায়! আমার এমন প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের সহিত যে আমায় বিযুক্ত করিল, সেই বিধিকে শতবার ধিক্।

শ্রীরাধাপ্রেম মহিমার কি পূর্ণ আস্বাদন! কেমন তীব্র ব্যাকুলতা! ছায়া ও আলোক রেখার ন্যায় বাহ্যজগতের সহিত শ্রীকৃষ্ণময় জগতের কেমন সূক্ষ্ম মেশামেশি! আবার এই অর্দ্ধ বাহ্য দশা হইতেই সহসা যখন প্রভুর অন্তর্দশার ভাব উপস্থিত হয়, তখনই প্রভু অচেতন হইয়া পড়েন। তাঁহার মুখে কথা নাই, নাকে শ্বাস নাই, নয়নে পলক নাই, নেত্র উত্তান, তারকা স্থির। তিনি নিস্পন্দ, নিঃশব্দ, লীলানুধ্যানে পূর্ণ নিমগ্ন।

একদিবস চটক পর্ব্বত দেখিয়া সহসা প্রভুর গোবর্দ্ধন বলিয়া ভ্রম হইল, তিনি অমনি শ্রীভাগবতের

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ

এই পদ্য পাঠ করিতে করিতে পর্ব্বতাভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ ইদানীং প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সতত সতর্ক থাকিতেন, চারিদিকে "ফুকার" পড়িল,—প্রভু পর্ব্বতের দিকে নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইয়াছেন। ভক্তগণ দৌড়িলেন, কিন্তু প্রভুর সহিত দৌড়িতে পারেন এমন শক্তি কার?

সুতরাং সকলেই অনেক পাছে পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণেই প্রভুর গতি স্তম্ভিত হইল, মহাভাবে তাঁহার শ্রীদেহ একবারে অবশ হইয়া পড়িল, তিনি বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতে পড়িলেন, প্রতি রোমকূপে কদম্বের ন্যায় পুলক-কদম্ব দেখা দিল, ঘর্ম্মে ও রক্তোদ্গমে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পরিসিক্ত হইয়া গেল। নয়নযুগল হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল। প্রভুর মুখে বাক্য নাই, কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে, শ্রীঅঙ্গ একবারে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় গোবিন্দও ও স্বরূপ অনেক যত্নে প্রভুকে সচেতন করিলেন। প্রভু বাহ্য জ্ঞান পাইয়া বলিলেন, "একি হইল তোমরা একি করিলে, আমি গোবর্দ্ধনের কন্দরায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃকেলী দর্শন সুখে মগ্ন ছিলাম। হায় তোমরা-আমায় বৃথা দুঃখ দিতে এখানে আনিলে কেন?" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে॥

ইহাই বলিয়া প্রভু অঝোর নয়ন কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রিয় পাঠক, একবার এই করুণাবিগ্রহের এই অবস্থার শ্রীমূর্ত্তি ও প্রলাপ মনে ভাবুন দেখি। শ্রীল কবিরাজ আবেশে বিরহোন্মত্ত গৌরাঙ্গ-রূপ-সন্দর্শন না করিলে কি এই চিত্র আঁকিয়া তুলিতে পারিতেন?

এই সুচিক্কণ সুনির্ম্মল এবং অলৌকিক প্রেমোন্মাদভাবময় গোলক-সুধার ঘনীভূত চিত্রখানি এই মলিন ও কর্কশ হাতে এখন আর অধিকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে বা দেখাইতে সাহস পাইতেছি না। কি জানি কি করিতে কি করিয়া ফেলিব। প্রভুর কৃপানুমতি ও ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ পাইলে সময়ান্তরে আবার এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার বাসনা রহিল।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের কথা যাহা বলিতেছিলাম এক্ষণে তাহারই আর একটুকু বলিয়া উপসংহার করিতেছি। গ্রন্থখানি অশেষ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতেরসার স্বরূপ বহুল শ্লোকরত্নে ইহার কলেবর সমলঙ্কৃত। তদ্ব্যতীত অলঙ্কার [illegible], অভিজ্ঞান শকুন্তল, অমরকোষ, আদিপুরাণ, উজ্জ্বল নীলমণি, উত্তর চরিত [illegible] তত্ত্ব, উপপুরাণ, একাদশীতত্ত্ব, কড়চা (মুরারিকৃত), কড়চা ([illegible]), কড়চা (স্বরূপ গোস্বামি-

কৃত), কড়চা (রঘুনাথদাস গোস্বামি কৃত), কাব্যপ্রকাশ, কিরাতার্জ্জুনীয়, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, গোপীপ্রেমামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, গৌতমীয় তন্ত্র, (বৃহৎ ও লঘু), চৈতন্য চন্দ্রোদয়, চৈতন্য ভাগবত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক, দানকেলী কৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকা, নামকৌমুদী, নারদীয় পুরাণ (লঘু ও বৃহৎ) নৃসিংহপুরাণ, নৈষধ, ন্যায়, পঞ্চদশী, পদ্মপুরাণ, পদ্মাবলী, পাণিনি, বিদগ্ধমাধব, বিশ্বপ্রকাশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভগবদ্গীতা, ভাগবতসন্দর্ভ, ভাবার্থদীপিকা, মনু, মহাভারত, যামুনাচার্য্যস্তব, রঘুবংশ, ললিতমাধব, শাঙ্করভাষ্য, ষট্ সন্দর্ভ, স্তবমালা (রূপ ও রঘুনাথাকৃত), সামুদ্রিক, সাহিত্য-দর্পণ, হরিভক্তিবিলাস ও হরিভক্তি সুধোদয় প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সারগর্ভ বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত এই গ্রন্থের বহিরঙ্গ গৌরব। ভক্তি প্রেম ও ভগবন্মাধুর্য্যই এই গ্রন্থের প্রাণ, শ্রীগৌরাঙ্গই ইহাঁর আত্মা।

সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থখানি প্রেমিক ভক্তের নিত্য আস্বাদ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের পরমারাধ্য। স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে,ধর্ম্মের উচ্চতম-তত্ত্বপূর্ণ এমন গ্রন্থ আর নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র এই শ্রীগ্রন্থে তত্তই সমুদিত। ইহার প্রতি ছত্রই অমৃতবর্ষী, প্রতি ছত্রই গোলকের আনন্দ সুধায় পরিপ্লুত। ইহার প্রত্যেক কথাই সূত্রবৎবহুলতত্ত্বনিবহে পূর্ণ, এবং প্রত্যেক উক্তিই আনন্দ তত্ত্বের অক্ষয় উৎস। শ্রীল কবিরাজ চৈতন্য ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

মনুষ্যে রচিত নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

আমরা তাঁহারই পদের অনুসরণ করিয়া বলিতেছি :—

মনুষ্যে রচিত নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
শ্রীল কবিরাজ মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

গ্রন্থের উপসংহারে স্বয়ং গ্রন্থকার মহাবিনীত ভাবে লিখিয়াছেন :—

"আমি লিখি" এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী-সমান ॥